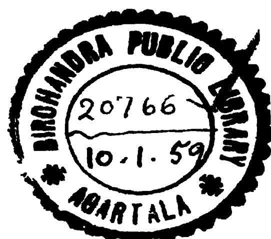
অক্ষয় বট

ভোলানাথ ঘোষ



বর্মণ পাবলিশিং হাউস
৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

ব্রজবিহারী বর্মণ
বর্মণ পাবলিশিং হাউস
৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
নরেন মল্লিক

প্রচ্ছদপট তৈরী করেছেন
নিউ গস আর্ট কটেজ

বই বাঁধিয়েছেন
কৃষ্ণা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

দাম—চার টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাল
যোগমায়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১, রাজেন্দ্র দেব রোড,
কলিকাতা—৭

দুঃখের দিনের বন্ধুকে

১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল—প্রায় দুশো বছর—এর মধ্যে বাঙ্লার বুকে ঘটল কতো বিপর্যয়। পলাশী প্রাঙ্গণে বাঙালী হারাল তার স্বাধীনতা। ১৮৫৭ সালে ঘটল সিপাহী বিদ্রোহ—১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম ফসল পেল তার স্বায়ত্ত শাসন। উনবিংশ শতাব্দী নিয়ে এল জীবনের নতুন জিজ্ঞাসা, নতুন চেতনাকে। বাঙালী চিনল আপনাকে। নিজের দাবী জানাতে গিয়ে কতো মানুষ নিজেদের বলি দিল সাম্রাজ্যবাদের যূপকাষ্ঠে। দেশের আর্থনীতিক কাঠামো হয়েছে জীর্ণ—বুভুক্ষু পেল না তার ক্ষুধার অন্ন।

এই দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের মাঝে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বাঙ্লার এক নিভৃত কোণে গড়ে উঠছিল একটি গ্রাম—নাম তাঁর নন্দীগাঁ। আলীবর্দির সময় একটি পরিবার এই গ্রামের পত্তনী পেল। ইংরেজরা আসার পর থেকে শুরু হ'ল তাদের জীবন-সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের অবসান ঘটেনি আজও। মানুষ জীবনে যে অভিশাপকে বহন করে আনে, জীবন দিয়েই তার মাশুল দিতে হয়।

নন্দীগাঁয়ের মানুষের দুশো বছরের সুখ-দুঃখের করুণ ইতিহাসের সাক্ষী রয়েছে ওই গাঁয়েরই বৃদ্ধ অক্ষয়বট। তার পাতায় পাতায় ডালে ডালে লেখা রয়েছে নন্দীগাঁয়ের মানুষের অশ্রু ও হাসির ইতিকথা। মানুষ আসে, মানুষ যায়—অক্ষয়বটের কোনো ক্ষয় নেই—সে দাঁড়িয়ে আছে—সব মানুষের বেদনার দীর্ঘশ্বাসের বোঝা নিয়ে। তার বুকে কান পেতে শোনো—সে যেন কেবলই বলে চলেছে, 'আমি দেখেছি চোখের জল—আমি দেখেছি জীবনের স্নিগ্ধ হাসি—আমি শুধু তার নীরব সাক্ষী। আমি রচনা করে যাই মানুষের জীবনের ইতিহাস।'

সেই ইতিহাসের অনেক পাতা হারিয়ে গেছে মহাকালের ঝোড়ো হাওয়ার প্রচণ্ড আঘাতে—যে কয়টি রইল—তার কথাই বলে যাই। এই কাহিনীর একটি মানুষ মিথ্যে নয়—একটি কথাও মিথ্যে নয়—

লেখকের অন্যান্য বই :

কাল বদল (যন্ত্রস্থ)

নতুন বন্দর (যন্ত্রস্থ)

বাঙ্‌লা সাহিত্য পরিক্রমা

ছন্দ ও অলঙ্কার

গল্প মঞ্জরী (চার খণ্ড)

সেকালের কথা

দেশ বিদেশের গল্প

নানা লেখা (যন্ত্রস্থ)

রবীন্দ্র কাব্যের একদিক (যন্ত্রস্থ)

॥ এক ॥

আজকের দিন থেকে সেই দিনটা অনেক—অনেক দূরে চলে গেছে। কেউ তাকে আজ আর মনে রাখে না। শুধু সে দিনের পুরানো বটগাছটি তার স্মৃতি মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে। সেও বড়ো একা। কতোদিন আগে কেউ জানেনা এই বটগাছটি অঙ্কুর থেকে বিরাট বনস্পতিরূপে দেখা দিয়েছিল। শুধু বংশপরম্পরা সবাই দেখেছে জটাজালে আচ্ছাদিত এই বৃদ্ধ বটকে। আরও কতো গাছ, কতো লতা জন্মালো—কতো গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে, কিন্তু এই অক্ষয় বটের কোনো ক্ষয় হয়নি। সে কেবল বেড়েই চলেছে। প্রখর দিনে পথিককে দিয়েছে সে ছায়া—শিশুর মনকে করেছে ভয়াতুর, যৌবনে জাগিয়েছে বিস্ময়। কতো আশার কতো আশঙ্কার ইতিহাসে জড়িত এই গাছটি। নন্দীগাঁয়ের প্রতিটি মানুষের ইতিহাস তার ডালে ডালে পাতায় পাতায় অলিখিত স্বাক্ষর রেখে গেছে।

নন্দীগায়ের অক্ষয় বট—নন্দীগাঁয়ের ইতিহাসকে বহন করে চলেছে। এই কাহিনীর শুরু সেই ইতিহাসের গোড়ার পৃষ্ঠা থেকে। এর প্রতিটি মানুষ সত্য প্রতিটি ঘটনা সত্য। একটি কথাও মিথ্যে নয়—ওই অক্ষয় বটের মতোই সবই সত্য। এই ইতিহাস কিছু পাওয়া আর অনেক হারানোর ইতিহাস—নন্দীগাঁয়ের মানুষের হাসি কান্নার ইতিহাস। একটি পরিবারের, একটি সমাজের সুখ দুঃখের কাহিনীতে ভরা তার পাতা গুলো।

তারই একটি একটি করে পৃষ্ঠা খুলি --

নন্দীগাঁ একটি গ্রাম—সে কোনো পরগণা নয়—মহকুমা শহর নয়—ছোট্ট একটি গ্রাম। তার এক পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে খরস্রোতা চন্দনা। চন্দনার নিরন্তর চলার বেগ আজও থামেনি। উত্তরে তার কেয়াখাল্—তারও পরে ডাকাতে বিল। বর্ষার দিনে যখন কেয়াখালে আর ডাকাত বিলে এক হয়ে যেত তখন দত্তবাড়ির বাবুরা সে বিল আর খালের ভেতর দিয়ে নৌকায় কবে বাড়ি ফিরতেন। দত্তরা নন্দীগাঁয়ের জমিদার। আলীবর্দীর সময় রাজীবলোচন দত্ত এই নন্দীগাঁয়ের পত্তনী নেন। সে আজ দুশ' বছর আগেকাব কথা। নবাবের হয়ে বর্গীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন রাজীবলোচন। তারই পুরস্কার স্বরূপ পেয়েছিলেন বহু অর্থ আর এই গ্রামখানি।

রাজীবলোচন নন্দীগাঁয়ে পৌছতে না পৌছতেই শুরু হ'ল বাঙালী আর ইংরেজের লড়াই -বিশ্বাসঘাতকতাব ঘৃণ্যফল সেই পলাশির যুদ্ধ। বাঙালী হারালো তাব স্বাধীনতা। ক্লাইবের গর্দভ মীরজাফর বসল বাঙলাব সিংহাসনে। বাঙলাব শেষ বীর নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা হলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ। রাজীবলোচন সেদিন সিরাজের জন্য দুফোঁটা চোখের জল ফেলেছিলেন। আলিবর্দীর নাতি সিবাজ—আহা ছেলেটি মৃতপ্রায় নবাবের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে পবিত্র কোরান ছুঁয়ে বলেছিল 'দাদু, আমি শপথ করছি জীবনে আমি কখনও মদ ছোঁব না—কখনও কারও ওপর অত্যাচার করব না।' রাজীবলোচন তখন মুরশিদাবাদে। সেখান থেকে নন্দীগাঁ অনেক দূর—পথ যেন আর ফুরায় না।

প্রায় বছর গেছে কেটে—রাজীবলোচন স্ত্রী কমলাকে নিয়ে এলেন নন্দীগাঁয়ে। সঙ্গে এল পাইক বরকন্দাজের দল—এল হিন্দু, এল মুসলমান। দুদিন যেতে না যেতে খবর এলো ইংরেজ সওদাগররা

বাঙলার নবাবকে যুদ্ধে পরাজিত করে অসহায় ভাবে হত্যা করেছে।

অস্থির ভাবে ঘরময় পায়চারি করছেন রাজীবলোচন। কমলা এসে তাঁর হাত ধরল। রাজীবলোচন থমকে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলেন কেয়াখালের ওপারের অস্পষ্টতার দিকে। কমলা বলল, 'তুমি কি ভাবছ বলো ত!' রাজীবলোচন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'শয়তানের দল, ব্যবসা করতে এসে সারা দেশ দখল করে বসল। আর আমি

'কাদের কথা বলছ?'

'বেইমান ইংরেজের দল—তারা নবাবকে হত্যা করেছে। দেশ চলে গেল পরের হাতে।'

কমলা কিছু বোঝে না—তবুও তারও চোখে জল এলো। নবাবকে মেরেছে— আহা—সেই কচি নবাব! কেন মানুষ মানুষকে খুন করে!

তারপর আবার দিনের পর দিন পেরিয়ে যেতে থাকে। রাজীবলোচনের নাচখানা, কাছারী ঘর, সদর দেউড়ী, তার সামনে দীঘি, তিন মহলা বাড়ী, ধানের গোলা, মেয়েদের স্নান করার অন্দরের পুকুর,--সবই একে একে হ'ল। নন্দীগাঁয়ে আরও কয়েক ঘর হিন্দু মুসলমান এসে ঘর বাঁধল। নবাব মীরজাফর আলী রাজীবলোচনকে রাজা খেতাব দিলেন। রাজীবলোচন জীবনে কখনও সে খেতাব গ্রহণ করেনি। বিশ্বাসঘাতক কুষ্ঠরোগীর দেওয়া সে খেতাব। নবাবের আদেশ-নামা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলে দেন চন্দনার জলে।

চন্দনায় সেদিন জেগেছে জোয়ার। তার ওপরের আকাশখানি কালোয় কালো হয়ে আছে।

ঝড়ের আর দেরী নেই।

১৭৬৪ সাল। কমলার কোলে এল এক ছেলে। পুরুষোত্তম শাস্ত্রী এসে নামকরণ করলেন নবজাত শিশুর। রাজীবলোচনের ছেলে—নাম তার রাজেন্দ্রনারায়ণ। নন্দীগাঁয়ে আর একটি লোক বাড়ল। রাজীবলোচনের বাড়ীতে চলেছে একমাস ধরে জন্মোৎসব। নাচ, গান, খাওয়া, বিয়াল্লিশ রকমের বাজনা বাজছে বাইর দেউড়ীতে। রাজাবলোচন গোঁপে তা দিয়ে ভিতরে বাইরে দুয়েকবার তদারক করে আসেন।

ওদিকে অন্দরমহলে কমলা ছেলে কোলে নিয়ে বসে আছেন। তাকে ঘিরে গাঁয়ের বামুন কায়েতের মেয়েরা সব বসে। রাজীব-লোচনের বাড়া থেকে কেউ খালি হাতে ফিরে যায় নি। সবাই ন্যায্য পাওনা নিয়ে ফিরেছে। নইলে ছেলের অকল্যাণ হবে যে! পুরুষ মেয়ে সবাই দুহাত তুলে আশীর্বাদ করে যায়—দীর্ঘজীবী হোক—বাপের নাম রাখুক এ ছেলে।'

অলক্ষ্যে বিধাতা বুঝি হাসেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর তিন বছর রাজত্ব করল তার পর মীরকাশিম পেলেন বাঙ্‌লার গদি। ইংরেজের অকারণ হুমকি সইতে না পেরে যুদ্ধ করলেন তাদের সঙ্গে। যুদ্ধে হল মীরকাশিমের পরাজয়। আবার এলো মীরজাফর। কুষ্ঠরোগে গলে পচে মরল সে। তারপর বাঙ্‌লার গদি পেল মীবজাফরের ছেলে নজম্‌-উদ্‌-দৌলা। তখন ১৭৬৫ সাল। ক্লাইভ ফিরে এসেছে বাঙ্‌লা দেশে।

সুদূর নন্দীগাঁয়ে বসে রাজীবলোচন এই পরিবর্তনের খবর রাখে। মীরজাফর, ক্লাইভ, মীরকাশিম, কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, ঘসেটি

বেগম—এদের মুখ তার চোখের ওপর ভাসছে। তার খবর পৌঁছুতে বছর ঘুরে যায়।

নবাব আলীবর্দীর কাছে ইংরেজ সদাগরেরা এসে বায়না ধরল, 'হুজুর আমরা একটা দুর্গ করে থাকতে চাই।' আলীবর্দী বললেন 'দরকার নেই, আমি যতক্ষণ আছি তোমাদের কোন ভয় নেই। আমার দেশে তোমাদের দুর্গ তৈরী করে কোন লাভ হবে না।'

কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, ঘসেটি বেগম সবাই মিলে চক্রান্ত করছে। একদিন পথের মাঝে সিরাজ মারলো হোসেন কুলীকে—দুশ্চরিত্র হোসেন কুলী।

আলীবর্দীর মৃত্যু হ'ল—রাজীবলোচন তখন নন্দীগাঁয়ের পথে। ইংরেজ এসেছে দেশে—তাদের ডেকে আনল মীরজাফরের দল। শয়তানকে বাসা দিল শয়তান।

নন্দীগাঁয়ের আকাশে তখন সাঁঝের তারা জেগে উঠেছে। রাজীবলোচন পায়চারী করছেন বাইর বাড়ীর দাওয়ায়। আপন মনে বলে উঠলেন 'শয়তান!' দূরে দাঁড়িয়ে করালী—রাজীবলোচনের হুঁকাবরদার। প্রয়োজন হ'লে লাঠিও ধরতে পারে। রাজীবলোচনের কথা শুনে হঠাৎ চমকে উঠে বলে 'আজ্ঞে আমি করালী।'

'কে?'

'আজ্ঞে করালী।'

'যাও।'

১৭৬৫ সাল। শাহ্ আলম দিল্লীর নবাব—দেওয়ানী দিয়েছে ইংরেজ কোম্পানিকে। খাজনা আদায় করা তাদের কাজ। বাঙ্লায় তাদের প্রতিনিধি রেজা খাঁ।

সেদিন আশ্বিনের সন্ধ্যা। আট দশজন লোক এসে ঢুকল রাজীবলোচনের বাড়িতে।

রাজীবলোচন থমকে দাড়ালেন। এরা কারা!

দলের সর্দার রামলগনসিং হাজারী বলল, সাত দিনের মধ্যে খাজনা পাঠাবে।

রাজীবলোচনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল। গুরু গম্ভীর কণ্ঠে হাঁক দিলেন, 'করালী!'

'হুজুর—'

'এদের ঘাড় ধরে বার করে দে।'

কাদের বললে, 'কোম্পানি বাহাত্বরের হুকুম।'

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে—অন্ধকার নেমে এসেছে নন্দীগাঁয়ে।

রাজীবলোচন পুরানো লাঠিটা হাতে তুলে নিলেন। সর্দার পিছিয়ে পড়ল। অন্ধকারে শব্দ হ'ল 'মাগো'—'ইয়া খোদা'! যে হু'চারজন পারল পালিয়ে বাঁচল।

'রাজীব দত্তের কোম্পানী রাজীব দত্ত নিজে' রাজীবলোচন অন্ধকারে আপন মনে বলে উঠলেন।

জমিদার বাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে গেছে। পাইকরা এল ছুটে মশাল নিয়ে—সবাই ছুটোছুটি করছে। উঠোনের মাঝে হুটো লাশ পড়ে—বাকি জন চার যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে রাজীবলোচনের বাড়ীর উঠোন।

'বেইমান যত সব, গোলামের দল!' রাজীবলোচনের তখনও খুনের নেশা কাটেনি। কমলা ছুটে এসেছে বাইর বাড়ীতে। রাজীবলোচনের হাত ধরে বলল 'ভেতরে চলো'। পদ্মনাভ তর্কবাগীশ বললেন, 'ঘরের বউ বাইরে আসে না মা'।

হঠাৎ রাজীবলোচনের খেয়াল হ'ল—তাইতো! গম্ভীর কণ্ঠে কমলাকে বললেন 'ভেতরে যাও।'

তর্কবাগীশ বললেন 'সাবধান থেকো বাবা, শুনছি ইংরেজ

বেনেরা দুহাতে টাকা লুটছে। ঘরের বৌঝির ও নিশ্চিন্তে থাকা দায়।'

সাত দিন পর। নন্দীগাঁয়ের রাস্তার ধূলো ঘোড়ার খুরে উড়ে উড়ে আকাশ পর্যন্ত ঢেকে দিল যেন। কোম্পানির হিল সাহেব এসেছে – রাজীবলোচনকে সায়েস্তা করবার জন্য। বর্গীব সঙ্গে লড়াই করে রাজীবলোচনের সাহস বড় বেড়েছিল। কোম্পানির তিনশ' সৈন্য। পঞ্চাশ জন লেঠেল নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাজীবলোচন। লড়াই চলছে –দিনের আলো নিবে এলো। সেদিনও সেই আশ্বিনের সন্ধ্যা। বন্দূক আর লাঠির লড়াই ! আহত রাজীবলোচন বন্দী হলেন।

করালী লুকিয়ে রেখেছিল কমলা আর রাজেন্দ্রনারায়ণকে। অনেক করেও কোম্পানীর লোকেরা খুঁজে পায়নি তাদের। হিল সাহেবের নজর ছিল কমলার ওপর। সে শুনেছিল এমন সুন্দর নাকি আর হয় না।

বাই জোভ ! এমন পাখী হাত ছাড়া হ'ল ! হিল সাহেবের বেশী আফশোষ।

করালী প্রাণ দিয়েছে লড়ায়ে। যাক বাঘ পড়েছে ধরা।

রাত্রের অন্ধকারে নন্দীগাঁয়ের আকাশ লাল হয়ে উঠল। রাজীবলোচনের বাড়ি লুট করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কোম্পানির সৈন্যেরা। দেড়শ সৈন্য রাজীবলোচনকে বেঁধে নিয়ে গেল। বাকিরা পড়ে আছে মাঠের ওপর। হিল সাহেব যাবার পথে বামুন পাড়ার বিধবা সৌরভীকে ধরে নিয়ে গেল। সেদিন তার কান্না কেউ শুনতে পায়নি।

রাতের অগ্নিশিখায় রাজীবলোচন একবার দেখলেন তাঁর সেই বাড়ির দিকে। কমলা আর রাজেন্দ্রনারায়ণ ওই আগুনেই শেষ হয়ে

গেল। আলীবর্দীর দেওয়া ওই নন্দীগাঁ। আজ আর তার কোনো মূল্য নেই তাঁর কাছে।

হাত পা বাঁধা রাজীবলোচনের। গোরুর গাড়ীতে তুলে তাঁকে নিয়ে চলল কোম্পানির দল।

রাজীবলোচন তাকিয়ে আছেন নন্দীগাঁয়ের লাল আকাশের দিকে। কতো আশা, কতো স্বপ্ন ওইখানে তার ছিল। তাঁর বাড়ীর সামনের দীঘির পাড়ের ওই বট গাছটির ডালপালা আগুনের আলোয় দেখা যাচ্ছে। ভরা যৌবনে আকাশের পানে ছুটে চলেছে ওই বট। আজ তার সমস্ত পাতাগুলো যেন লালে কালোয় মিশে দৈত্যের মতো দেখাচ্ছে। রাজীবলোচন তার নাম রেখেছিলেন—'অক্ষয়বট'।

দেখতে দেখতে গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের ওপব এসে পড়ল গোরুর গাড়ী। সঙ্গে চলেছে পাহারাদাররা। বাজীবলোচন তখনও তাকিয়ে আছেম নন্দীগাঁয়ের দিকে। তখনও নন্দীগাঁয়ের লাল আকাশ দেখা যাচ্ছে। নতুন প্রভাতের আভাস রয়েছে যেন তাতে। একবাব অস্ফুট স্বরে বললেন 'কমলা, খোকা!' শেষ হয়ে গেছে রাজীবলোচনের কাছে ওরা। আজ ওই লাল আগুনের মাঝেই তারা মিশে গেছে।

রাজীবলোচন শৃঙ্খলাবদ্ধ দুহাত তুলে গ্রামের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। এ নন্দীগাঁয়ের সবাই থাকবে। আবার নন্দীগাঁয়ে ভোরের আলো দেবে দেখা। কিন্তু কমলা, খোকা –

রাজাবলোচন আপন মনে বলে উঠলেন 'এ আগুন যেন না নেবে। এ আগুন আমার খোকার, আমার কমলার আগুন—ভগবান, তুমি আমাকে শক্তি দাও।'

পরদিন। শত্রুর ভয়ে ভীত, গাঁয়ের লোক একে একে চলল গ্রাম ছেড়ে। রইল শুধু কয়েক ঘর হিন্দু আর মুসলমান আর সেই পদ্মনাভ ঠাকুর। সবাই একবার যাবার পথে দেখে গেল রাজীবলোচনের সেই পোড়া ভিটেটি। যাবার পথে তাকে দুফোঁটা চোখের জল দিয়ে গেল তারা।

ওদিকে কমলা পাথরের মতো বসে আছে আজিজ মিঞার গোলা ঘরে। এক মুহূর্তের জন্যেও ছেলেকে বুক থেকে নামায়নি। ভোর হতেই আজিজ মিঞার বৌ এলো তাব কাছে। পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, 'এখন আসুন দিদি।'

চমক ভাঙ্গলো কমলার আজিজেব বৌকে জিজ্ঞাসা করলো 'তিনি কোথায় ?

'খাজনা দিতে গেছেন।'

বাজীবলোচন আর ফেরেননি। হয়ত খাজনা আর শোধ হয়নি। প্রতিটি নতুন দিন কমলাব বুকে জাগায় আশা। আঠারো বছর বয়সে এক বছবেব খোকাকে নিয়ে প্রতিদিন বসে থাকে না কার আশায়! পোড়া ভিটেতে ঘব এখন উঠবে না। গাঁয়েব সবাই মিলে তাঁদেরই দীঘিব পাশে ঘর বেঁধে দিয়েছে তাব। দিন কেটে যায়—চোখেব জলে দিনগুলি তাব।

দুটি বছর পেরিয়ে গেল। খোকা বড়ো হয়েছে - কথা কইতে জানে। বাবাকে তার মনে নেই। তবুও মা যখন আদব করে তাকে 'বাবা' বলে ডাকেন সেও তখন বলে 'বাবা'। কমলার বুক যেন দুরু দুরু কেঁপে ওঠে। গলা তাঁর শুকিয়ে যায়—কথা কইতে পারেন না। পথের পানে শুধু চেয়ে থাকেন।

একদিন কমলা অমাবস্যার রাতে অক্ষয় বটের একটি ডালে স্বামী ফিরে আসার মানত করে একটি সুতো বেঁধে দিয়ে এলেন।

অনেকদিন কেটে গেছে তারপর।

প্রতিদিন কমলা সন্ধ্যার অন্ধকারে বটগাছের সামনে প্রণাম ক'রে চোখের জল মুছে বলেছেন 'ওগো অক্ষয় বট—তাঁকে ফিরিয়ে দাও।'

মানত করা সুতোটি সন্ধ্যার অন্ধকারেই হারিয়ে গেল তাঁর প্রার্থনা বহু ঋতুপরিবর্তনের মাঝে হারিয়ে গেছে। উদ্ধত বটগাছটিও শুক্‌নো পাতায় পাতায় তার সমবেদনা জানিয়েছে। আরও কতো নতুন নতুন ডাল পাতা দিয়েছে দেখা। শুধু রাজীবলোচন আর ফিরে আসেনি।

॥ দুই ॥

পলাশীর বিপর্যয়ের পর কেটে গেছে আরও পঁচিশটি বছর। কোম্পানির দেওয়ানীর দৌলতে ১৭৭০ সালে দেশময় দেখা দিল ছুর্ভিক্ষ—মহামারী। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে ক্ষ্যাপা সন্ন্যাসীর দল বেরিয়ে পড়েছে। লুটে নিচ্ছে ইংরেজের ভাণ্ডার। মুসলমানদের কেউ কেউ অভিমান করে বসে আছেন চুপটি করে। দিন দিন তাঁরাও দারিদ্র্যের কঠোব আঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছেন। হিন্দুদেরও অনেকে কোম্পানিব এই অত্যাচারেব বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়েছেন।

ইংরেজেরা আসার আগে আগে পর্তুগীজ জলদস্যুদের সঙ্গে লড়াই করে এদেশের মানুষ নিজেদের রক্ষা করত। এবার এলো ইংরেজ। এদের আগে এবং এদের সঙ্গে এসেছিল একদল পাদ্‌রী। এরা সন্ন্যাসী সাহেব। শহরে গ্রামে এরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করে বেড়াত। নন্দীগাঁয়ের ক্ষেমঙ্কর দাস খ্রীষ্টান হয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছে। ঘরে পড়ে রইল ক্ষেমঙ্করের বউ আর ছেলে। তখন কঠিন জাত বিচারের যুগ। ক্ষেমঙ্কর জাতিতে ছিল কৈবর্ত। অনেকদিন থেকে মোহিনী কৈবর্ত ক্ষেমঙ্করের বাড়ি যাওয়া আসা করত ক্ষেমঙ্করের বউ মোক্ষদার একটু ভালোবাসা পাবার জন্য। একদিন মোক্ষদা বাড়ি থেকে ঝাঁটা মেরে তাকে তাড়িয়ে দেয়! সেদিন থেকে মোহিনী দূর থেকেই তাকে ইসারা ক’রে নিজের দেহ মনের আকুলতা জানায়। ক্ষেমঙ্কর

খ্রীষ্টান হয়ে যাবার প্রায় দু' বছর পর মোহিনী মোক্ষদার কৃপা লাভ করেছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা মোক্ষদা গেছে দীঘিতে জল আনতে। মোহিনী বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে তারই প্রতীক্ষায়। দু'দিন থেকে মোহিনীর ঘুম নেই। দু'দিন আগে এ পথেই সে দাঁড়িয়ে ছিল—মোক্ষদার পথের পানে তাকিয়ে। সেদিন মোক্ষদা যেন তার দিকে চেয়ে হেসেছিল। মোহিনী পাগলের মতো ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে বসল।

'আ-মর্, পথ তোর একার নয়—চোখের মাথা খেয়েছিস মুখপোড়া!' মোক্ষদার চোখে হাসি, মুখে রাগ! হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে চলে গেল।

সেদিন সে প্রতিজ্ঞা করেছে, যাই কপালে থাক—মোক্ষদাকে মনের কথা খুলে বলবেই।

বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে মোহিনী—মোক্ষদা এল ভরা কলসি নিয়ে।

মোহিনী গভীর আবেগে ডাকল, 'মোক্ষদা, শোন্!'

মোক্ষদা উল্কি-আঁকা মুখখানা বেকিয়ে বলল—'পথে আমি কথা শুনিনে—ঘরে চল্।'

সেদিন অক্ষয়বট শুধু রইল তার সাক্ষী।

নন্দীগাঁয়ে আবার আসছে নূতন মানুষ। ঢাকা থেকে, যশোর থেকে বাঙলার বাইরে মিথিলা থেকে, এমন কি কান্যকুব্জ থেকে—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বৈদ্যরা একে একে আসছে। নন্দীগাঁয়ে আবার মানুষের কোলাহল শোনা যায়!

পুরানো যারা—তারা নতুন দলকে মেনে নেবার চেষ্টা করে। নানা শ্রেণীর লোক দল বেঁধে নন্দীগাঁয়ে বাস করে। বামুনপাড়া,

কায়েতপাড়া, বৈষ্ণিপাড়া, কাহারপাড়া, মুসলমানপাড়ার সবাই নিজেদের সুখ দুঃখের সমব্যথী হয়েই বাস করে।

নন্দীগাঁয়ে সাপের উপদ্রব বড় বেশী। তাই শ্রাবণ মাসে ঘটা করে মনসার পাঁচালী গাওয়া হয়—মনসা পূজা হয়। সত্যপীরের শিরনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় মিলে মাথায় ক'রে গ্রহণ করে! দেবতার ভয়, দস্যুর ভয়। তবুও তার মাঝে নন্দীগাঁয়ের মানুষগুলি একটু হাসবার চেষ্টা করে।

পদ্মনাভ ঠাকুর মারা গেলেন—তাঁর স্ত্রী সর্বজয়ী গেলেন সহমরণে। কমলা আপত্তি করেছিল। ব্রাহ্মণরা বলল—সতী নারীর পরিচয় সেখানেই—জীবনে মরণে স্বামীর সঙ্গে ছায়ার মতো থাকবে।

সর্বজয়া চোখের জল মুছে বলেন, 'স্বামী ছাড়া মেয়েদের আর কি গতি আছে বলো?'

কমলা চমকে ওঠেন সব শুনে—পাঁচ বছর কেটে গেল—তাঁর কোনো খবর নেই।

সর্বজয়া স্বামীর চিতায় উঠে বসলেন। সবাই 'সতী' বলে তাঁকে প্রণাম জানালো। কিন্তু হরিশ তর্কালঙ্কারের পনেরো বছরের পুত্রবধূকে যখন জোর ক'রে তার স্বামীর চিতায় তুলে দিয়ে তার কান্না চাপা দেবার জন্য ঢাক ঢোল পিটিয়েছিল—সেদিন কমলা বিদ্রোহ ক'রে ওঠেন। কিন্তু কে তাঁর কথা শোনে! গাঁয়ের লোক আরও কি জানি কানাকানি করে।

রাজীবলোচনের পোড়ো ভিটের পোড়া মাটির কালো রঙ্ আজও ঠিক তেমনি আছে।

এলো ১৭৭০ সাল। দু' বছরের ছেলে রাজেন্দ্র নারায়ণ। মার কাছে বসে বসে পুরানো দিনের গল্প শোনে। সেই মুরশিদাবাদ কাশিমবাজারের কথা—কমলার বাপের বাড়ী সাতগাঁয়ের কথা। সাতগাঁয়ের মেয়ে কমলা নন্দীগাঁয়ের বউ হয়ে এসেছিলেন।

১৭৭০ সাল—অজন্মার বছর। চাল নেই ঘরে। বন-বাঁদারের লতাপাতা খেয়ে আর চলে না। তাও শেষ পর্যন্ত ফুরিয়ে এলো। ঘরে ঘরে দেখা দিল রোগ শোক মৃত্যু। দশটা বাড়ীর সাহায্যে কমলার দিন চলত। নন্দীগাঁয়ের জমিদারের বউ সে। ভিক্ষার অন্নে তাঁর জীবন চলত। আজ আর তাও চলে না। কমলার ভয় তাঁর খোকার জন্য। এই মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তার খোকাকে যেমন করেই হোক বাঁচাতে হবে। জল শুকিয়ে গেছে, নন্দীগাঁয়ের প্রত্যেকটি পুকুরের। রাজীবলোচনের দীঘির জলও তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে।

অক্ষয়বটের দুটো ডাল মৃত্যুব স্বাক্ষর নিয়ে কোন রকমে টিকে রয়েছে।

গাঁয়ের লোক একে একে আবার বেরিয়ে পড়ল- একমুঠো অন্নের সন্ধানে। কিন্তু অন্ন কোথায়! কমলা বইলেন পড়ে তাঁর খোকাকে নিয়ে। অন্ন জোটেনা—তবুও ত তাঁর যাওয়া হবে না। যদি তিনি আসেন।

হায়রে মানুষের আশা! কমলা তাকিয়ে থাকেন অক্ষয়বটের পানে। তার একটি মরা ডাল ভেঙে পড়ে গেল।

১৭৭২ সাল। এবার কোম্পানী বাহাদুর নিয়েছে খাজনা আদায়ের ভার। আর বুঝি দেশে কোন দুঃখ থাকবে না। কিন্তু বাঙলার শ্মশানভূমি তখনও শ্যামলা হয়ে উঠেনি।

বারো বছর পর কমলা বৈধব্যকে বরণ করে নিল। তবু মন তার মানে না। কি জানি—যদি তিনি আসেন! রাজেন্দ্র অবাক হয়ে দেখে মায়ের এই পরিবর্তন। কি হল মার—সিঁদুর শাখা গেল কোথায়!

কেটে গেল আরও বারোটি বছর।

অক্ষয়বটের ছায়ায় বসে রাজেন্দ্রনারায়ণ আপন মনে আবৃত্তি করতে থাকে -

বর্ণ প্রকর্ষে সতি কর্ণিকাবং,
দুনোতি নির্গন্ধতয়া স্ম চেতঃ।
প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং,
পরাঙ্মুখা বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ॥

সব দিয়েও বিধাতা কিছু বাকি রাখেন। কিন্তু—তাদের অনেক থেকেও সব চলে গেল। প্রতিদিন কতো কি বসে বসে ভাবে সে!

মায়ের ডাকে চমক ভাঙে।

'খোকা! এদিকে আয়।'

ধীরে ধীরে গেল মায়ের কাছে। সংসারে মা ছাড়া আর কাউকে পায়নি সে।

মায়ের কাছে এসেই সে বলে উঠল, 'মা, এবার আমায় রোজগারের পথ দেখতে হবে। নন্দীগাঁয়ে এই ভিটে ছাড়া আর ত আমাদের কিছুই নেই।'

'কি করবি!'

'দেখি, ভিন্ গাঁয়ের জমিদার বাড়িতে যদি কোনো কাজ পাই। আবার শুনছি ধর্মপুরকে শহর বানাচ্ছে ইংরেজরা। ওদের কাছেও যদি কোনো সুবিধে হয়।'

কমলার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দৃঢ়ভাবে বললেন, 'না'।

'কেন মা?'

'ওদের গোলাম হতে তোমাকে আমি দেব না। যদি না খেতে পাই সেও ভালো।'

রাজেন্দ্রনারায়ণের মনে পড়ল তার বাবার কথা। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আমার ভুল হয়েছে মা, আমায় ক্ষমা করো।'

কমলার চোখের জল।

শুভ দিন দেখে রাজেন্দ্রনারায়ণ যাত্রা করল সুলতানপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে। সুলতানপুরের জমিদার নীলরতন রায়। নীলবতনের পিতা ছিলেন নীলমাধব রায়। ১৭২৭ সালে এই গ্রামখানি পুরস্কার পেয়েছিলেন মুরশিদ্ কুলিখাঁর কাছ থেকে। মুরশিদ্ কুলির সময় থেকে একদল জমিদারের আবির্ভাব ঘটে। নীলরতন তাদের মতো জমিদার নন। তবে সুলতানপুরের পাশের দুয়েকখানি গ্রামও তিনি দখল করে নিয়েছিলেন। ইংরেজরা নন্দীগাঁয়ের প্রজাস্বত্বও তাঁকে দিয়েছিল। নীলমাধব মারা গেলেন আলীবর্দির রাজত্ব কালে। নীলরতন জমিদারীর ভার নিয়ে ধীরে ধীরে তাকে আরও বাড়ালেন। ইংরেজদের চরিত্র তিনি অনেকটা আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি জানতেন টাকা পেলেই এরা খুসি। লর্ড কর্ণওয়ালিশ এ সময়ে আরও সুবিধে করে দিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তোর পাকা ব্যবস্থা করে। প্রজারা হারালো নিজেদের অধিকার—জমির মালিকেরা গোঁফে তা দিয়ে মুচকি হাসল। বৃদ্ধ নীলরতন তার এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে জমিদারী চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রজা ঠেঙিয়ে যে টাকা আদায় হয় তার কিছুটা যায় সরকারের দপ্তরে আর বাকিটা থাকে নীলরতনের। প্রজারা কাঁদে—নীলরতন হাসেন।

রাজেন্দ্রনারায়ণ এসে দাঁড়ালো জমিদার নীলরতন রায়ের সামনে। নীলরতন চমকে ওঠেন তাকে দেখে। ঠিক এই রকম আর একটি মানুষকে তিনি জানতেন। আধনিমিলিত চোখে ভুরু কুঁচকে তিনি তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। নায়েব গোমস্তারা সবাই রয়েছে। প্রজারা দূরে উঠোনের এক কোণে বসে আছে।

নায়েব মশায় এক একবার চেঁচিয়ে এক একজন প্রজার নাম ধরে ডাকছিলেন।

রজবআলী হাজির!

'হুজুর'—হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালো রজবআলী। ঠিক সেই সময় রাজেন্দ্রনারায়ণ এলো নীলরতন রায়ের বাড়ীতে।

গম্ভীর কণ্ঠে নীলরতন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাই তোমার।'

রাজেন্দ্রনারায়ণ যথারীতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলল, 'উপার্জনের চেষ্টায় বেরিয়েছি। সংস্কৃত, আরবী, ফার্সি পড়েছি। হুজুরের এখানে যদি কোনো কাজ থাকে—'

'নিবাস!'

নন্দীগ্রাম—'

সংশয়াবিষ্ট নীলরতন রায়—এ ছেলেটি কে?

'তোমার পরিচয় কি?'

'পিতা স্বর্গত রাজীবলোচন দত্ত—অধীনের নাম রাজেন্দ্রনারায়ণ দত্ত। বাড়ীতে.আমার মা আছেন।'

নায়েবের হাত থেকে কলম পড়ে গেল। নীলরতন হুঁকোর নলটা মুখে দিতে ভুলে গেলেন।

রাজীবলোচনের ছেলে! ও কি জানে যে তাদের সম্পত্তি এখন নীলরতন রায়ের! বাপের সম্পত্তির খোঁজ নিতে এসেছে বুঝি!

'এখানে কিছু হবে না—যাও', কঠিন কণ্ঠে বললেন নীলরতন।

রাজেন্দ্রের কোনো মানসিক পরিবর্তন দেখা গেল না। 'আচ্ছা, তবে আসি,' বলে নীলরতনকে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে আবার ফিরে চলল। কিন্তু কোথায় যাবে সে! মায়ের আদেশ ইংরেজের গোলামি যেন না করে। তারা তার পিতৃহন্তা। ভাবতেই যেন খুন চেপে যায় তার মাথায়।

'ছোটকর্তা!' পেছন থেকে কে যেন ডাকল। ফিরে দেখে তাদেরই গাঁয়ের কাঙালী।

'কি কাঙালী খুড়ো, তুমি যে এখানে!'

কাঙালীর চোখে জল। রাজেন্দ্রের হাত ধরে বলল 'খাজনার দায়ে এসেছি বাবা। কিন্তু তুমি এলে নীলুরায়ের সেরেস্তায় কাজ করতে! এই নীলুরায় কর্তার ভয়ে কোনোদিন মাথা তুলে কথা কয়নি! আর তুমি—'

'আমার ভুল হয়েছে কাঙালী খুড়ো—আমি জানতাম না।'

'আজ নন্দীগাঁয়ের জমিদার হচ্ছে নীলুরায়—একদিন এই গ্রাম ছিল তোমাদের।' কাঙালী বলল।

রাজেন্দ্র মায়ের কাছে শুনেছে—নন্দীগ্রাম তাদের। কিন্তু নীলরতন রায় যে এখন তার মালিক তা সে জানত না! নন্দীগ্রামের জমিদার নীলরতন! রাজেন্দ্রের চোখের কোণে যেন ক্রুর হাসি খেলে গেল। রাজীবলোচনের ছেলে সে। তাই আজকের অপমান দ্বিগুণ হয়ে বাজল তার বুকে।

'যেমন করে হ'ক এ গ্রাম আমারই হবে—তোমরা আমার সহায় থেকো।' প্রতিটি শব্দে যেন অটল প্রতিজ্ঞার সুর শোনা যায়।

ফিরে এলো আবার নন্দীগাঁয়ে। কমলা তার মুখ দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। অত্যন্ত রুক্ষ তার চেহারা।

'কি হ'ল বাবা!'


BIRCHANDRA PUBLIC LIBRARY
AGARTALA
20766
10.1.59

'হ'ল না কিছুই—সুলতানপুরের নীলরতন রায় বলল, হবে না—যাও। অথচ—কাঙালী খুড়ো বলে এ নন্দীগাঁয়ের এখন নাকি সে-ই জমিদার। এ কিছুতেই হতে পারে না মা।'

কমলা কিছুই বললেন না।

নন্দীগাঁয়ের আর একটি রাত ঘনিয়ে এলো। এ গাঁয়ের ভূধর দাস নীলরতনের গোমস্তা। তাকে বাদ দিয়ে রাজীবলোচনের সময়ের যে দুচারজন বয়স্ক হিন্দু মুসলমান গ্রামবাসী ছিল তাদের সঙ্গে দেখা করল রাজেন্দ্রনারায়ণ।

নিশুতি রাত—ক্লান্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ সবার সঙ্গে পরামর্শ করে এসে বসল অক্ষয় বটের নীচে। দূরে একটা পেঁচা ডেকে উঠল। দীঘির পাড় দিয়ে দুটো শেয়াল পালাল বুঝি। একবার তাকালো সে ঐ পোড়ো ভিটের দিকে। আবার তাকে বাঁধতে হবে ঘর। আবার এ নন্দীগাঁ হবে তার।

কি করে হবে তা সে জানে না—তবু এ তার বিশ্বাস। এ বিশ্বাস তার—ঐ অক্ষয়বটির মতোই সত্য।

অক্ষয়বটের ডালে ডালে অচেনা বাতাস কি যেন কার খবর দিয়ে গেল।

গ্রামের মাঝে পরের দিন রটে গেল—নীলরতন রায়কে আর খাজনা দিতে হবে না। জমিদার তাদের রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়। রাজীবলোচনের ছেলে। নন্দীগাঁয়ের হিন্দু মুসলমান প্রজারা এসে দাঁড়ালো কমলার জীর্ণ কুটিরের সামনে। ভূধর খবর পেয়ে ছুটছিল সুলতানপুরের দিকে। পথ থেকে তাকে ধরে নিয়ে এলো ইয়াসিনরা দু'ভাই। 'নিমকহারামি ক'রনা ভূধর—'

ভূধর কেঁদেই ফেলল। হাত জোড় ক'রে বলল, 'এবার ছেড়ে দে ইয়াসিন আর কোনোদিন—'

রাজেন্দ্রকে সবাই বলল, 'নীলুরায়ের কাছে আর আমরা যাব না। তুমিই আমাদের—

'আমি না—মাকে বলো।

কমলা আজ বার্ধক্যের সীমায় এসে পৌঁচেছেন। যারা তাঁকে জানে—তারা হাত জোড় করে বলল, 'মা, আমরা তোমার ছেলে—যদি কোনোদিন কোনো বিপদ আসে—'

আজিজ মিঞার ছেলে রহমৎ কথা শেষ করতে না দিয়েই লাঠি উঁচিয়ে বলল, 'জান কবুল।'

রাজীবলোচনের পোড়া ভিটেয় আবার গড়ে উঠেছে জমিদার বাড়ি। রাজেন্দ্রনারায়ণ মাকে নিয়ে এসে উঠল। কমলার মনে পড়ল সেদিনের কথা যেদিন কোম্পানিব সৈন্য এসে ঘর জ্বালিয়ে দেয়। করালী ছুটে এসে বলেছিল 'আমার সঙ্গে চলে এসো মা—দেরী ক'র না।' তারপর সেই আজিজ মিঞার বাড়ি। আজিজ মিঞা আজ আর বেঁচে নেই। নন্দীগাঁয়ে নতুন মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। রাজীব-লোচন যাবার পর পঁচিশ বছর কেটে গেছে।

অনেকদিন পর নন্দীগাঁয়ে আবার যেন প্রাণের সাড়া জাগল। অক্ষয়বটের পাতায় পাতায় হাসি।

নীলরতন রায় যা ভেবেছিলেন তাই হ'ল। কিন্তু এভাবে অপমান ত হজম করা যায় না।

নীলরতন সেদিন নাটমন্দিরে বসে কবির লড়াই শুনছেন। এমন সময় নায়েব এসে কানে কানে বলল, 'নন্দীগাঁয়ের প্রজাদের খেপিয়েছে ওই রাজীবলোচনের ছেলে। ভূধরকে ও পাওয়া যাচ্ছে না।'

গান থেমে গেল নীলরতনের হুকুমে। ভোজপুরীয়া হরদেওকে ডেকে পাঠালেন। নায়েবকে বললেন, 'আমার বন্দুক এনে দাও।'

হরদেও ছুটে আসতেই নীলরতন আজ্ঞা দিলেন লেঠেলদের ঠিক করে নে।

হঠাৎ হাসি পেল তাঁর। এক লড়াইতে ঘায়েল হ'ল রাজীব-লোচন—আর এক লড়াই—এবার তার ছেলে—

উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন—'জগা!' জগা তাঁর পার্শ্বরক্ষী। সে আসতেই 'আবার হুকুম দিলেন, 'আজ রাতেই নন্দীগাঁয়ে যেতে হবে।'

সুলতানপুরের দল এসে পৌঁচেছে নন্দীগাঁয়ের কাছে। তাঁরা শুধু রাতের অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু এ খবর নন্দীগাঁয়ের লোকও জানে। তাদেব লেঠেলেব দল তারাই—তারা নিজেরাই দাঁড়াবে সুলতানপুরের বিরুদ্ধে। রাজেন্দ্রনারায়ণ শুধু পুঁথিপত্র নিয়েই পড়ে থাকেনি—লাঠি ধরতেও সে বাপের মতোই ওস্তাদ।

এগিয়ে গেল নন্দীগাঁয়ের দল। সুলতানপুরের মশালের আলোতেই তারা ঘায়েল করল নীলরতনের দলকে। সবার পেছনে ছিলেন নীলরতন। বন্দুকটা তুলে নিয়ে গুলি ছুঁড়লেন। রাজেন্দ্র নারায়ণ দেখতে পেয়েছে তাঁকে—ছুটে গেল সেদিকে। দ্বিতীয়বার বন্দুক তাক্ করা হ'ল না। ঘোড়ায় করে ফিরে গেলেন সুলতানপুর।

নন্দীগাঁয়ের নয়জন খুন হয়েছে। কিন্তু সুলতানপুরের অর্ধেকেরও বেশী পড়ে রইল ডাকাতে বিলের গায়ে।

সে দিনের মতো থামলেও এই দুই পরিবারে সে লড়াই চলেছে বংশ পরম্পরা—উনবিংশ শতাব্দী ধরে। কমলা সেদিন প্রণাম ক' এলেন অক্ষয় বটকে। . সিঁদুর পরিয়ে দিলেন তার গায়ে। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর মতো দাঁড়িয়ে রইল বটগাছটি।

সব গুছিয়ে নিতে নিতে আরও পাঁচ বছর কেটে গেল। কলকাতা বলে যে শহরটি আগে থেকেই গড়ে উঠছিল—এসময় তার শ্রী আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিমকাল উপস্থিত।

কলকাতাকে কেন্দ্র করে শিল্প বাণিজ্য গড়ে উঠছে। জেলায় জেলায় প্রজাদের চোর ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

নন্দীগাঁয়ের কাছে ইস্‌লামাবাদ শহর। ইংরেজের থানা বসেছে সেখানে। ওরা বলে, ত দেশে শান্তি আসবে।

লাঠির জোরে রাজেন্দ্রনারায়ণ দখল করেছে বহু ভূসম্পত্তি। কাঞ্চণপুরের অঘোরনাথ চৌধুরীর বড়ো মেয়ে কুসুমের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তার। একটু বেশী বয়সেই বিয়ে হ'ল। কমলা নিজে পছন্দ করে বিয়ে দিয়েছেন। সুন্দর মেয়েটি—মুখখানা যেন ফুলের মতো। বারো বছরের মেয়ে—কমলা তাকে কোলে করে ঘরে নিয়ে এলেন। রাজেনের বউ এলো ঘরে।

নহবতে সেদিন ভৈরোঁ বেজে উঠেছিল। এত আনন্দের মাঝেও সবার অলক্ষ্যে চোখের দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল কমলার। নন্দীগাঁয়ের সবাই এসেছে—হিন্দু মুসলমান কেউ বাদ যায়নি। তবুও কোথায় যেন ফাঁক থেকে গেছে। রাজীবলোচনের কথা মনে পড়ল কমলার। রাজীবলোচন বলতেন, 'খোকার আসবে ছোট্ট বউ—আর তুমি হবে শাশুড়ী।'

কমলাও হেসে বলতেন 'আর তুমি' ?

সেদিনগুলো কোথায় !

আবার একটু পেছনে ফেরা যাক্।

লোচনকে যেদিন কোম্পানী বাহাদুরের ফৌজ বেঁধে নিয়ে

লরতন গিয়েছিল হিল্ সাহেবকে সেলাম জানাতে।

হিল্ সাহেব পল্টন নিয়ে গেছে নন্দীগাঁয়ে। কাজেই নীলরতনকে ছুদিন থাকতে হ'ল সাহেবের আসার আশায়। ছোট সাহেব বেলেন্টাইনের চাপরাশ ঘরে সুলতানপুরের জমিদার নীলরতনের বাসস্থান নির্দিষ্ট হ'ল।

হিল সাহেব এল ছুদিন পর। একগাল হেসে টাকার তোড়া নিয়ে সাহেবের পায়ে লুটিয়ে পড়ল নীলরতন।

লাল গোঁফের ফাঁক দিয়ে হিল সাহেবের হাসি—নীলরতনের ভক্তিতে নয়—টাকার তোড়া—দেখে।

ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, আঘাতে জর্জরিত রাজীবলোচন। হিল সাহেব কি যেন বলল নীলরতনকে। ফুটে উঠল নীলরতনের মুখে কুৎসিত দেঁতো হাসি।

নন্দীগাঁয়ের ইজারা নিল নীলরতন। সাহেবের পায়ে সাষ্টাঙ্গে আর একটি প্রণাম জানিয়ে, 'হুজুর মা বাপ' বলে সুলতানপুরে ফিরে এলো সে। নন্দীগাঁয়ে ঢেরা পিটিয়ে দিল সে। 'সবাই খাজনা দেবে নীলরতনের কাছারীতে।'

রাজেন্দ্রনারায়ণ তখন একেবারে শিশু।

তারপর দীর্ঘকাল কেটে গেছে।

বিপদ কাটেনি এখনও। বৈশাখের কঠোর রূপ তৃষাদীর্ণ পৃথিবীকে মুমূর্ষু করে তোলে। বর্ষণমুখর শ্রাবণ আসতে এখনও অনেক দেরি।

নীলরতন কোম্পানির কাছে নালিশ জানাল। নন্দীগাঁয়ের প্রজারা তাকে খাজনা দেয় না। রাজীবলোচনের ছেলে খেপিয়েছে তাদের।

হিল সাহেব নেই। দেশে ফিরে গেছে। অনেকদিন বৌ ছেলের মুখ দেখেনি। মনটা কেমন কেমন করে। সৌরভীকে কিন্তু নেয়নি সঙ্গে। বেলেন্টাইনের সঙ্গেই আছে সে।

নীলরতনের নালিশ শোনার লোক নেই।

কাঙালী রাজেন্দ্রনারায়ণকে পরামর্শ দিল, 'কোম্পানিকে খাজনা দিয়ে দাও বাবু। ওরা টাকার গোলাম। পেলেই চুপ করে থাকবে।' নয়ত আবার হ্যাঙ্গামো করবে।

রাজেন্দ্রনারায়ণ মেনে নিল তার পরামর্শ। লাঠির দিন কি পেরিয়ে গেছে!

কাঙালী আর মাধব গেল খাজনা আর ভেট নিয়ে। কোম্পানির সাহেব বেলেন্টাইন পেয়ে ত খুব খুসী। বেলেন্‌টাইনকে বাঙালীরা বলত বেলাটিন সাহেব। চন্দনা যেখানে গিয়ে সাগরের কাছা কাছি এসে পড়েছে তারই পাড়ে কোম্পানির কাছারী—সবাই বলে বেলাটিনের ঘর। সাহেব বলে 'হৌস'। সে আবার কি? চন্দনার যে সব নৌকা এ পথ দিয়ে যায়—তারা একবার করে বেলাটিনের ঘাটে আসে। কোম্পানি-সায়েবকে নজরানা দিয়ে যায়।

কাঙালী বেলেন্‌টাইনকে দীর্ঘ প্রণাম করে উসুল বাবত খাজনা আর কোম্পানি প্রণামী দিল। সঙ্গে নিয়ে এসেছে জোড়া পাঁঠা। বেলেন্‌টাইন নেশার ঘোরে বলল 'টোমার মুনিব হাচ্ছা আড্‌মী আছে—লেকিন টার বাপ শালা বহুত হারামী আছে। টোমার মুনিব আরহো রুপেয়া পাঠাবে।'

রাজীবলোচনের কথা উঠতেই কাঙালীর আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল 'হুজুর, দেশের লোক বড় গরীব—যা আদায় হচ্ছে, তাই হুজুরের কাছে জমা দিয়ে যাচ্ছি।'

বেলেন্‌টাইন ভুরু কুঁচকে বলল, 'সব শালা বড্‌মাশ—বিস্‌ পন্‌চাস্‌ জুতি লাগাও—রুপেয়া ঠিক নিকলাবে।'

দুর্ভিক্ষের জের তখনও কাটেনি। 'কিন্তু কোম্পানি বলে, জুতি লাগাও।' অভিশপ্ত নন্দীগাঁয়ে সবেমাত্র হাসি ফুটে উঠেছে। কাঙালী ভাবতে পারে না আর—এ কোন রাক্ষুসে ক্ষুধা!

নীলরতন রায় এবার হার মেনেছে। কিন্তু কেবলই বসে ভাবে আবার কবে আগুন জ্বলে উঠবে।

১৭৯৯ সালের আশ্বিন মাস। দুর্গা পূজোর সাড়া পড়েছে নন্দীগাঁয়ে। সারাগাঁয়ে একটি পূজো। প্রতিমা তৈরী হচ্ছে। নানা রকম বাজনার দল এসেছে। যাত্রা হবে, কবির লড়াই হবে।

রাজেন্দ্রনারায়ণ মার কাছে বারবার এসে পরামর্শ নিয়ে যায়। কি কি করতে হবে কমলা বলে দেন। রাজেন্দ্রের একটি মেয়ে হয়েছে। কমলা তার নাম রেখেছেন লক্ষ্মী। তাকে আদর করে চুমু খেয়ে বলেন, 'এবার আমার ঘরে লক্ষ্মী এসেছে।'

লক্ষ্মী 'তা তা' করে জড়িয়ে ধরে কমলাকে। কুসুম বাড়ীর গিন্নী —অন্দরের কাজের তদারক তাকেই করতে হয়। পূজোর আর বেশী দেরি নেই!

কালীর হাটের রামকানাই তাঁতী কাপড়ের গাঁট নিয়ে এলো জমিদার বাড়িতে। পূজোর কাপড়—সবাই পাবে—সবাই পরবে।

দেখতে দেখতে বোধনের দিন এসে গেল। রামমোহন ঠাকুর অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তবু তিনি তাঁর ছেলেকে নিয়ে এসেছেন —পূজোর ভার তাঁর ওপর। পাঁচদিন তাঁরা এই বাড়িতেই থাকবেন।

বোধনের রাতে নিধু ঠাকুর ও মধু গায়েনের কবির লড়াই শুরু হল। ঠাকুর দেবতা নিয়ে নয়—গোড়া থেকেই দুজন দুজনকে নিয়ে পড়ল। নিধুঠাকুর হাত পা নেড়ে গাইতে থাকে—

শুন শুন মহাশয় করি নিবেদন।
মধুর কাহিনী আমি করিব কীর্তন॥

নিধুর দল ধুয়া ধরে—'ভালো বেশ বেশ।'

মধুর কাহিনী শেষ না হতেই—মধু উঠে গেয়ে গেয়ে বলে—

ঠাকুর তোমার খুরে শত প্রণাম করি।
অধীনের দোষ তুমি রাখিও না ধরি॥
শাস্ত্র-পুঁথি পড়িয়াছ নানা আলা-ঝালা।
কালী কৈতে খালি বল গায়ে ধরে জ্বালা।

মধুর দল ধুয়া ধরে—'আহা কিবা চমৎকার'।
রাত ভোর হয়ে আসে তবু গান থামে না।

মহাঅষ্টমী রাতে নবীন অধিকারীর দলের 'রাবণ বধ' পালা শুরু হ'ল। চিকের পেছনে মেয়েরা বসেছে, পুরুষরা সবাই বাইরে। আসরের মাঝখানে ক'খানা তক্তাপোশ বেঁধে উঁচু করে তোলা হয়েছে—সেখানে অভিনয় হবে।

কিন্তু যাত্রা শেষ হতে পারল না। একটি দৃশ্যে এসে সব পণ্ড হয়ে গেল। অশোক বনে সীতা একাকিনী বসে আছেন। পুত্রশোকাতুর রাবণ একপা একপা করে এগিয়ে আসছে। রাবণ আজ সীতাকে বধ করবেই। রাবণ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলছে—

'পুত্রশোকে বুক আমার ভেঙে গেছে—আজ তোকে কেটে তবে আমার শান্তি। জনক-নন্দিনী সীতা, প্রস্তুত হও!'

কথা ছিল মন্দোদরী ছুটে এসে 'কি কর কি কর, প্রাণনাথ—নারী হত্যা মহাপাপ' বলে রাবণকে বাধা দেবে। কিন্তু মন্দোদরী নেই রাবণ খড়গ তুলে দাড়িয়ে আছে—মাঝে মাঝে ফিরে তাকিয়ে দেখছে মন্দোদরী এল কিনা। অধিকারী ডাক দিলেন 'মন্দোদরী—ও হরিশ, রাবণকে ধর্'। মন্দোদরী তখন থেলো হুঁকো নিয়ে মশগুল হয়ে আছে। অধিকারীর ডাক শুনতে পেয়ে ছুটে এলো 'প্রাণনাথ, প্রাণনাথ' বলে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে। আর যায় কোথা রাবণ খড়গ নামিয়ে ঠাস করে চড় কসে দিল মন্দোদরীর গালে। মন্দোদরী ঝাঁপিয়ে পড়ল রাবণের ওপর। সীতা কোনো রকমে দুজনকে

থামালো। রাবণের মত হচ্ছে, সে এরই মধ্যে তিনবার সীতাকে কাটতে পারতো —আর ও বেটা হরিশ বসে তামাক খাচ্ছে। ভেঙে গেল যাত্রা—সবাই হেসে বাঁচেনা। মেয়েরা ক্ষুন্ন হলেন—রাবণ আর বধ হ'ল না।

বিজয়া দশমী। বিসর্জনের সময় ঘনিয়ে এল। এইত সেদিন মা এলেন—তিনদিন পরেই বিজয়ার সুর বেজে উঠল! মেয়েরা মায়ের পায়ে --সিঁদুর ছুঁইয়ে ঘরে রাখলেন। মাটির প্রতিমা— তবু যেন চোখে জল এসে পড়ে। যেন বড় চেনা মানুষটি চলে যাচ্ছে—বড়ো আপনার জন।

চন্দনায় দেবীপ্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হবে। রাজেন্দ্রনারায়ণ গেলেন সঙ্গে' চন্দনার তীরে দাঁড়িয়ে ভরা নদীর দিকে তাকিয়ে আছেন রাজেন্দ্রনারয়ণ। হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন। নদীর মাঝে চর জেগে উঠেছে না? তাইত!

কাঙালীকে ইসারায় ডেকে বললেন, 'চরের মতো ওযে কি দেখা যাচ্ছে না?'

কাঙালী ও বলল, 'তাইত!'

রাজেন্দ্রনারায়ণ গম্ভীরভাবে মায়ের মূর্তিব দিকে তাকিয়ে প্রণাম জানিয়ে বললেন, 'ওই চর আমার এলাকায়। যাবার বেলা ৺মা আমার মুখ তুলে চেয়েছেন। ৺মায়ের এ দান -ওই চরে চিহ্ন দিয়ে এসো। নায়েবকে বলে দাও—আর একটি নতুন দাগ জমা করবে— মৌজা দেবীর চর।'

কাঙালী গদ গদ হয়ে বলল, 'আহা, ও যেন হাসছে'।

এযুগ—জোর করে দখল করার যুগ। শক্তি-পরীক্ষার যুগের রেশ তখনও আছে। দুর্দিনের মানুষটি নিত্যকালের এই পৃথিবীর ওপর আপন জন্মস্বত্ব লিখে রেখে যায়।

একপাল বক দেবীর চর থেকে উড়ে চলে গেল। লম্বা লম্বা সবুজ ঘাসগুলো বাতাসে একবার জলের বুকে নুয়ে পড়ছে আবার ভেসে উঠছে। দেবীর দান –রাজেন্দ্রনারায়ণ আবার সেদিকে তাকিয়ে অদৃশ্য দেবতাকে প্রণাম জানালেন।

ফিরে আসার সময় দীঘির পারে বট গাছটির কাছে এসে রাজেন্দ্রনারায়ণ একবার দাঁড়ালেন। শরতের আকাশে তখনও আলোর লালচে নেশা একটু লেগে আছে। বটের ডালে ডালে কচি সবুজ পাতার হাসি যেন আর ধরে না। বৃদ্ধ বটকে জানালেন প্রণাম। এক ঝলক বাতাস যেন তারই আশীষের মতো তাঁর সর্বাঙ্গ বুলিয়ে দিল।

বাড়ি ফিরে এসে মাকে প্রণাম করলেন।

দশমীর রাত একেবারে বোবা হয়ে গেছে। চারটি দিনের মুখরতা যেন আজ রাতের দেহে মনে অবসাদ এনে দিয়েছে। রাজেন্দ্রনারায়ণ আজ যেন কেমন হয়ে গেছেন। কুসুম এসে দাঁড়াল পাশে! স্বামীকে অমন গম্ভীর দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে তোমার।' অমন করে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

'কিছু নয় কুসুম—'

উত্তরটি পছন্দ হ'লনা কুসুমেব। রাজেন্দ্রনারায়ণও আর কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুসুম তার ঘরে চলে গেল।

রাজেন্দ্রনারায়ণ আপন মনে বলে উঠলেন, 'দেবীর চর! আমার দেবীর চর।'

চন্দনার ওপারে কাঞ্চনপুর। কুসুমের বাপের দেশ। কাঞ্চনপুরের জমিদার অঘোরনাথ চৌধুরী—কুসুমের বাবা। তারও কানে গেল এই চরের খবর। গোঁফে তা দিয়ে বললেন, 'দখল কর।'

সবাই চুপ করে আছে।

অঘোর চৌধুরী হঠাৎ বজ্রনাদ করে উঠলেন, 'একটা পুরুষও নেই এখানে! যত সব শয়তানের দল!'

বাঞ্ছারাম সর্দার হাত জোড় করে বলল,' পুরুষ আছে কর্তা -কিন্তু করবে কি! জামাইবাবু ত ও চরেব দখল নেছে।'

'কে?'

শিরোমণি মশায় এতক্ষণ চুপ করেছিলেন। সুবিধা বুঝে বলে উঠলেন 'কুসুমের বর।'

মুখে কথা নেই অঘোব চৌধুরীর। চরের দখল নিল আমায় একবার জিজ্ঞাসা করল না। এত বড় দুঃসাহস। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল—সবাই যেন মুখ টিপে হাসছে। জামাইর কাছে হার! মুখ তাঁর নির্মম ও কঠিন হয়ে উঠল।

'অসম্ভব! হাঁক দিলেন অঘোর নাথ, ও চর দখল নিতেই হবে।'

'কিন্তু '

'কোনো 'কিন্তু' নেই -কাঞ্চনপুরের অঘোর চৌধুরী এখনও মরেনি। আর ন্যায্য বিচারের বিরুদ্ধেও সে কখনও যাবে না। ঐ চর—চৌধুরীর চর। দখল আমার।'

শিরোমণি শিরে হাত দিয়ে পড়লেন। কেউ ভেবে পায় না কি হবে। কিন্তু মুনিবের হুকুম। লেঠেলরা সব তৈরী হ'ল।

জমিদার গিন্নী সব শুনে, ছুটে এসে বললেন 'ওই চর নিয়ে কার সঙ্গে ঝগড়া করতে যাচ্ছ! ও যে আমার কুসুমের—'

'না—কাঞ্চনপুরের—তুমি যাও।'

অজানা আশঙ্কায় কুসুমের মাব বুক কেঁপে উঠল।

কিন্তু এর কারণ কেউ কোথাও খুঁজে পাবে না। মানুষের লোভ চিরকাল শুধু আগুনের মতো তার লেলিহান জিহ্বা নিয়ে গ্রাস

করেই চলেছে। এ লোভ—ক্ষমতার লোভ--আরও পাবার লোভ।

দেবীর চর আর চৌধুরীর চর! চর জাগে নদীর বুকে আর আশা জাগে মানুষের বুকে।

সে দিন অমাবস্যার রাত। রাতের প্রহরী ওই বৃদ্ধ অক্ষয় বট। অতন্দ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চন্দনার দিকে। চন্দনার বুকে জেগেছে ঢেউ। রাতের অন্ধকারে নদীর বুকে জ্বলে উঠল আলোর মশাল।

ঘুম ভাঙল নন্দীগাঁয়ের। রাজেন্দ্রনারায়ণ খবর নিয়ে পাঠালেন। রহমান ছুটে গেল।

তারপর—সে রাতের কান্না আর সে রাতের হাসির সাক্ষী রইল অমাবস্যার কালো আকাশের তারাগুলো, আর ঐ অশান্ত চন্দনা। চরের মাটিতে তখনও ফসল দেখা দেয় নি। কিন্তু মানুষের রক্তে সেদিন হ'ল তার প্রথম ফসল ফলাবার অভিষেক। কাঞ্চনপুরের কোনো স্বত্ব রইল না এ চরের ওপর। সেদিন যেমন জানত আজও তেমনই সবাই জানে—ও দেবীর চর।

এপার ওপারের দ্বন্দ্বে কুসুমের চোখে জল এসে পড়ে। রাজেন্দ্রনারায়ণ তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন, 'তুমি দিয়েছ শক্তি—দিয়েছ ভালোবাসা আব আছে আমাব মায়ের আশীর্বাদ—আর কিছু চাইনে আমি।'

দেখতে দেখতে বছর কেটে গেছে। আবার পূজো এসে পড়ছে। কুসুমের মা বুকে সাহস বেঁধে অঘোর নাথকে বললেন, 'এবার মেয়েকে নিয়ে এলে হত না।'

'মেয়ে তোমার মরে-গেছে।' পাষাণ অঘোর. নাথ।'

কুসুমের মা শিউরে উঠলেন।

তবু একবার অনুনয় করে বলেন, 'ওই একটি মাত্র মেয়ে।'

অঘোরনাথ বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'মেয়ে একটিমাত্র হতে পারে—তা' ব'লে আমি আমার মান-মর্যাদা খোয়াতে পারিনে। জামাই হয়ে—'

'তুমি শ্বশুর—তুমি ক্ষমা করলে ত সব চুকে যায়। জামাই সে ছেলেমানুষ—নিজের ছেলেও ত না বুঝে ভুল করে।'

'ভুল করলে চাবকাতে হয়—শ্বশুরের প্রতি ভক্তি থাকলে কখনও সে ঐ চর নিয়ে লড়াই করতে আসত না।'

দুঃখে কুসুমের মার বুক ফেটে যায়। কিন্তু উপায় কি। সমাজে মেয়েদের কথার ত কোনো দাম নেই। সে যুগের মেয়েরা শুধু জানে চোখের জল ফেলতে।

অঘোরনাথকে না জানিয়ে কুসুমের মা সেবার নন্দীগাঁয়ে পুজোর তত্ত্ব পাঠালেন। কাঞ্চনপুর আর নন্দীগাঁয়ের শত্রুতার মধ্যেও কুসুমের মার প্রাণ কেঁদে ওঠে তাঁর একটিমাত্র মেয়ের জন্য। সেখানে তার অমর্যাদা, অপমানের কথা মনেই থাকে না। নারী জীবনের মাঝে যে মা বাস করেন, তার বিচার করার অধিকার শুধু মানুষের নয়—দেবতারও নেই।

মায়ের আকুলতার মর্যাদা দেবার মতো বলিষ্ঠতা সবার থাকেও না। মাকে যে চিনেছে সেই শুধু জানে মায়ের মর্যাদা দিতে।

নন্দীগাঁ থেকে পুজোর তত্ত্ব ফিরে এসেছে। রাজেন্দ্রনারায়ণ বলেছে, 'কাঞ্চনপুরের কাছ থেকে নন্দীগাঁ কখনও কাঙালের মতো কিছু হাত পেতে নিতে পারবে না।' কুসুমের কাছে এখবর পৌঁছয়নি।

অতি দুঃখেও কুসুমের মার হাসি পায়। হায়রে, মায়ের ভালোবাসাও কি লাঠির ঘায়ে আদায় করা যায়! মেঘ নিজে থেকেই বৃষ্টিধারা হয়ে নেমে আসে মাটির বুকে—কারও ডাকের প্রত্যাশা তার নেই।

অঘোরনাথের কানে গেছে পূজোর তত্ত্ব ফিরিয়ে দেবার সংবাদ। পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল তাঁর। নন্দীগাঁয়ের এত অহংকার! কাঞ্চনপুরের পূজোর তত্ত্ব ফিরিয়ে দিতে সাহস পায়!

কিন্তু এ অপমান ত নিজেরাই ডেকে এনেছেন। অঘোরনাথ অন্দরমহলে গিয়ে কুসুমের মাকে বললেন, 'আমাকে না জানিয়ে কেন তুমি তত্ত্ব পাঠালে?'

'মেয়ের কাছে তত্ত্ব পাঠাতেও দোষ?'

'মেয়ের কথা বলছি না—নন্দীগাঁয়ে তত্ত্ব পাঠাতে গেলে কেন?'

'আমি অত ভাবতে পারি না—মেয়ে আমার পড়ে আছে পরের বাড়িতে—একবার চোখেও তাকে দেখতে পাইনে—'

'কিন্তু এ অপমান গায়ে পড়ে টেনে নিতে গেলে কেন?'

'আমি যে মা'—কুসুমের মা কেঁদে ফেললেন।

অঘোরনাথের মন তাতে একটুও টলল না। ধীর গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বলেন, 'অপমান ওরা তোমাকে করেনি—করেছে আমাকে। তুমি কেন আমায় ওদের সামনে ছোট করলে?'

উত্তর দিতে পারেন না কুসুমের মা। কারণ মাতৃহৃদয় শুধু একটি ভাষাই জানে—সে ভাষা রূপ পায় সন্তানের প্রতি ভালোবাসায়।

কুসুমেরও মন উতলা হয়ে ওঠে। পূজোর দিনে কাঞ্চনপুরে যে আনন্দের মধ্যে দিনগুলো তার কাটতো—সে দিন ত আর ফিরে আসবে না আজ সে কাঞ্চনপুরের মেয়ে নয়—নন্দীগাঁয়ের বউ।

দেবীর চরের বিবাদ এসে বিরাট ব্যবধান ঘটাল নন্দীগাঁয়ে আর কাঞ্চনপুরে।

কুসুম একা বসে চোখের জল ফেলে। রাজেন্দ্রনারায়ণ তার কাছে এসে বলেন, 'ঘরের লক্ষ্মী চোখের জল ফেললে সংসারের যে অকল্যাণ হয়, কুসুম! কেন তুমি কাঁদো!'

এ কান্না কেন তা যে কুসুম মুখ ফুটে বলতে পারে না। স্বামীর ঘর আর শান্তিময় পরিবেশ দুইই নারীর কাম্য। স্বামীর ঘর সে পেয়েছে—কিন্তু তবুও যেন কোথায় ফাঁক থেকে যায়। স্বামীর অফুরান ভালোবাসাও সে পেয়েছে। তবু কাঞ্চনপুরের মাটিও যে তাকে ইসারা করে—সেই ডাকে ত সে ঠিক তেমন সহজভাবে সাড়া দিতে পারে না।

অঘোর চৌধুরী ভোলেন নি সেদিনের অপমানের দুঃখকে। ওই দেবীর চরের নতুন মাটি নতুন সবুজ ঘাস তাঁর প্রতিটি রক্তবিন্দুকে উত্তপ্ত করে তোলে। একটা কিছু করতে হবে—অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে।

ঈশান সর্দারকে ডেকে পাঠালেন অঘোর চৌধুরী। এ ডাকের অর্থ ঈশান বোঝে। আবার কোথাও বুঝি লাঠি নিয়ে জমিদারের মান রাখতে হবে!

ঈশান আসতেই অঘোরনাথ বলেন, 'ওই দেবীর চর আমার চাই—মহাষ্টমীর রাতে ওর দখল নিতে হবে।'

ঈশান ইতস্তত করে। জবাব না পেয়ে অঘোর চৌধুরী অধৈর্য হয়ে ওঠেন।

'কি, চুপ করে রইলি যে!'

'কর্তা—জামাইবাবুর সঙ্গে আবার লড়াই!'

'জামাইর সঙ্গে লড়াই নয়—দেবীর চরের জন্য লড়াই।'

'তবু—দিদিমণি রয়েছে—'

অঘোর চৌধুরী আজ অন্ধ—মেয়ের কথায় মনে তাঁর কোনো দুঃখ বাজে না। এটাই সে যুগের ক্ষমতালোভী সম্পদলোভী মানুষের একমাত্র পরিচয়। অশিক্ষিত ঈশান সর্দারও যা বোঝে, অঘোর চৌধুরী তা বুঝতে পারেন না। তাই ঈশানের কথায় তিনি বিরক্ত হয়ে বলেন, 'আমি বলছি—তুই লেঠেল যোগাড় করে রাখ্।'

অঘোর চৌধুরী কাছারি ঘর থেকে উঠে চলে গেলেন।

চন্দনার বুকে অষ্টমী রাতের চাঁদের আলো দেখা দিয়েছে। কাঞ্চনপুরের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে দেবীর চরে।

অঘোর চৌধুরী অস্থির হয়ে ঘরে পায়চারি করছেন। কুসুমের মা ধীরে ধীরে এসে পাশে দাঁড়ালেন। অঘোরনাথ ফিরেও তাকান না তাঁর দিকে।

'মেয়ের কথা একবারও ভাবলে না', কুসুমের মার চোখের জল বাধা মানে না।

'এখন আমায় বিরক্ত কোর না—যাও—' 'অঘোরনাথ তাকিয়ে আছেন চন্দনার দিকে।

'তোমরা শুধু নিজেদের মানটাই দেখলে—একটুও মায়া মমতাও নেই তোমাদের! এমন পাষাণ তোমরা!'

অঘোর চৌধুরী কোনো জবাব দিলেন না। আজ এ কথা তাঁর কাছে অবান্তর।

দেবীর চরের হিন্দু-মুসলমান সবাই নন্দীগাঁয়ের দত্তবাড়িতে জমায়েত হয়েছে! মহা-অষ্টমীতে কালী-যাত্রা হচ্ছে। সবাই পুজোর আনন্দে মেতে আছে।

হঠাৎ রহমান ছুটে এসে বলল, 'দেবীর চরে কারা যেন আগুন ধরিয়েছে?' রাজেন্দ্রনারায়ণ চমকে উঠলেন। তিনি বুঝলেন এ কার কাজ। রহমানকে ডেকে বললেন, 'কাঞ্চনপুরের একটা লেঠেলও যাতে ফিরে যেতে না পারে। আমি যাচ্ছি।'

দেবীর চরে আবার আগুনে-রক্তে মিলে মানুষের শ্মশান-শয্যা রচিত হল। সেদিনও অঘোর চৌধুরীর মান বাঁচাতে পারেনি ঈশান সর্দার। সেই দুঃখে সে আর ফিরেও যায়নি কাঞ্চনপুরে। দেবীর চরেই ঈশানের মৃতদেহ পড়ে থাকে। অর্থগৃধ্নু ধনীর উন্মত্ততায় চিরকাল সাধারণ মানুষ এভাবেই নিজেদের বলি দিয়েছে।

কাঞ্চনপুরের অভিমান চিরদিনের জন্য চূর্ণ হয়ে গেল।

নন্দীগাঁ ও কাঞ্চনপুরে দু'টি নারী জীবনের অব্যক্ত ব্যথা কেউ জানল না—জানতে চাইল না। কুসুমের মা প্রতিদিন চন্দনার ওপারের অস্পষ্টতার দিকে তাকিয়ে চোখের জল ফেলেন। অঘোর নাথের ভয়ে কিছু বলতেও পারেন না। পুজো করতে বসে লক্ষ্মী নারায়ণের কাছে বারবার মাথা খুঁড়ে বলেন, 'ঠাকুর, আমার কুসুমকে ভালো রেখো—ও যেন দুঃখ না পায়।'

পাথরের দেবতা কি মানুষের ব্যথা বোঝে?

কুসুমও প্রতিদিন নীরবে বসে কাঁদে। রাজেন্দ্রনারায়ণ সব বুঝলেও চুপ করে থাকেন। ভালোবাসা ও আত্মমর্যাদার দ্বন্দ্ব—রাজেন্দ্রনারায়ণ এই দ্বন্দ্বের মাঝে নিজেকে সচেতন রাখতে চান—নিজের প্রতি, নন্দীগাঁয়ের প্রতি—তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে।

নন্দীগাঁ আর কাঞ্চনপুরের ব্যবধান আরও বেড়ে গেল। কমলা কুসুমকে ডেকে বলেন, 'আমার কাছে এসে বস, মা।' কুসুম তাঁর কাছে গিয়ে বসে। মায়ের অভাব মেটাতে চায় কমলাকে দিয়ে।

তবুও মেটে কই!

রাত্রির নির্জনতায় মৌন অক্ষয়বটের উদ্দেশ্যে কুসুম প্রণাম জানিয়ে বলে, 'এই দুঃখ, এই ব্যবধান তুমি দূর কর ঠাকুর!'

অক্ষয়বটের ডালে ডালে শোনা যায়—সে যেন বলে চলেছে, 'মানুষের তৈরি দুঃখ—আমি কি ক'রে দূর করি বল। দিনের আলোয়—রাতের আঁধারে আমি শুধু রচনা করে যাই মানুষের সুখ-দুঃখের ইতিহাস। তার রূপ—তার স্বাক্ষর আমার পাতায় পাতায়। আমি তাকে চিনি—তাকে বরণ করি—কিন্তু দূর করতে পারিনে।'

অঘোর চৌধুরী খেপে গেছেন। অথচ নিজের সম্মান বাঁচাবার আর কোনো খুঁজে পান না। এই দুঃখ ভোলবার একমাত্র পথ তিনি পেলেন—মদের নেশায়।

বাড়ির সবাই ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়। দিনের পর দিন অঘোর চৌধুরী মদের নেশায় ডুবে আছেন। নায়েব বিহারী সরকার কুসুমের মাকে বলেন, 'মা আপনি একবার তাকান—নইলে সবই যে যাবে!'

'উনি যে কারও কথা শুনছেন না।'

'তবুও একবার আপনি বলুন মা—'

কুসুমের মা স্বামীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। অঘোরনাথ নেশা-জড়ানো চোখে তাঁর দিকে একবার তাকিয়েই আবার চোখ বোজেন।

'কি চাই'—অঘোরনাথ চোখ বুজে বলেন।

'একবার জমিদারির দিকে ফিরে তাকাও,' কুসুমের মা অঘোরনাথের কাছে এসে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন।

'কোনো দিকে ফিরে তাকাবার আমার সময় নেই'।

'ছেলেরা ত রয়েছে—তাদের কি হবে?'

'কেউ নেই—সব মরেছে।'

'ছিঃ, ওরকমভাবে বোলনা—ওদের অকল্যাণ হবে।'

'বিরক্ত কোরো না—তোমার ঐ কান্না আমার ভালো লাগেনা। যাও, বেরিয়ে যাও,' অঘোরনাথ চিৎকার করে উঠলেন।

আর কিছু বলার সাহস নেই কুসুমের মার। ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসেন স্বামীর ঘর থেকে। বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন কুসুমের মা। দিনেব আলোয় চন্দনার হাসি আর ধরেনা। কিন্তু কুসুমের মার চোখের জলও আর থামতে চায় না। স্বামী তাঁর অন্ধবেগে বিপদের দিকে ছুটে চলেছেন। মেয়ে রইল দূরে ওই ওপারে। প্রচণ্ড উন্মত্ততার দুরন্ত বেগের কাছে এই ক্ষুদ্র নারী-হৃদয়ের কান্নার কোনো মূল্য আছে কি!

অঘোর চৌধুরী প্রতিদিন ভাবেন কি করে এ অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া যায়। নিজের অপমানের গ্লানি যখন আঘাত করে—তখন তিনি মদের নেশায় ডুবে থাকেন—ভুলতে চান দুঃখকে।

মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠেন, 'মেয়ে জামাই সব মরেছে, তাদের রক্ত দিয়ে দেবীর চর ধুইয়ে দেব।'

কুসুমের মা শিউরে ওঠেন। লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহ বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'আমার কুসুমকে তুমি দুঃখ দিওনা, ঠাকুর।'

পাষাণ-দেবতা, স্বামী, সন্তান—কুসুমের মার জগতে এ ছাড়া আর কেউ নেই, আর কিছুর দরকারও নেই।

আর একদিকে—'আমি ও আমার মর্যাদা, আমার সম্মান'—অঘোরনাথের জীবনের মূল মন্ত্র।

প্রতিশোধ নেবার হিংস্র বাসনা তাঁকে অন্ধ ক'রে রেখেছে—ভুলিয়ে দিয়েছে তাঁর জীবনের কোনো একদিনের মমতা-মাখানো প্রাণশক্তিকে।

এই অন্ধশক্তির উন্মত্ততায় মানুষ চিরকাল আপনারে ধ্বংস করেছে। রাবণ সোনার লঙ্কা শেষ করে দিল—দুর্যোধনের মর্যাদা-বোধ কুরুক্ষেত্রের বুকে রচনা করল মহাশ্মশান। সেখানে জানকী, চিত্রাঙ্গদা, মন্দোদরীর অশ্রু ব্যর্থ হয়ে গেছে—ব্যর্থ হয়েছে সুভদ্রা, গান্ধারী, উত্তরা ও লক্ষ লক্ষ নারীর চোখের জল।

সেই অন্ধ উন্মত্ততার আজও অবসান ঘটেনি। কালাপাহাড়ের দুর্জয় লিপ্সা মরণ-উল্লাসে মেতে উঠে নিজেকেও শেষ করে দেয়। অঘোর চৌধুরীর জীবনে সেই মৃত্যুবীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে।

পুত্রের চিতাশয্যায় আসীন রাবণ—সেখানে স্নেহ-ভালোবাসা—অসহায় নারীর আর্তনাদের মতো। তাই তো আত্মাভিমান অঘোর চৌধুরীকে উন্মত্ত করে তোলে। তিনি ভুলে যান ভালোবাসাকে—চোখের সামনে দেখতে পান না—এই শ্যামল সজল পৃথিবীকে—ওই সুদূরের নীল আকাশকে।

এ যুগের চিত্রাঙ্গদা—ওই কুসুমের মা। তাঁরা চোখের জলে রচনা করে যান জীবনের করুণ মুহূর্তগুলো। এ যেন পথ-প্রান্তের মানুষের দৃষ্টির আড়ালে ফোটা ছোট্ট ঘাসের ফুলের মতো।

অঘোর চৌধুরীর মনে হয় দেবীর চরের লড়াইতে হারার মতো ব্যর্থতা আর নেই। তাঁর সুখ প্রবৃত্তির উন্মত্ত চরিতার্থতায়, আনন্দের প্রশান্তিতে নয়।

আঘাত—শুধু আঘাত হানা ছাড়া জীবনে আর কোনো কামনা নেই।

ওই পর্যন্তই। অষ্টাদশ-উনবিংশ
দিনের অবসান ঘটছে—আসছে নতুন
খেয়াল নেই। জমিদার—সে রাজাব সামিল।
দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে। উন্মত্ততায় ভুলে গেছে তার।
পরিজন বন্ধু—সবাইকে।

একটি একটি করে দিন কালের স্রোতে ভেসে যায়।

কুসুম আর কাঞ্চনপুরে যায়নি।

রিক্ত শীতের তীক্ষ্ণ তুহিন আঘাতে অক্ষয়বটের হাসি গেছে ঝরে।

চন্দনার এপার আর ওপার। এপারে নন্দীগাঁ—ওপারে কাঞ্চনপুর।

কিন্তু মনে হয় কতদূর—

কতো রাত্রিব নির্জনতায় বসে বসে চোখের জল ফেলেছে। বাবা, মা, ভাই—এরা ওপারে—আর কুসুম বইল নন্দীগাঁয়ে চিরদিনের মতো।

এখানে শুধু তার আপন জন—তার স্বামী আর ঐ গ্রামবৃদ্ধ অক্ষয়বট। তবু দিনেব পর দিন কেটে যাবে কুসুমের।

আশ্চর্য এই মানুষ!

॥ তিন ॥

কাল বদলের পালা শুরু হ'ল। অক্ষয়বটের জটায় জটায় গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে নতুন নতুন গাছের সম্ভাবনা জেগে উঠেছে। মূল গাছের গোড়াটা জীর্ণ হয়ে এসেছে। তবুও কোনো রকমে টিঁকে আছে।

ইংরেজ নিজের হাতে নিয়েছে দেশের শাসনভার। তবে জমিদারদেরও জিইয়ে রাখল তারা। প্রজাপীড়নের মহাযন্ত্র এই জমিদারশ্রেণী। এরা না থাকলে চলে কি করে?

মানুষের প্রাণের সুর লোপ পেয়ে যাচ্ছে। খেউড় গানে আকাশ-বাতাস মাতাল হয়ে উঠেছে।

নতুন গঞ্জের সৃষ্টি-হ'ল। ফৌজদার রহমৎ আলি তাঁর নামে রহমৎগঞ্জ স্থাপনা করলেন। দোকানপাটে ছেয়ে গেল রহমতের গঞ্জখানা। নন্দীগাঁয়ের মানুষও বেসাতি নিয়ে আসে এই গঞ্জে।

নন্দীগাঁ থেকে অনেক অনেক দূরে আজব শহর কলকাতা। বাঙলা দেশের রাজা ইংরেজ—রাজধানী তার কলকাতা। সুতানুটী, গোবিন্দপুর আর কলকাতা তিনখানা গ্রাম গেঁথে একখানা শহর কলকাতা গড়ে উঠেছে। জব চার্ণকের কলকাতা। একদল বাঙালী ভদ্রলোক কলকাতায় এসে বাসা বাঁধলেন। ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে টুকিটাকি ব্যবসা চলল। বাঙলার বাইরের লোকও আসছে। ধন-দৌলত ধীরে ধীরে তাদের বাড়ছে। বিষফোঁড়ার মতো গেঁজিয়ে উঠছে সমাজ-জীবনে বিকৃতি। বাঙালী-জীবনে এই বিকৃতি মোগল-আমল থেকেই শুরু হয়েছিল। ইংরেজরা আসার পর নতুন টাকাপয়সা-পাওয়া লোকগুলোর মন আরও বিগড়ে গেল।

এ ঢেউ নন্দীগাঁয়েও কিছু কিছু এসে পৌঁচেছে. ভিত্তিতে কলকাতার সঙ্গে সঙ্গে তার অনতিক্রমণী: কোনো বিপর্যয় ঘটাতে পারেনি। পাছে নতুন কালের . আবার ভাঙন ধরায়, তার জন্যে সমাজকে—তার প্রাচীন ধর্মধা. বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে। জাতের বিচার আগের চে. আরও কঠোর হয়ে দেখা দিল। বামুনপাড়া, কায়েতপাড়া, কাহার-পাড়া—সব আলাদা হয়ে গেল।

নন্দীগাঁয়ের ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠাও কালের হাওয়ায় উল্‌টে গেল। রাজেন্দ্রনারায়ণ বার্ধক্যের সীমায় এসে পড়েছেন। মা কমলা অতি বৃদ্ধা হয়ে পড়েছেন। লক্ষ্মীর বিয়ে হয়েছে। লক্ষ্মীর পর রাজেন্দ্র নারায়ণের দু'টি ছেলে জন্মেছে—দেবীপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ।

নীলরতন আর অঘোর চৌধুরী বেঁচে নেই। তাঁদের ছেলেরা হয়েছে জমিদার।

দেবীর চবে ধানের শিষে হাসি খেলে যায়। তবুও সব একটানা একভাবে কাটে না।

কয়েকদিন ধরে কমলার শরীর ভালো যাচ্ছে না। গাঁয়ের নীলকমল কবিরাজ প্রতিদিন এসে দেখে যান। রাজেন্দ্রনারায়ণ প্রতিদিন উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—'কবিরাজ, মা বাঁচবেন তো?'

'বয়েস হয়েছে—সবই তাঁর ইচ্ছা।' আকাশের দিকে হাত তুলে দেখান নীলকমল কবিরাজ।

'তুমি ওষুধ দিচ্ছ—আর এটা বলতে পারো না!'

'ফল ত তাঁর হাতে', বলেই নীলকমল আবার ওপর দিকে তাকিয়ে দুহাত তুলে প্রণাম করলেন।

মানুষ এত অসহায়!

এণ অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করেন। মাঝে
.রর কাছে এসে উঁকি দিয়ে দেখেন। কুসুম কমলার
এ আছে।

বাইরে রসিক পণ্ডিতের কাছে ছেলেরা পড়ছে—

জগদীশ্বরের বল কে বুঝে মহিমা।
মূর্খ নরে কভু হায় দিতে নারে সীমা॥
অপ্রত্যক্ষ থাকি তবু প্রত্যক্ষ সে হয়।
সর্বত্র বিরাজমান শাস্ত্রাদিতে কয়॥

রাজেন্দ্রনারায়ণের মনে হয়—এসব মিথ্যে কথা—যদি তাই হবে, তবে মার জন্য তিনি নেই কেন!

কুসুম কাছে এসে বলল, 'মা তোমাকে ডাকছেন।'

রাজেন্দ্রনারায়ণ ছুটে গেলেন মার কাছে। কমলা তাঁর হাতখানা টেনে নিয়ে করুণ হাসি হেসে বললেন, 'ওরকম চুপ করে থাকিস্‌নে, বাবা! মা কি কারও চিরকাল থাকে। তুই বড় হয়েছিস, মেয়ের বিয়ে দিয়েছিস—এবার আমায় যেতে হবে।'

রাজেন্দ্রনারায়ণ পাথরের মতো বসে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। মুখে তাঁর কোনো কথা নেই। এই সেই মা—বাবাকে তাঁর মনে নেই। কিন্তু মা যে তাঁর জীবনে কতোখানি—কাকে তিনি বোঝাবেন।

কমলা আবার বললেন, 'যে কদিন আছি—তোরা আমার কাছে কাছে থাকিস।'

কবিরাজের ওষুধ আর খেতে ইচ্ছে নেই তাঁর। গঙ্গাধর আচার্য প্রতিদিন এসে গীতার মোক্ষযোগ পড়ে শোনায়—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সব ছেড়ে এসো—আমার শরণ নাও। কমলার চোখ ছল ছল করে ওঠে। এবার ডাক এসেছে তাঁর। কিন্তু বড় আদরের এই নন্দীগাঁ—আর তার মানুষ। মায়া যে কাটানো যায়না!

ঝড়—ঝড়—দুরন্ত ঝড় এলো। মাতাল হাওয়া আকাশে মাটিতে পাগলের মতো নেচে বেড়াচ্ছে। বাইরে প্রকৃতিতে দুর্যোগ—মানুষের জীবনে দুর্যোগ। হঠাৎ একি—চন্দনার জল যেন ফুলে ফুলে উঠছে। গাছপালা ভেঙে পড়ছে। কুসুম ছুটে এসে রাজেন্দ্রনারায়ণকে জড়িয়ে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'তুমি ঘরে এসো—বাইরে থেকো না।'

অক্ষয়বটের একটি ডাল মড়মড় করে ভেঙে পড়ল।

ঝড়ের রাতে কে যেন ডাকছে—'ছোট কর্তা—ছোট কর্তা!'

রাজেন্দ্রনারায়ণ এই ডাকটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মার অসুখের বাড়াবাড়ি দেখে মাধবকে পাঠিয়েছিলেন লক্ষ্মীকে আনতে।

'কে, মাধব?' রাজেন্দ্রনারায়ণের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।

'কর্তা'—আর বলতে পারেনা মাধব।

'কি হয়েছে, মাধব—'

'মার আমার সিঁথির সিঁদুর, হাতের নোয়া নেই—জামাইঠাকুর সাতদিন জ্বরে ভুগে আজ সকালে—

'সকালে কি—'

'কিন্তু সে নয় কর্তা—মাকে সতী হতে হবে। আমায় ওরা মার সঙ্গে দেখা করতে দিলেনা—কর্তা, মাকে বাঁচান',—মাধব লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

কুসুম শুনতে পেয়েছে সব—হঠাৎ ঘরের ভিতর চিৎকার করে উঠ্ল—'না-না, সে হবে না!' ছুটে এসে রাজেন্দ্রনারায়ণের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে সে বলল, 'ওগো নিয়ে এসো—ওকে নিয়ে এসো আমার কাছে।' মায়ের বুক-ফাটা কান্না ঝড়ের গর্জনে মিলিয়ে যায়।

সতী হ'তে হবে লক্ষ্মীকে—সহমরণের আগুন পুড়িয়ে মারবে আমার লক্ষ্মীকে। না—সে হ'তে পারে না।

রাজেন্দ্রনারায়ণের চোখে এক ফোঁটা অশ্রু নেই।

দীর্ঘ আট ক্রোশ পথ—নন্দীগাঁ থেকে অনেক দূর লক্ষ্মীর শ্বশুর বাড়ি—কালিকাপুর।

হঠাৎ অন্ধকারে ছুটে বেরিয়ে গেলেন রাজেন্দ্রনারায়ণ। কিছুক্ষণ পর ঝড়ের শোঁ শোঁ শব্দের মাঝে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল।

'বৌমা, বৌমা'—কোমল দুর্বল কাতর কণ্ঠের ডাক—

কুসুমের কানে পৌঁছল না সে ডাক। কেবল হাত জোড় করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কেঁদে বলে, 'ঠাকুর, আমার লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও।'

রাজেন্দ্রনারাণের পথ যেন আর ফুরোয় না—কতদূর—আর কতদূর!

অক্ষয়বটের আর একটি ডাল ভেঙে পড়ল।

মানুষের গড়া শাস্ত্রবিধি। সতী নারীর পতি ছাড়া আর গতি নেই। জীবনে মরণে তাঁরই সঙ্গে ছায়ার মতো থাকতে হবে। সহমরণে যেতে হবে—সমাজ-বর্বরতার বীভৎস নিয়ম।

লক্ষ্মীকে সবাই ঘিরে বসে আছে। সবাই তাকে বিয়ের বেশে সাজিয়েছে—কপালে সিঁদুর তার আগুনের মতো জ্বলছে। সন্ধ্যার গোধূলি লগ্নে কালিকাপুরের সবাই দেখবে সতী নারী কাকে বলে।

ও গাঁয়ের মামুদ মিঞার বউ একবার বলেছিল, 'আহা, এমন কচি মেয়েটাকে তোমরা মারবে?'

সবাই তাকে ধমকে বলে, 'চুপ কর্ হতচ্ছাড়ী, ও কথা বলিসনে—তোরা মুসলমান, সতীর মর্ম কি বুঝবি!'

যেন সতীত্ব শুধু হিন্দুধর্মের জীর্ণ খুঁটি আঁকড়ে পড়ে আছে।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের কোণে মেঘ জমে উঠেছে। লক্ষ্মীর শ্বশুর সীতারাম ঘোষ হুকুম দিলেন—'ওরে, তোরা বাদ্যি বাজা।'

লক্ষ্মী কেবলই বলছে, 'আমার বাবাকে একটু খবর দাও—আমাকে তোমরা মেরে ফেলো না।'

কিন্তু কে শোনে তার কথা। ষোলো বছরের মেয়ে—তার কান্না আজ সমাজের নিষ্ঠুর কোলাহলের মাঝে মিলিয়ে যায়।

ঝড়ের বুকেও আগুন জ্বলে। নিবে গিয়েও আবার জ্বলে ওঠে। সবাই লক্ষ্মীকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়।

লক্ষ্মীর কান্না—'বাবা, আমাকে নিয়ে যাও!' সে কান্না ছাপিয়ে ঢাক বেজে ওঠে—তাই কেউ শুনতে পেলো না সে আর্তনাদ।

মানুষ নতুন কোনো উদ্দীপনার উপকরণ পাচ্ছেনা জীবনে—তাই এই সৃষ্টি-ধ্বংসের বর্বর উল্লাস।

রাজেন্দ্রনারায়ণ যখন এসে পৌঁছলেন তখন চিতার আগুন নিবে এসেছে। সবাই সতীমায়ের জয় ঘোষণা করছে।

ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে গেলেন রাজেন্দ্রনারায়ণ। ওরা তখন চিতার আগুন নেবাচ্ছে।

'সীতারাম!' অন্ধকারের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে যেন প্রচণ্ড বজ্রপাত হ'ল।

মশালের আলোতে সবাই দেখল—রাজেন্দ্রনারায়ণ। তাঁর দুই চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। হাতে একখানা ছোরা। তাঁর রুক্ষ ভীষণ মূর্তি দেখে সবাই পালাল। সীতারামও গা ঢাকা দিচ্ছিলেন। রাজেন্দ্রনারায়ণ তাকে ধরে ফেললেন। আজ সীতারাম যেন একান্ত অসহায়। রাজেন্দ্রনারায়ণ নির্লিপ্ত কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার লক্ষ্মী কোথায়?'

উত্তর নেই।

'লক্ষ্মী কোথায়?' কণ্ঠস্বর আরও তীব্র।

শূন্য চিতার দিকে তাকিয়ে থাকে সীতারাম। তার দলের লোক সবাই পালিয়েছে।

কালিকাপুরের মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে রাজেন্দ্রনারায়ণ আর সীতারাম। নিজেকে একবার মুক্ত করতে চাইলেন সীতারাম। সন্তান-হারা পিতার বজ্রমুষ্টি—ও আর ছাড়ানো যায় না।

'জীবন নিয়ে ছিনিমিনি রাজেন্দ্রনারায়ণও খেলতে জানে।'

হিংস্র দানব জেগে উঠেছে—রাজেন্দ্রনারায়ণ আমূল ছোরা বসিয়ে দিলেন সীতারামের বুকে। 'উঃ, মাগো'—বলে লুটিয়ে পড়ল সীতারাম।

'মাগো!• মাকে খুন করে আবার—'

শ্মশানকালীর মন্দিরের ওপর কর্কশ কণ্ঠে পেঁচা ডেকে উঠল। তালগাছের ওপর শকুনের ছানা কাঁদছে—ঠিক যেন শিশুর কান্না।

ছ'হাতে সীতারামের রক্ত। লক্ষ্মীর চিতার কাছে এগিয়ে গিয়ে রাজেন্দ্রনারায়ণ বলে উঠলেন, 'বুকের জ্বালা এখনও মেটেনি, মা! আমি আসছি তোর কাছে।'

পরদিন। ক্লান্তবর্ষণ প্রভাতটি। সূর্য লুকিয়ে আছে মেঘের আড়ালে। রাজেন্দ্রনারায়ণ এসে পৌঁছলেন নন্দীগাঁয়ে। অক্ষয়বটের পাতায় পাতায় বৃষ্টির জল যেন চোখের জলের মতো লেগে আছে।

বাড়ির দিকে ফিরতেই রাজেন্দ্রনারায়ণের মনে হল যেন সারা বাড়িখানা কাঁদছে। একদিন লক্ষ্মী এ বাড়ি থেকে এগারো বছর বয়সে বউ হয়ে পাল্কী করে কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়ি যায়। আজ তার সেই কান্না বুকে করে রাজেন্দ্রনারায়ণ ফিরে এসেছেন। লক্ষ্মীকে বাঁচানো গেল না—সমাজ-শাপের অগ্নিনিশ্বাস তাকে পুড়ে ছাই করে দিয়েছে।

সদর দেউড়ি পার হতেই শুনতে পেলেন কান্নার রোল। কারা যেন কাঁদছে! কুসুম শুধু দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে। কারও মুখে কোনো কথা নেই। রাজেন্দ্রনারায়ণ আর কুসুম ছ'জন ছ'জনের দিকে তাকিয়ে আছেন। রাজেন্দ্রের মুখ দেখে কুসুম বুঝেছে সব। কাঁদবে কি—চোখের জল যে গেছে শুকিয়ে। বুক পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ মরুভূমিতে জল কোথায়!

'মা নেই!' কুসুম বলল। যেন পাথরের মূর্তির চাপা ঠোঁট নড়ে উঠল। একরাতে কুসুমের চেহারা বদলে গেছে।

রাজেন্দ্রনারায়ণ মাতালের মতো টলতে ট
গিয়ে ঢুকলেন। কমলার মুখখানা কী শা
তাঁর মা।

'তুমিও গেলে মা!' এবার রাজেন্দ্রনারায়ণে.

বাপের অদ্ভুত চেহারা দেখে দেবীপ্রসাদ ও
পেয়ে গেছে।

নন্দীগাঁয়ের মা নেই—কমলা নেই। গাঁয়ের সব।
করে উঠল। রহমান মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে। কাঙা
জল মুছে বলে, 'নন্দীগাঁয়ের ওপর কার যেন অভিশাপ লেগে

একদিকে অরাজকতা—অন্যদিকে সমাজের অন্যায় শাসন।

নন্দীগাঁয়ের বুকে আর একখানি রাত নেমে এলো—বে
দুঃখের, বড়ো দুর্যোগের রাত।

মায়ের শেষ কাজ সেরে উত্তরীয় গলায় অক্ষয়বটের নীচে এসে বসলেন রাজেন্দ্রনারায়ণ। সঙ্গে যারা ছিল তাদের বললেন, 'তোমরা যাও—আমি পরে যাচ্ছি।'

রাতের অন্ধকারে দিঘির কালো জলে কি যেন এক অপূর্ব রহস্য জড়িয়ে আছে। মেঘ কেটে গেছে। আকাশের তারাগুলো জলের উপর যেন ভয়ে কাঁপছে। নাম-না-জানা পোকাগুলোর অক্লান্ত গান শোনা যায়। জোনাকিগুলো একটি বুনো গাছের ঝোপকে ঘিরে কেবলই জ্বলছে আর নিবছে। কোথায় যেন রাত-জাগা একটি পাখি হঠাৎ ডানা ঝাপটে আবার থেমে গেল।

রাত তেমন গভীর হয় নি। তবুও সারা নন্দীগাঁখানা যেন ক্লান্ত হয়ে ঢলে পড়েছে। রাজেন্দ্রনারায়ণ ভাবছেন—মা, লক্ষ্মী—দুজনেই চলে গেল। অনেক দুঃখ, অনেক দীর্ঘশ্বাস বুকে নিয়ে মা গেলেন। কিন্তু লক্ষ্মী! জোর করে তাকে মেরে ফেলেছে। অপাপবিদ্ধ অসহায় কচি মেয়েটির কি বাঁচার অধিকারও নেই! পৃথিবীতে তার জন্যে একটু জায়গা হল না! এই বৈধব্যের জন্য সেই কি শুধু দায়ী! এর কি কোনো প্রতিকার নেই!

' রামমোহন রায় সতীদাহপ্রথা বন্ধ করার জন্য
ন্দোলন করছেন। ইংরেজ সরকারকে অনেক
আবেদন জানিয়ে কিছুটা ফল পাওয়া গেছে।
না—আইন হচ্ছে। কোনো কোনো ইংরেজ
মেয়েদের উদ্ধার করেছে। কিন্তু তারা আর
য়নি।

এই খবর এসে পৌঁছয়নি।

সহমরণের খবর কেউ জানবে না কোনোদিনও।

পরিবারের একটি পুরুষ গত হ'ল। রাজীবলোচন নেই—
ও নেই। এই পরিবারের একটি অধ্যায় শেষ হ'ল।

রাজেন্দ্রনারায়ণ ধীরে ধীরে বাড়ি এসে সদর দালানের বারান্দায় বসে পড়লেন। কাঙালী বসে আছে একটু দূরে। একবার শুধু সে বলল, 'একটু জল—।'

রাজেন্দ্রনারায়ণ অবাক হয়ে ভাবছেন, বোবা দালান—বোবা গাছগুলো—তারাও বোঝে মানুষের ব্যথা। সমস্ত বাড়িখানা যেন শোকে মূর্ছা গেছে। এতগুলো মানুষ—কেউ একটি কথাও বলছে না। কি যেন এক মৃত্যুর ছায়া বাড়িখানাকে ঘিরে আছে।

ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়েছে। ভেতর বাড়ি থেকে ভৃত্য চরণ এসে জানাল, 'মা একবারে ভেঙে পড়েছেন।'

কুসুম কাঁদছে—কিন্তু কি করে তিনি তার সামনে দাঁড়াবেন। সন্তানহারা মা—!

ধীরে ধীরে গেলেন কুসুমের কাছে।

কুসুম পড়ে আছে মাটিতে। কর্তা সামনে আসতেই দাসীরা সরে গেল। রাজেন্দ্রনারায়ণ কুসুমকে হাত ধ'রে তুললেন। ধীরে ধীরে তার মাথাটি বুকে চেপে ধরলেন।

বাইরে বর্ষণ থেমেছে কিন্তু এই দুটি মানুষের বুকে জেগে উঠল বর্ষামুখর শ্রাবণ-রজনীর একটি তীব্র অথচ করুণ মুহূর্ত।

'ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে বুক বাঁধতে হবে, কুসুম—তুমি যে মা,—' কথা শেষ করতে পারলেন না—বৃদ্ধের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে একটি মাতৃহারা শিশু কেঁদে উঠল—কমলা নেই।

চোখের জল মুছে, রাজেন্দ্রনারায়ণের বুকে মাথা রেখে কুসুম বলে, 'আমি মা—তাই ত পারি না।'

ঘুমের মধ্যে কে যেন কেঁদে উঠল—ছেলেরা কেউ হবে। কুসুম গেল সেদিকে। রাজেন্দ্রনারায়ণ বেরিয়ে এলেন। এ রাত যেন আর কাটতে চায় না। বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

উদ্ধত অক্ষয়বটের একটি ডাল মাথা উঁচিয়ে তাকিয়ে আছে তাঁর পানে।

মনে মনে বলে উঠলেন রাজেন্দ্রনারায়ণ, 'সবই একে একে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়—তবুও অক্ষয়বট, তোমার কোনো ক্ষয় নেই। আমার মতো কোনো দুঃখ ত নেই তোমার!'

একটি মন্দগতি ভিজে বাতাস তার উত্তর বহন করে আনে—অক্ষয়বটের ডালগুলো মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে যেন বলে, 'না গো না—আমি আছি— নন্দীগাঁয়ের মানুষের সুখ-দুঃখের ইতিহাস বুকে করেই আমি আছি—আমি থাকব।' ভোর গগনের শুকতারা দপ দপ করে জ্বলে নিবে গেল। পূব আকাশ লাল হয়ে এসেছে—নন্দীগাঁয়ের বুকে আর একটি দিন আসছে।

উনবিংশ শতাব্দী। কলকাতায় মহাত্মা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে যেমন তীব্র আন্দোলন করছেন, কয়েকজন গোঁড়া হিন্দু আবার তার বিরুদ্ধতাও করছেন। তাঁদের মতে, সতী নারীর সহমরণ বরণ করা ছাড়া নাকি আর কোনো উপায় নেই।

নন্দীগাঁয়ে এ খবর এসে পৌঁছয়নি। রাজেন্দ্রনারায়ণ প্রতিদিন ভেবেছেন—এই দুঃখের প্রতিকার কি! কিন্তু এই ক্ষুদ্র গ্রামে তার

জবাব কে দেবে! বাঙলার জরাজীর্ণ সমাজ কেবলই তারস্বরে পুরানোর পুনরাবৃত্তি করে চলেছে। সুদূর পল্লিগ্রামে একটি ছয়-সাতবছরের শিশু কন্যার বিয়ে হ'ল। বিয়ের দু'বছর পরেই তার বালক স্বামী বিদায় নিল এ পৃথিবীর বুক থেকে। নারী-জীবনের কোনো অনুভূতিই তখনো তার জাগেনি। তবুও সে বিধবা। যদি সে সহমরণ এড়াতে পারে ত বাঁচল নয়, দশ বছর বয়সের বৈধব্যের দুঃখ বৃদ্ধ কাল অবধি তাকে ভোগ করতে হবে। এ কার পাপে! এই ত নন্দীগাঁয়ের ত্রিলোচন ঠাকুরের মেয়ে মানদা—সাত বছর বয়সে মেয়েটি বিধবা হ'য়ে এল। মানদা প্রতিদিন পাড়ায় এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। সামন্তদের বাড়ি গিয়ে পাকা কুল কুড়িয়ে খায়।

'হতভাগী, ও ছাই মুখে দিসনি, আজ যে একাদশী,' পদ্মনাভ ঠাকুরের ছেলের বউ বলল।

মানদার কানে শুধু গেল 'একাদশী' কথাটি। মুখ বেঁকিয়ে সে বলে 'একাদশী তোমার—তুমি খেতে পাওনা বলে এত হিংসে!'

পদ্মনাভের পুত্রবধূ শিউরে উঠল। সধবা সে।

লক্ষ্মীর খবরও যেমন চাপা পড়ে রইল--মানদার খবরও তেমনই কেউ জানবে না।

কয়েকটি বছর বিদায় নিল।

এক শতাব্দী পেরিয়ে আর একটি শতাব্দী চলছে। রাজেন্দ্রনারায়ণ যুগসন্ধি কালের দুর্যোগ কাটিয়ে এসেছেন। আজ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তিনি দাঁড়িয়ে। নতুন যুগের মানুষের নতুন আশা, নতুন উৎসাহ—সবটা তিনি বুঝতে পারেন না। শুধু এটুকু বুঝেছেন—সেদিনের সঙ্গে এদিনের সম্পর্ক বড়ো কম।

দেবীপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ এখন বড়ো হয়েছে। জমিদারি চালাবার মতো লেখাপড়া তারা শিখেছে। দেবীই সব দেখাশোনা করে। রাজেন্দ্রনারায়ণ এখন আর পেরেও ওঠেন না।

কুসুম ঘরে বসে রামায়ণ পাঠ শোনেন। সীতার অগ্নি-পরীক্ষা হচ্ছে। কুসুমের বুক যেন ভেঙে যায়। লক্ষ্মীর কথা মনে পড়ে। সীতা আগুন থেকে বেরিয়ে এসে প্রমাণ করলেন—তিনি সতী। কিন্তু লক্ষ্মীর উপর অগ্নিদেবের সে দয়া হয়নি।

'থাক—ও আর পড়তে হবে না', বলেই কুসুম উঠে চলে যান। পুঁথির পাতায় যার গৌরব ঘোষণা তার আর্তনাদও ত তিনি শুনতে পেয়েছেন।

বড় একঘেয়ে জীবন। কোনো বৈচিত্র্য নেই, কোনো আশা নেই, ভরসা নেই--শুধু টিঁকে থাকা। মন যেন আর মানতে চায় না। তবু সমাজ আছে—মানুষ আছে—মানুষের সংস্কারাচ্ছন্ন জীর্ণ জীবনের দাবি আছে। সমাজে বাস করতে হয়—তার গতানুগতিক নির্দেশকে সবার মানতে হয়।

দত্ত-বাড়িতেও তাই কমলা ও লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর টিঁকে থাকার বেতালা ছন্দ থেমে যায়নি। জীবনের বেসুরো গান বেজেই চলেছে। সমস্ত গ্রামের মধ্যে শুধু দুটি মানুষ জানে—'এ জীবনে হাসির কোনো মূল্য নেই।'

নন্দীগাঁয়ে অতি অন্ধকার রাত্রির পর আসে হাসিমাখা দিন। শুধু দুটি মানুষ ছাড়া আর সবার কান্নাহাসির দোল-দোলানো জীবনের ক্ষণগুলো কেটে যায়। কাটতে চায় না শুধু রাজেন্দ্রনারায়ণ আর কুসুমের।

আর কয়েকটি বছর কেটে গেছে। নন্দীগাঁয়ের দত্ত-বাড়ির দুঃখের কয়টি বছর।

চোখের জল মুছে সামলে নিতে হ'ল নিজেদের। দেবী আর কালীর সংসার—তাঁদেরই ঠিক করে দিতে হবে।

নিত্য দুঃখের মাঝেও দত্ত-বাড়িতে বহুদিন পর আবার নহবত বেজে উঠল।

দেবীপ্রসাদ আর কালীপ্রসাদের বিয়ে। শ্রীপুরের নবীন বসুর দুই মেয়ের সঙ্গে দু'ভায়ের বিয়ে হ'ল। দরিদ্র নবীন বসু, সবাই আপত্তি করেছিল। পাল্‌টা জমিদার ঘর না হলে মানায় না!

অতি দুঃখেও রাজেন্দ্রনারায়ণ হাসেন। পাল্‌টা ঘর! পাল্‌টা ঘর সীতারাম ঘোষের ছিল না? কিন্তু—

আর কোনো কথা ওঠেনা। দুটি মাত্র ভাই। পরিবার ভেঙে যাবার ভয়ে দু'বোনের সঙ্গে বিয়ে দিলেন রাজেন্দ্রনারায়ণ।

এবার কুসুমের ছোটভাই এসেছিল বিয়েতে। বহুদিনের বিবাদের অবসান ঘটল। রাজেন্দ্রনারায়ণকে প্রণাম করে বলে, 'এলাম জামাইবাবু!'

শ্বশুরের কথা মনে পড়ে রাজেন্দ্রনারায়ণের। কিন্তু সেদিনগুলো ঝাপসা হয়ে গেছে।

'বড় খুশি হয়েছি, তোমার দিদির কাছে যাও—তিনিও খুশি হবেন,' আশীর্বাদ ক'রে রাজেন্দ্রনারায়ণ তাঁর শ্যালককে বলেন।

বিয়ের গোলমাল চুকতেই দু' তিনমাস কেটে গেল। কুসুম দেবীর বউকে সংসারের খুঁটিনাটি দেখিয়ে দেন, ওকেই ত সব দায়িত্ব নিতে হবে। বাড়ির বড় বউ।

একটানা জীবনস্রোতের গতিও মন্থর হয়ে আসে। কুসুম আর পেরে ওঠেন না।

কিছুদিন পর—

একলা পেয়ে কুসুম রাজেন্দ্রনারায়ণকে বলে, 'চলো আমরা কোনো তীর্থে চলে যাই—ছেলেদের বিয়ে হ'ল—বউ এল—'

রাজেন্দ্রনারায়ণ চুপ করে থাকেন। নন্দীগাঁ ছেড়ে যেতে মন সরে না। এই গাঁয়ের মাটি, জলবায়ু তাঁকে প্রাণ দিয়েছে—শক্তি দিয়েছে।

কিন্তু জীবনের অপরাহ্নে অবলম্বন ত কিছুই মেলে না।

'তাই হবে', নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলেন রাজেন্দ্রনারায়ণ।

ছেলেরা শুনতে পেয়ে বলে, 'এই বয়সে সেখানে কে দেখা-শোনা করবে ?'

রাজেন্দ্রনারায়ণ ওপর দিকে হাত তুলে দেখালেন।

বাধা দেবার সাহস হ'লনা কারও।

শুভলগ্ন দেখে দুজনে যাত্রার সব ব্যবস্থা করলেন। বামুনপাড়ার পদ্মনাভ ঠাকুরের বিধবা মেয়ে নেত্যও যাবে। দীর্ঘ তিন-চার মাসের পথ। ঠিক হ'ল দেবীপ্রসাদ মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে দেবে।

যাত্রার দিন ঘানয়ে এল। রতন মাঝির নৌকা দু'খানা কেয়া-খালে বাঁধা। সেখান থেকে চন্দনা নদীর বিশাল বুকের ওপর গিয়ে পড়বে নৌকা। বড় কর্তা যাচ্ছেন কাশীধাম। বিশ্বেশ্বরের পুরী—যেখানে কাঙাল শিব অন্নপূর্ণার কাছ থেকে হাত পেতে ভিক্ষে নিয়েছিলেন।

যাত্রার লগ্ন এল। দেবী ও কালী এবং তাদের বউদের আশীর্বাদ করে বেরিয়ে পড়লেন রাজেন্দ্রনারায়ণ আর কুসুম।

কুসুম যাচ্ছেন পাল্কীতে—রাজেন্দ্রনারায়ণ লাঠিতে ভর দিয়ে চলেছেন। একবার থমকে দাঁড়ালেন অক্ষয়বটের সামনে। পাল্কী থামল। ঘোমটা টেনে কুসুম নেমে এলেন। গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলেন অক্ষয়বটকে. গাঁয়ের লোক সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। রাজেন্দ্রনারায়ণ তাকিয়ে আছেন বটগাছের দিকে। কত কথা যে আজ তাঁর মনে পড়ে।

মনে পড়ল, মা কমলা—বাবার জন্য মানত করে সুতো বেঁধে দিয়েছিলেন এই অক্ষয়বটের ডালে। লক্ষ্মীর শ্মশান থেকে ফিরে এই অক্ষয়বটের নীচে এসেই দাঁড়িয়েছিলেন রাজেন্দ্রনারায়ণ। কতো বিনিদ্র রজনী কেটেছে এই অক্ষয়বটের কোলে বসে।

রাজেন্দ্রনারায়ণের বুকটা যেন কেঁপে উঠল। অক্ষয়বটের সঙ্গে তাঁর কত না স্মৃতি জড়িত। যেন বড়ো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে ছেড়ে

যেতে হচ্ছে। রাজেন্দ্রনারায়ণের যুগের আর কেউ নেই—কাঙালী নেই, রহমান নেই, মাধব নেই—আছে শুধু এই অক্ষয়বট।

প্রণাম জানালেন রাজেন্দ্রনারায়ণ বয়োজ্যেষ্ঠ অক্ষয়বটকে।

ত্রিলোচন ঠাকুর মনে করিয়ে দিলেন, 'বারবেলা এসে যাচ্ছে, বাবা।'

'হ্যাঁ—যেতে হবে।' রাজেন্দ্রনাবায়ণ অক্ষয়বটের গায়ে একবার হাত বুলিয়ে নিলেন। বড় যেন চেনা স্পর্শ।

ছোট্ট কেয়াখাল—শীতের দিনে এক হাঁটু জলে সবাই হেঁটেই পার হয়ে যায়। আজ তার দু'পারে ভিড় করে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। অনেক—অনেক দূরদেশে চলে যাচ্ছেন রাজেন্দ্রনারায়ণ—নন্দীগাঁয়ের বড় কর্তা।

রাজেন্দ্রনারায়ণ, কুসুম, পদ্মনাভ ঠাকুরের কন্যা নেত্যকালী নৌকায় উঠলেন। শুভ কাজে চোখেব জল ফেলতে নেই। তবুও সবাই চোখের জল মোছে। দেবীপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ প্রণাম করল মা ও বাবাকে। আশীর্বাদ করতে গিয়ে রাজেন্দ্রনারায়ণ অস্ফুট স্বরে কি বললেন শোনা গেল না। বড়ো দুর্বল, বড়ো অসহায় তিনি। সুলতানপুরের নীলরতন রায়ের সঙ্গে আর দেবীর চর নিয়ে শ্বশুর অঘোর চৌধুরীর সঙ্গে লড়াই করেছিলেন যে রাজেন্দ্র-নারায়ণ—তার কোনো চিহ্ন আজ নেই।

রতন মাঝির নৌকা দু'খানি 'বদর' 'বদর' নাম জপে যাত্রা করল। তখনকার দিনে একা নৌকা নিয়ে যাওয়া বড়ো বিপদের ছিল। তাই সঙ্গে গেল দশ পনেরো জন লেঠেল।

নৌকা চলেছে ধীরে ধীরে। কুসুম শেষবার শ্বশুরের ভিটের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল। রাজেন্দ্রনারায়ণ তাকিয়ে আছেন নন্দীগাঁয়ের দিকে। ঐ ত সেই পলাশবন। শ্রীপঞ্চমীতে পলাশফুল নিতে আসতেন। ঐ ত সেই আজিজ মিঞার বাড়ি। কমলা আশ্রয়

নিয়েছিলেন হিল সাহেবের হাত থেকে নিজেকে আর রা৻ নারায়ণকে বাঁচাবার জন্যে। ডাকাতে বিল ফেলে যাচ্ছেন বাঁয়ে বর কতো মানুষ যে সেখানে খুন হয়েছে। কতো মানুষের আত্মা আজও সেখানে ঘুরে বেড়ায় কে তার খবর রাখে!

নৌকা এসে পড়ল চন্দনাতে। দূরে দেখা যাচ্ছে ঐ দেবীর চর! আজও সে ঠিক তেমনি হাসছে—সেই প্রথম প্রতিমা-বিসর্জনের দিন যেমন তার হাসি ফুটে উঠেছিল। দুয়েক ঘর কৃষাণ কুঁড়ে বেঁধে আছে দেবীর চরে।

নন্দীগাঁয়ের বাড়িঘর, গাছপালা সব একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে। যারা সঙ্গে এসেছিল শেষবারের মতো দেখে নিতে তারা কেয়াখালের পার থেকে এগিয়ে আসছে চন্দনার দিকে।

আর ত দেখা হবে না!

রাজেন্দ্রনারায়ণের হঠাৎ চোখ পড়ল—বহুদিনের পুরানো বটগাছের দিকে। নন্দীগাঁয়ের গাছগুলোর ওপরে ডাল মেলে অনেক দূর থেকে সে যেন তাকিয়ে আছে চন্দনার দিকে। যেন পুরানো বন্ধুর যাবার পথের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। রাজেন্দ্রনারায়ণ নিজেরই অজ্ঞাতসারে একবার হাত তুলে যেন বলতে গেলেন, 'এই যে আমি এখানে—আমি যাচ্ছি।' এত মানুষ মিলে যা পারেনি—একটি বোবা বনস্পতি তাই করল। রাজেন্দ্রনারায়ণের চোখে জল এসে পড়ল। অনেক দিনের পুরানো বন্ধুকে ছেড়ে যেতে আজ যেন বড় কষ্ট হচ্ছে।

রাজেন্দ্রনারায়ণের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। নৌকাখানি সরে যাচ্ছে নন্দীগাঁ থেকে। চন্দনার পারে দাঁড়িয়ে থাকা ন মানুষগুলো দেখতে দেখতে যেন ছোট হয়ে গেল। ডালে আর চন্দনার তীরের গাছগুলোতে মিলে ে কালো রেখা শুধু দেখা যাচ্ছে।

এবার সব ঝাপসা হয়ে গেল। কাঞ্চন নন্দীগাঁখানা মুছে যায়। নন্দীগাঁ৻

যেন্তে তাদের কাছ থেকে দূরে চলে গেছে। হয়ত আবার সবাই দিনের পর দিন সুখদুঃখের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাবে জীবনের পথে। বহু ঋতু-পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে অক্ষয়বটের ডালে ডালে পাতায় পাতায় জাগবে শিহরণ। আরও কতো নতুন মানুষ দেবে দেখা। কিন্তু যে মানুষ নন্দীগাঁয়ের মাটির কোলে থেকে জীবনের প্রতিটি দুর্যোগময় প্রহর গুনেছিল—নন্দীগাঁয়ের মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে যে নিজেকে এক করে দেখেছিল আজ সে আর নেই।

পুরাতন অক্ষয়বটের গোড়াটা ক্ষয়ে আসছে। শেকড়-গজানো নতুন অবলম্বনের ওপরে সে দাঁড়িয়ে আছে। নন্দীগাঁয়ের শতাব্দীর পর শতাব্দীর অভিভাবক সে। রাত্রিদিন চেয়ে আছে—নন্দীগাঁয়ের জীবনের আনাগোনা তার দৃষ্টি এড়ায় না। একটি স্নেহের শাসনের আভাস তার পাতায় পাতায়।

নন্দীগাঁ ছাড়িয়ে—কাঞ্চনপুর ছাড়িয়ে—শহর-ইসলামবাদ ছাড়িয়ে রতনমাঝির নৌকা এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে।

একটি পাতাও কেঁপে উঠল না অক্ষয়বটের।

নন্দীগাঁয়ের সবাই চোখের জল মুছে ফিরে এসেছে। সবাই দেবীপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কিন্তু মাত্র দুটি লোক না থাকাতে নন্দীগাঁয়ের অনেকখানিই যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। দত্ত-বাড়ির প্রতিটি মানুষের মনে হয় কি যেন কি নেই। কি যেন হারিয়ে গেছে।

ডির পুরানো মানুষ চরণ এসে সাঁঝের বাতি জ্বালিয়ে দিল।

` সতী তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে প্রণাম

ন কুসুম ডেকে বলতেন, 'বউমা, সন্ধ্যে হ'ল তুলসী-

ব দাও।'

লার নেই। বাড়ির বড়ো বউ সে। তাকেই

র।

একমাস পর।

কালীপ্রসাদ দেবীকে বলল, 'দাদা, মা-বাবার কোনো খবর পাওয়া গেল না। ওঁরা এখন কোথায় আছেন তাও বোঝা যাচ্ছেনা।'

দেবী বলল, 'বাবা বলেছেন কাশীধামে পৌঁছেই খবর দেবেন। এখনও হয়ত তাঁরা পথেই আছেন। এবার তোমার কিছুটা কাজের ভার নিতে হবে। মা বাবার ইচ্ছে ছিল এ গাঁয়ে একটি শিব-মন্দির আর একটি কালী-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ওদিকে নায়েব বলল, মুসলমান প্রজারা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে বলছে। আমি টাকা দিচ্ছি তুমি সব ব্যবস্থা করে নাও।'

পরদিন থেকেই সব ব্যবস্থা করার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে উঠল কালীপ্রসাদ। ত্রিলোচন ঠাকুর লগ্ন দেখে দিলেন।

নন্দীগাঁয়ে মন্দির-মসজিদ তৈবি হচ্ছে। একেবারে ঝিমিয়ে-পড়া গ্রামে আবাব হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দিল।

॥ চার ॥

শহর ইসলামাবাদ। ইংরেজের আদালত বসেছে। ডাকঘর, থানা সবই আছে। জমিদারিব ব্যাপারে দেবীপ্রসাদ ইসলামাবাদে এসেছে। ভারি সুন্দর শহরটা। ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা। শহরের মাঝেও দু'চারটি পাহাড় আছে। তার একটিতে আদালতের বাড়ি। এই শহরে বিদেশী সাহেবরা ছেলেদের পড়াবার একটা পাঠশালা খুলেছে। ওরা তাকে বলে স্কুল। পাদরী সাহেবরা পড়াবে। পাদরীরা বেশ ভালো বাঙ্‌লা বলতে পারে। তবে তাদের উচ্চারণ শুনলে হাসি পায়।

বেলেন্‌টাইনের দিন ফুরিয়ে এলো। কোম্পানি বাহাদুর এবার দেশে ফিরবেন। অবশ্যি এখনও কিছু দেরি আছে। শহরের দক্ষিণ দিক দিয়ে চন্দনা বয়ে যাচ্ছে। এখানে সে খরস্রোতা। আর একটু এগোলেই বার-দরিয়া--কাজেই এখান থেকেই তাকে তাড়াতাড়ি ছুটতে হয়। চন্দনার পারে কয়েক ঘর পর্তুগীজ বাস করে। আজ দু'তিন পুরুষ ধরে তারা এখানে আছে। ডি. সিল্‌ভা, ডি. সুজা, ডি. ক্রুজ, গঞ্জাভেল্‌স্—এরা ইসলামাবাদেই সংসার পেতে রয়ে গেল। এ নামেই তারা এখানে পরিচিত। কয়েকজন এ দেশের মেয়েই বিয়ে করেছে। কবে যে তাদের পূর্বপুরুষ এসেছিল জলদস্যু হয়ে তাদের মনে পড়ে না। যারা এখানে রয়ে গেল তারা পেলোনা আর কোনো অবলম্বন। পৈতৃক যা ছিল তাই বসে বসে ভাঙিয়ে খাচ্ছে। নিজেদের প্রার্থনার জন্য একটা মন্দির তারা তৈরি করেছে। ওকে তারা বলে গির্জা। দেবীপ্রসাদ যেদিন এসে পৌঁছল সেদিন

ডি. সুজার বাড়ির ছেলেটার বিয়ে হ'ল ডি. সিল্‌ভার মেয়ে আইরিসের সঙ্গে। দেবীপ্রসাদ যে বাড়িতে ছিল সেখান থেকে পর্তুগীজ পাড়া দেখা যায়। অদ্ভুত বিয়ে—নহবত সেখানে বাজেনা। ছেলে আর মেয়ে চলে গেল সেই গির্জায় বিয়ে করতে। নতুন অভিজ্ঞতা হল দেবীপ্রসাদের।

চন্দনার পারে শহর জেগে উঠেছে অনেকদিন থেকে। ইসলামাবাদ শহর। চন্দনার বুকে বিদেশী জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। পারের কাছে কাছে দেশী নৌকাগুলো বাঁধা। একদিন এখানে বড়ো বড়ে জাহাজ তৈরি হত। সুদূর পশ্চিম দেশের লোক এসে নতুন জাহাজের বায়না করে যেত। সে দিন আজ আর নেই।

জমিদার দেবীপ্রসাদ ইসলামাবাদ শহরে জমি কিনল। বাড়ি হবে—নন্দীগাঁয়ের জমিদার শহরে এলে এখানে থাকার মতো বাড়ি দরকার। রাজীবলোচন আর রাজেন্দ্রনাবায়ণের দিন চলে গেছে।

এবার ভেঙে নতুন করে গড়ার পালা।

নন্দীগাঁয়ের আকাশে বাতাসেও কি যেন এক সাড়া জাগল। দত্ত-বাড়ির কালো অন্ধকারকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে একটুখানি হাসির আলোর মুহূর্ত দিল দেখা। কিন্তু সে শুধু একটি মুহূর্তই।

দুই ভাই আর তাদের বউ। তাদের আগ্রহ দত্ত-বাড়িকে আবার চেষ্টা করে ধূসর দুঃখের মরু থেকে উদ্ধার করে এনে তাকে যাতে জীবন-রসে রসায়িত করা যায়।

অক্ষয়বটের ডালে ডালে পাতায় পাতায় ঠিক তেমনি সবুজ হাসি ফুটে উঠেছে। দেবীর চরে পাকাধানের শিষে হাসি খেলে যায়।

দেবীপ্রসাদের স্ত্রী সতী স্বামীকে মনে করিয়ে দেয়, বাবার কোন সংবাদ ত এল না।

সত্যিই ত। তিন চার মাস কেটে গেছে—রাজেন্দ্রনারায়ণ যাবার পর। আবার ভাঁটা পড়ে সে চিন্তায়।

নবান্নের দিন ঘনিয়ে এলো। নতুন ধান ঘরে উঠছে। দত্ত-বাড়ির দিকে সবাই চেয়ে আছে। হাঁক-ডাক চলেছে খুব। আত্মীয়রা সবাই আসছে।

শুধু কালীপ্রসাদের মনে পড়ে লক্ষ্মীর কথা। তাদের একমাত্র দিদি।

ধন-দৌলত মানুষের জীবনে কিছুটা শিথিলতা আনে। দত্ত-পরিবারে তার আভাস দেখা দিল। বাপ-ঠাকুর্দার কাছ থেকে পাওয়া ধনদৌলত। তার ওপর দেবীপ্রসাদের মায়া খুব কম। শহরে যারা আছে তাদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তার।

টাকা আছে জীবনটা ভোগ করে নাও।

জমিদারির কাজে মাঝে মাঝে দুই ভাইকেই আসতে হয় ইসলামাবাদে। তবে কালীপ্রসাদ আসে কম। টাকার দাপটে ইয়ারের লোকও দু'চার জন জুটেছে। যখন দেবীপ্রসাদ আসে তখন তার কাছে বায়না ধরে তারা, বলে, 'হুজুর এলেন দুদিনের জন্য—একটু নাচগান না হলে মানায় না।'

নাচ-গানের ব্যবস্থা হয়—সঙ্গে সঙ্গে পানও চলে। নইলে নেশা হয় না। আর নেশা না হলে আসর জমে না।

দেবীপ্রসাদ প্রথম প্রথম মদের গ্লাস ছুঁত না। বাইজীর নাচ-গান শেষ হলে বকশিশ দিয়ে বিদায় দিত।

কিন্তু মাঝে মাঝে হীরা বাইজী যেন চোখে ধাধা লাগিয়ে দেয়। একদিন তাকে একা পেয়ে বলল, 'হীরা, কাছে এস।'

এইটুকুই চাইছিল হীরা। রঙ্ ধরেছে তবে। মুচকি হেসে কাছে এসে বসল। আর কথা খুঁজে পায়না দেবীপ্রসাদ। হীরা তার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, 'হুজুরের যদি এতই মেহেরবানি হ'ল—তাহলে আমার একটা কথা রাখুন। শরাব পিয়ে দেখুন—রঙ্ ধরবে।'

দেবীপ্রসাদ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তার দিকে। এত রূপ পেল কোথায়।

হীরা মদের গ্লাস মুখের কাছে ধরে বলল, 'নাও'।

মন্ত্রচালিতের মত তার হাত থেকেই এক চুমুকে যতটা পারে শেষ করল।

'আচ্ছা হীরা, তোমার দেশ কোথায়?'

'জানি না। তবে এইটুকু জানি যে আমি বাঙালী, এই ইসলামাবাদের কাছেই কোথায় আমাদের দেশ ছিল। কোম্পানির সাহেব আমার দিদিমাকে ধরে নিয়ে যায়। তুই সাহেবের সঙ্গে দিদিমা ছিল ষোল বছর। এর মধ্যে আমার মার জন্ম হ'ল। মাও কিছুদিন কোম্পানির বুথ্ সাহেবের কাছে ছিল। বুথ্ সাহেবের ঘরেই আমি জন্মেছি। তারপর মা চলে গেল ফৌজদার মামুদের সঙ্গে। আর আমি এই আপনারই পায়ের কাছে।'

'এই তোমার ব্যবসা'—দেবীপ্রসাদের কথা জড়িয়ে যাচ্ছে!

'ও কথা বলবেন না, হুজুর—যখন যে আদর করে ডেকে নেয় তাকেই দিল্ দিয়ে দিই। শুনেছি, আমার দিদিমা আপনাদের সমাজের বামুনের বিধবা মেয়ে ছিল। হিল সাহেবের সঙ্গে কয়েক বছর ঘর করার পর যখন সাহেব দেশে চলে গেল তখন দিদিমা কেঁদেছিল। শেষে বেলাটিন সাহেবের সঙ্গে ঘর করল।'

হিল সাহেব—বেলাটিন সাহেব! কি জানি নেশার ঘোরে কিছুই মনে পড়ছেনা।

হীরা বাইজী ঘুমিয়ে আছে দেবীপ্রসাদের কোলে মাথা রেখে।

দেবীপ্রসাদ মদের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে।

ইস্লামাবাদ শহরের বাড়ি আজকাল দেবীপ্রসাদের বড়ো আকর্ষণ। নন্দীগাঁয়ের শিবমন্দির, কালীমন্দির, দেবীর চর, অক্ষয়বট, সতী, সবই যেন এখন দূরে পড়ে রইল।

এবার অনেকদিন পর নন্দীগাঁয়ে ফিরল দেবীপ্রসাদ। সঙ্গে কেউ নেই। ইসলামাবাদের চাকর গোমস্তারা ওখানেই থাকে।

গাঁয়ের সবাই শুনেছে দেবীপ্রসাদের কথা। জমিদার সে—তাই ভয়ে কিছু বলাও যায় না।

কালীপ্রসাদও তাকে এড়িয়ে চলে।

সতী দেবীপ্রসাদকে একলা পেয়ে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, তুমি তার ঠিক উত্তর দেবে ত!'

'কেন, দাসখত লিখে দিয়েছি নাকি!'

'না—সবাই বলে—'

'সবাই কি বলে?'

একটু চুপ করে থেকে সতী গম্ভীর মুখে দেবীপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি মদ খাও—তুমি—'

দেবীপ্রসাদ হো হো করে হেসে উঠল। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, 'শোনো, আমার অত কান্না ভালো লাগেনা—গরিবের মেয়ে তুমি বুঝবেনা জমিদারি কি—জমিদারি কাকে বলে—আর তা কি করে চালাতে হয়।'

'তা বলে তুমি এ অধঃপাতে যাবে'—কথাটা যেন সতীর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল!

দেবীপ্রসাদ চমকে উঠল—'অধঃপাতে! এতখানি সাহস! হা-ভাতে ঘরের মেয়ে!'

দেয়ালে টাঙানো চাবুকটা নামায় দেবীপ্রসাদ।

সতী তখনও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দেবীপ্রসাদ এগিয়ে গেল তার দিকে। চোখে মুখে হিংস্র দানবের বীভৎস ভাব যেন ফুটে উঠেছে।

'মারবে আমাকে? আমি ত কোন দোষ করিনি। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। তোমায় জানি আমার দেবতা বলে। আর তুমি—দাঁড়িয়ে রইলে কেন—মারো আমাকে!'

'আমার বিচার করবার মালিক তুমি নও। যদি কুকুরের মতো

থাকতে না পারো তাহলে বেরিয়ে যাও। মেয়েমানুষ পুরুষের বিচার করতে পারে না।'

'তুমি আমার স্বামী—সবাই যদি তোমার সম্বন্ধে বলে, তাতে আমার দুঃখ হয় না?'

'কারা বলে?' দেবীপ্রসাদের মাথায় খুন চেপেছে।

'সবাই বলে। বামুনপাড়া থেকে কাহারপাড়া পর্যন্ত ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সবাই বলে। তোমার পায়ে পড়ি. তুমি আমায় ভুল বুঝো না।' দেবীপ্রসাদের পায়ের কাছে বসে পড়ল সতী।

দেবীপ্রসাদ সুযোগ খোঁজে। হাতে চাবুক অথচ কাজে লাগছে না। কিন্তু সেদিন আর সুযোগ এলো না।

চাবুক ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'যাও আমার সামনে থেকে!' চেঁচিয়ে উঠল দেবীপ্রসাদ।

কালীপ্রসাদ ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। থমকে দাঁড়ালো। সতী ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই জিজ্ঞাসা করল, 'কি বৌদি, এত চেঁচামেচি কিসের?'

সতীর চোখে জল—শুধু একবার মুখ তুলে কালীপ্রসাদের দিকে তাকাল।

দত্ত-বাড়ির ভিত্তিভূমিতে ফাটল ধরেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। মেয়েদের দুঃখে প্রাণ কেঁদে উঠল চিরস্মরণীয় মহাত্মার। তাঁর পরিচয়—তিনি ভগবতী দেবীর সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাল-বিধবার অবাঞ্ছিত বৈধব্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করবার জন্য, নিপীড়িত নারী-সমাজের দুঃখ নিরসনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্‌লার সমাজক্ষেত্রে এসে দাঁড়ালেন।

এযুগে মেয়েরা কথা কয় না, শুধু মুখ বুজে সয়ে যায়। কুলীন বড়লোকের মধ্যে তখন বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত। নন্দীগাঁয়ের দ্বারিকা শিরোমণির চারটে বিয়ে। দুজন থাকেন নন্দীগাঁয়ে আর

দু'জন তাঁদের বাপের বাড়ি থাকেন। শিরোমণি মশাই বছরে দু'বার দুই, শ্বশুরের অতিথি হন। সবাইকে বলে বেড়ান, 'ঘরের ঐ দুটো আর মানুষ নয়, কেবল চুলোচুলি আর—যত সব।'

সতীও এ যুগের মেয়ে। যেখানে বাইরে তার আর কোন পরিচয় নেই—এক গরিব ঘরের মেয়ে আর বড় ঘরের বউ ছাড়া কিন্তু তার মুখেও তার অন্তরের প্রতিবাদ শোনা যায়। ফুল্লরাও একদিন প্রতিবাদ জানিয়েছিল। মধ্যযুগের মুকুন্দরাম চক্রবর্তী শুনেছেন সেই প্রতিবাদ। নারীর সাম্রাজ্য তার স্বামীর ঘর। দরিদ্র নবীন বসুর মেয়েও তা জানে।

নন্দীগাঁয়ের বাণেশ্বর গুহ কাহারপাড়ার মাতঙ্গীকে ঘরে এনে রেখেছে। তার বউ শৈল প্রতিদিন মাতঙ্গীর চক্রান্তে একবার করে মার খায়। স্বামী মাতঙ্গীকে নিয়েই থাকে আর শৈলর প্রহর কাটে তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে।

সতীও সন্তান-সম্ভবা। তার জীবনে স্বামীর এই স্খলন সহ্য হয় না। দেবতুল্য শ্বশুর রাজেন্দ্রনারায়ণ—আর তাঁর সন্তান এই দেবীপ্রসাদ। নতুন দিনে নতুন সমাজে এসে পারলোনা সে সংসারকে আরও দৃঢ় করে বাঁধতে।

সাতদিন পর। দেবীপ্রসাদ আবার চলল ইসলামাবাদ শহরে। হীরার মুখখানা ভুলতে পারেনি। যাবার আগে সতী এসে বলল, 'আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।'

এবার দেবীপ্রসাদের দ্বিধা নয়, সঙ্কোচ নয়—পাপ মনের নির্লজ্জ প্রকাশ। কিছুক্ষণ সতীর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'শোনো, ওখানে তোমার যাওয়া হবে না। যখন নন্দীগাঁয়ে থাকি তখন দেখা হবে। এখন যাও বিরক্ত ক'রো না।'

সতী আর কিছু বলতে পারে না।

কালীপ্রসাদ সবই জেনেছে। সতীর ছোট বোন সর্বাণী—দত্ত-বাড়ির ছোট বউ। সর্বাণীর ভয়—কালীপ্রসাদও কি তাকে ছেড়ে যাবে।

কালীপ্রসাদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব বলত? আমি জমিদার নই, আমাকে তাই শহরে গিয়ে সরকার বাহাত্বরকে সেলাম জানাতে হয় না। তুমি আছ—আমার জীবনে আর কিছুই প্রয়োজন নাই।'

সর্বাণী আশা'ও আশঙ্কাজড়িত কণ্ঠে বলে,—'দিদির কি হবে!'

কালীপ্রসাদ ভেবে পায় না বৌদির কি হবে। দাদা এভাবে নিজেকে ভাসিয়ে দিল। নাঃ—আজ যাবার আগেই দেবীপ্রসাদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

দেবীপ্রসাদ ইসলামাবাদ যাচ্ছে। আগে সঙ্গে বাড়ির দু'চার-জন লোক যেত। এখন শুধু শহর থেকে আনা চাকরটিই থাকে। সে এই নন্দীগাঁয়ে বসে ইসলামাবাদের গল্প বলে—হীরা বাইজীর গল্প বলে। সবাই অবাক হয়ে শোনে।

যাবার আগে কালীপ্রসাদ দেবীর ঘরে এসে দাঁড়াল। ঘরখানা কালীর খুবই পরিচিত। তবুও আজ যেন কেমন কেমন ঠেকছে।

তামাকের গন্ধ—মদের গন্ধ—

রাজেন্দ্রনারায়ণের ঘর—এ গন্ধ তো ছিল না! কালের হাওয়ায় মাতাল করা গন্ধ এল বুঝি!

দেবীপ্রসাদ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে কালীপ্রসাদের দিকে। ছোট ভাই—মার বুকে শুয়ে রূপকথার গল্প শুনে দু'জনের কতো রাত কেটেছে!

'কিছু বলতে চাও?' দেবীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করেই চোখ বুজল।

'হ্যাঁ, বলব বলেই এসেছি।' কালীপ্রসাদের কণ্ঠস্বরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আভাষ। দেবীপ্রসাদ চমকে তাকাল। ঠিক এমন সুরে কথা ত কালীপ্রসাদের মুখে কখনও সে শোনেনি।

কালীপ্রসাদ একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'তোমার কি ইসলামাবাদ যাওয়া একান্তই দরকার?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'তোমাকে তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে ?'

'কিছুটা দিতে হবে বই কি ! বিষয় তোমার একার নয়—অন্যায় খরচ হলে কৈফিয়ৎ চাইব।'

'কালীপ্রসাদ, তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছ জান ?'

'জানি—তুমি অভিভাবক—কিন্তু তোমাকে আমি আর বিশ্বাস করতে পারিনে। নন্দীগাঁয়ে থেকেই জমিদারি রক্ষা করা যায়।'

'সেটা আমি বুঝব—'

'আমারও বোঝা দরকার—কারণ আমারও দাবি আছে।'

দেবীপ্রসাদ অবাক হয়ে গেল—নেশার ঘোর কেটে গেছে। কালীপ্রসাদ এত কথা শিখল কোথা থেকে !

'গুরুজনের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় তা জান না—' দেবীপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে উঠল।

'জানি—জানি বলেই এতদিন কিছুই বলিনি। কিন্তু সেদিন যখন তোমার হাতে চাবুক দেখলাম--তখন মনে হ'ল এ বাড়িতে গুরুজন আর নেই—'

'কালীপ্রসাদ !' বাড়ির সবই চমকে উঠল দেবীপ্রসাদের চিৎকারে।

'ভয়—শ্রদ্ধা সব তুমিই ভেঙে দিয়েছ। আমি তোমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চাইনে'—কথা শেষ হল না। সতী এসে পড়ল। পাশের ঘর থেকে সে সব শুনেছে।

কালীপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠাকুর পো'—

'আমি যাচ্ছি বৌদি', বলেই কালীপ্রসাদ বেরিয়ে গেল।

দেবীপ্রসাদ হঠাৎ যেন অনেক-কিছু বুঝে নিলেন। সেদিন তার আবার চাবুকের প্রয়োজন দেখা দিল।

কালীপ্রসাদ সতীর কথা শুনে মাথা নীচু করে চলে যায় কেন ?

"কালীকে নিয়ে চক্রান্ত চলছে বুঝি ? ওকি তোমার—"

অনেক—অনেক নীচে নেমে গেছে দেবীপ্রসাদ।

'কি বলছ তুমি ? ছি ছি—' সতী কেঁদেই ফেলল।

'এতদিন বুঝিনি—কোন্ সাহসে তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা কও। মেয়ে মানুষের অত দেমাক আমার ভালো লাগেনা—'

সপাং করে চাবুক পড়ল।

'উঃ মাগো—' সতীর করুণ আর্তনাদ।

নন্দীগাঁয়ের দত্ত-পরিবারের অধস্তন তৃতীয় পুরুষে কালের বিষাক্ত হাওয়ার ছোঁয়াচ লেগেছে। রাজীবলোচন ও রাজেন্দ্রনারায়ণের দিন কেটেছে নানা দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে। তাঁরা যে পরিবারটিকে বহু দুঃখেব মধ্যেও বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন দেবীপ্রসাদের সময় থেকে তার ভাঙনের আভাষ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। পুরানো দিনের সুর আর তেমন করে বাজেনা। অথচ নতুন সুরে তেমন স্পষ্ট প্রকাশ নেই। তবুও তারই ফাঁকে ফাঁকে সার্থক জীবন কামনার দীপক তান যেন শোনা যায়। চারদিকে দরিদ্রের অভাব-অভিযোগ আবেদন-নিবেদনের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাব উদ্ধত প্রকাশের আর দেরি নেই। কোম্পানির অন্যায় অবিচার এবং ভারতীয় চিরাচরিত জীবনযাত্রার হঠাৎ পরিবর্তনে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

ভেঙে পড়েছে সামন্ত রাজারা। দরিদ্র চাষীরা ফসল ফলায়, তবুও ক্ষুধার অন্ন তাদেব জোটেনা। ইংরেজ আবির্ভাবে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে ভারতবাসীর মনে। কোলরা বিদ্রোহ করল। বারাসতে তিতুমীর, ফরিদপুরের দিহুমীরের নেতৃত্বে বাঙলা দেশে পর পর বিদ্রোহ সংঘটিত হল। অর্ধসভ্য সাঁওতালদের মধ্যেও অসন্তোষ বহ্নি জ্বলে উঠল।

সুখে দুঃখে আরও অনেকদিন কেটে গেল।

১৮৫৭ আলে সিপাহীদের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণও জানালো অন্যায়ের প্রতিবাদ।

১৮৫৭ সাল—ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি-ভূমিকে কাঁপিয়ে তোলে। ভারত জুড়ে বিদ্রোহ দিয়েছে দেখা। নন্দীগাঁয়ের মানুষ তার কতটুকু-বা খবর রাখে! কেবল যখন সিপাহীরা ইস্‌লামাবাদ শহরেও বিক্ষোভ জানালো তখন নন্দীগাঁয়ে খবর এলো শূয়োরের চর্বি মেশানো গুলি দাঁতে কেটে বন্দুক চালাবার বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান সিপাইরা খেপে উঠেছে।

দেবীপ্রসাদ তখন ইসলামাবাদে—হীরা বাইজী আছে তাব সঙ্গে। বাইরে কেমন যেন গুমোট বেঁধে আছে। সাধারণ মানুষেব মধ্যেও একটা আশা ও আশঙ্কার আভাব জেগে উঠেছে। দেবীপ্রসাদ তখন মদের নেশায় বিভোর। হীরা বাইজী বলে, 'সিপাইরা আমাদের কিছু করবে না তো!'

দেবীপ্রসাদ জড়ানো গলায় বলে, 'কোম্পানি আছে কি করতে!'

তারপরে আর কথা থাকেনা। জমিদারির অর্থ দুহাতে বিলিয়ে দিচ্ছে হীরার পায়ে। হীরার গায়ে নতুন নতুন গয়না উঠছে।

বছরখানেক দেবীপ্রসাদের আর নন্দীগাঁয়ে যাওয়া হ'লনা। মাঝে মাঝে মনে পড়ে গাঁয়ের কথা—ছিঁচকাদুনে সতীর কথা। কিন্তু হীরা সামনে এলেই সব ভুলে যায়। যাবার কথা উঠলেই হীরা অভিমান করে বলে, 'আমায় বুঝি আর মনে ধরছে না।'

দেবীপ্রসাদ বলে, 'তোমার জন্যই ত সব ছেড়েছি।'

দেবীপ্রসাদ ভাবে—সতী ত এমন করে বলতে পারে না। হীরা আর সতী মেলে না মোটেই। ইংরেজ মেমের মতো দেখতে হীরা। তার রূপের কাছে সতী—

সতীর ছেলে হয়েছে। দেবীপ্রসাদের কাছে খবর পাঠিয়েছিল কালীপ্রসাদ। ছেলেকে দেখতে যাবার সময় হ'য়ে ওঠেনি তার।

কালীপ্রসাদ ছেলের নাম রেখেছে প্রতাপনারায়ণ।

কালীপ্রসাদ ঘটা করে ছেলের মুখে ভাত দিল। উৎসব ব্যবস্থার কোথাও কোনো ফাঁক নেই। সবাই এসেছে দত্তবাড়িতে—নন্দীগাঁয়ের

দত্তবাড়ির চতুর্থপুরুষের সূচনা। দেবীপ্রসাদের প্রথম সন্তান। কালীপ্রসাদ ভাবে—মা-বাবা এখানে থাকলে কতো খুশি হতেন। তিন চার দিন খুব হৈ চৈ করে কেটে গেল। কিন্তু তবু কোথায় যেন ঠিক সুরে বাজছেনা।

দেবীপ্রসাদ সেদিন হীরার কোলে মাথা রেখে গালিচায় শুয়ে আছে। 'আমায় তুমি ভালোবাসো, হীরা?' দেবীপ্রসাদের আকুল প্রশ্ন।

হীরা অভিনয় জানে, 'বলেছি ত, যে আমাদের আদর করে রাখে—তাকে দিল দিয়ে দিই। তুমি আমার খসম।'

দত্তবাড়িতে গুরুজনরা সবাই দেবীপ্রসাদের ছেলেকে আশীর্বাদ করে বলে, 'দীর্ঘায়ু হোক—বাপের নাম রাখুক—বংশের মুখোজ্জ্বল করুক।

সতী ছেলেকে বুকে চেপে ধরে। বাপের নাম। দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে—গালের ওপর চাবুকের কাটা দাগ তাকেও ভিজিয়ে দিয়ে গেল।

সতীর মুখে পতিদেবতা দেবীপ্রসাদের ভালোবাসার অক্ষয়চিহ্ন।

এ দেশে পাদরীরা আরও জোর ধর্মপ্রচার করছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয়েছে। সতীদাহ বন্ধ করার আইন হয়েছে, বিধবাদের বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে।

আঁতকে ওঠে সবাই। ব্যাপার কি! একেবারে 'কেরেস্তান' করে ফেলবে নাকি। ধর্ম যাবে! সর্বনাশ। মুসলমানরা আতঙ্কিত হলো বেশি। হিন্দুরাও কম নয়। ওহাবী আন্দোলন শুরু হচ্ছে।

টেলিগ্রাম এসেছে - রেলগাড়ি হয়েছে এদেশে। ইংরেজরা আর ভারতীয় বৈশিষ্ট্য কিছু থাকতে দিল না।

ওদিকে শূয়োরের চর্বি মিশ্রিত কার্তুজ। জাত গেল। বারাক-পুরের দেশী সিপাইরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। মঙ্গল পাঁড়ে মারা পড়ল। সিপাইরা বিদ্রোহ করেছে।

বিদ্রোহের আগে নাকি ওরা বিভিন্ন রেজিমেণ্টের সিপাইদের মধ্যে চাপাটি আর পদ্মফুল চালাচালি করত। সাহেবরা বলে ওরা নাকি এর অর্থ কিছুই বুঝতে পারেনি। দেখতে দেখতে সারা ভারতবর্ষে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। কানপুর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বুন্দেলখণ্ড, ঝাঁসী, অযোধ্যা, রোহিলা খণ্ড, বিহার, কাশী—সব জায়গায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী, রাণী লক্ষ্মীবাই, কুনোয়ার সিং—সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন এই বিদ্রোহে। দেশের জনসাধারণের এক অংশও যোগ দিল।

ইংরেজরা প্রথম প্রথম বিপন্ন হলেও শেষপর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করল। বিদ্রোহীরা দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌কে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন।

শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ সম্রাট তাঁর ছেলেদের নিয়ে ধরা পড়লেন সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি মন্দিরে। বর্বব হড্‌সন তাঁর ছেলেদেব বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছে কল্পনা করে গুলি করে মারল। মোগল বংশ শেষ হ'ল। বৃদ্ধ সম্রাট রেঙ্গুনে নির্বাসিত হলেন। মারাও গেলেন সেখানে। বর্বর হড্‌সন—তার এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড এবং বৃদ্ধ সম্রাটেব উপব অত্যাচার তার অনেক জাত-ভাইরাও সমর্থন করেনি। ঐতিহাসিক ম্যালিসন বলেছিল—এরকম বর্বরতার দৃষ্টান্ত আর নেই। হড্‌সনের এটা ভুল নয়, গর্হিত অপরাধ।

কিন্তু কে এই অপরাধের বিচার করবে।

তাঁতিয়াটোপীকে বিশ্বাসঘাতকতা করে ধরিয়ে দিল গোয়ালিয়-রের অধীন সামন্তরাজ মানসিংহ। ফাঁসী হ'ল তাঁর। রাণী লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধ করে প্রাণ দিলেন। নানাসাহেব নেপালের জঙ্গলে লুকিয়ে রইলেন। হয়ত সেখানেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

এইভাবে বিদ্রোহের অবসান ঘটল। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধতা

করেছে হায়দ্রাবাদের সালার জঙ্, নেপালের জঙ্ বাহাদুর, গোয়ালিয়রের দিনকর রাও এবং বেশির ভাগ শিখরা। এ ভুলের দুঃসহ পরিণাম—ইংরেজ-শাসনের কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতবর্ষ।

দেশে খবরের কাগজ তখন বেরিয়েছে। বিদ্রোহের সংবাদ তখন সবাই পাচ্ছে। কিন্তু সেদিনের কতো না বেদনার সংবাদ একেবারে চাপা পড়ে গেল। সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসের পাতায় তার চিহ্নও নেই।

কাশীতেও এই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে।

দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে স্নান করে ফিরছেন বৃদ্ধ রাজেন্দ্রনারায়ণ—সঙ্গে কুসুম। পথে তাঁদের ধরল কোম্পানির দল। কর্ণেল নীল এসেছে কাশীর বিদ্রোহ দমন করতে। নীল শুধু বিদ্রোহীদের মেরেই ক্ষান্ত নয়। যাদের সন্দেহ হচ্ছে তাদের ধরেও মারছে। শিশুদেরও বাদ দিচ্ছেনা। দানবীয় উল্লাসে মেতে উঠেছে নীল। রাজেন্দ্রনারায়ণকে ধরেই একটি সৈন্য জিজ্ঞাসা করল, 'মোকাম কোথায়?' রাজেন্দ্রনারায়ণ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'বিশ্বনাথের পায়ে।'

তাঁর কথা শুনে তারা বুঝল যে ইনি বাঙালী। ধরে নিয়ে গেল নীলসাহেবের কাছে। কুসুম প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন। লাথি মেরে ফেলে দিল কোম্পানির জমাদার। মুখ থুবড়ে পড়ে রইলেন নন্দীগায়ের রানীমা—কুসুম।

নীলসাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে রাজেন্দ্রনারায়ণ। জীবনে কখনও কারও কাছে তিনি মাথা নত করেননি। নীলসাহেব একবার অস্ফুট স্বরে বলল,—'শালা, বড্মাস, কালা আড্মী—'

বৃদ্ধ রাজেন্দ্রনারায়ণের শিরায় শিরায় রক্ত টগবগ্ করে উঠল। রাজীবলোচন দত্তের ছেলে তিনি। অতিবৃদ্ধ রাজেন্দ্রনারায়ণ সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। কি যেন তিনি বলতে যাচ্ছিলেন—

অতিবৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্ নির্বাসিত—ঠিক তাঁরই বয়সী আর একজন বৃদ্ধ কাশীর পথে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে রইলেন।

কুসুমও নেই।

ইসলামাবাদ শহরে দেবীপ্রসাদ আকণ্ঠ পাপের মাঝে ডুবে আছে। সিপাইদের দমন করবার জন্য জেলার বড় সাহেব উইলসন দেবীপ্রসাদের কাছে টাকা চেয়ে পাঠাল। যা ছিল সবই উজার করে দিল দেবীপ্রসাদ। আর ভয়ে ভয়ে থাকতে ভাল লাগেনা। কোথায় একটু ফুর্তি চলবে—তা নয়, কেবল 'সিপাই এলো' 'সিপাই এলো' বলে দরজা জানালা বন্ধ করে দিন কাটাতে হয়।

সত্যিই একদিন ইসলামাবাদেও সিপাইরা বিদ্রোহ করে বসল। দুটো দিন শুধু সেখানে বিদ্রোহ চলে। কারণ তাদের চালাবার লোক নেই। দরিদ্র চাষীরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। দেবীপ্রসাদ সরকার বাহাদুরকে বলেছিল—যতটা সাহায্য তার দ্বারা সম্ভব হয় সে করবে। সাহায্যের প্রয়োজন আর হয়নি। উইলসন আগে থেকেই টের পেয়েছিল। প্রথমদিন কোম্পানির দল পিছু হটে যায়, কিন্তু পরদিন বিদ্রোহী সিপাইরা হেরে যায়। তারা অনেকে পালিয়ে গেল, অনেকে কোম্পানির হাতে বন্দীও হ'ল। বন্দীদের অনেকে পল্টন মাঠে কোম্পানির বন্দুকের গুলিতে প্রাণ দিল। কালীপ্রসাদ ইসলামাবাদে এসেছিল জমীদারির কাজে—কিন্তু এই আগুনে আর থাকা উচিত নয় ভেবে ফিরে গেল নন্দীগাঁয়ে। দেবীপ্রসাদের সঙ্গে তার দেখা হয়নি।

নন্দীগাঁয়ের একটু পরিবর্তন ঘটেছে। এখানে একটি ডাকঘর বসেছে। চিঠিপত্র এখান থেকে দূর দেশেও যাবে। লোক দিয়ে আর খবর পাঠাতে হবে না। শুধু ডাকঘরে দিয়ে এলেই—ব্যস্। আবার দূর দেশের চিঠিও এখানে নাকি আসবে।

কালীপ্রসাদ ভাবল, এবার হয়ত বাবার চিঠি আসবে। আর ইসলামাবাদে নয়, এবারে একেবারে নন্দীগাঁয়ে। বড়ো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন ওঁরা। কোনো খবরও এখন পর্যন্ত পাওয়া গেলনা। কি জানি কেমন আছেন, গাঁয়ের যে মাঝিরা নৌকা নিয়ে গিয়েছিল তারা পৌঁছাবার খবর ছাড়া আর কিছু জানে না।

কলকাতা পর্যন্ত রেল গাড়ি হয়েছে। ইসলামাবাদ থেকে কলকাতায় যেতে হলে নৌকায় যেতে হয়। তারপর সেখান থেকে রেল গাড়ি করে কাশী। খবর পেলে এবার মা-বাবাকে দেখে আসবে —কালীপ্রসাদ ছেলেবেলার স্বপ্ন দেখে।

দিদির কথাও মনে পড়ে তার। তাকে কোলে নিয়ে বলত, 'কালী আমার, আমার সোনাভাই।' 'দিদি!' মনে মনে ডেকে উঠল কালীপ্রসাদ। সমস্ত অন্তর যেন হুহু ক'রে কেঁদে ওঠে।

বড়ো একা সে। দেবীপ্রসাদ আজ বছরখানেক ঘর-ছাড়া। দাদার কথা ভাবতেও ঘৃণা হয়। এবার কালীপ্রসাদ তার অংশ আলাদা করে নেবে। তার নিজেরও ত ছেলে-মেয়ে আছে। কিন্তু —প্রতাপের কথা মনে পড়ে যায়—

সতী প্রতাপকে এনে তার কোলে দেয়। ছোট শিশু জড়িয়ে ধরে তার গলা। 'দাদা, তুমি মানুষ নও'—প্রতাপকে বুকে করে আপন মনে বলে উঠল কালীপ্রসাদ।

নন্দীগাঁয়ের বুকে আঁধার নেমে আসছে।

অক্ষয়বটের গাঢ় সবুজ পাতাগুলো যেন কালো হয়ে এসেছে তারই নীচে সবার আগে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

গোধূলির অস্পষ্ট আলোয় এক ঝাঁক বক উড়ে গেল।

সিপাহী বিদ্রোহের অবসান ঘটেছে। কোম্পানির শাসন-

ব্যবসা শেষ হল। এবার ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া নিজ হাতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেছেন। লর্ড ক্যানিংয়ের আমলে এই বিদ্রোহ ঘটে। ক্যানিং বিদ্রোহীদের অনেককে নাকি ক্ষমাও করেছিলেন। এর জন্য তাঁকে অনেকে 'দয়ালু ক্যানিং' বলে ঠাট্টা করত।

মহারানী ভিক্টোরিয়া হাতে রাজ্যভার নেবার আগেই দেশে দরিদ্রের ওপর জমিদারের আর নীলকর সাহেবের অত্যাচারে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। নন্দীগাঁয়ের দত্তরা ঘর সামাল দিতে গিয়ে আর বাইরের প্রজা ঠেঙাবার সময় পায়নি। বিশেষ করে দেবীপ্রসাদের সময় থেকে প্রজাদেব অনুগ্রহের ওপর তার অনেকখানি নির্ভর করতে হ'ত। শহরে জীবন যাপনের জন্য মাসে মাসে তার টাকা চাই। আর কোনো দিকে খেয়াল নেই। দেশ জুড়ে মানুষের যে কান্না জেগে উঠেছে—তা শোনার অবসর তার কই! হীরা বাইজীকে সে বলে, 'তোমার কেনা গোলাম আমি।'

'আহা, তা নয় ত কি, আমায় তুমি পায়ে রেখেছ—তাই—'করুণ মুখ করে হীরা বলে।

'পায়ে নয়, মাথায়'—দেবীপ্রসাদ হীরার পা জড়িয়ে ধরে।

সতীর কোলে খোকা কেঁদে উঠল।

নতুন জীবনের জোয়ার জেগেছে দেশের মানুষের জীবনের মরাগাঙে। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে কলকাতায়। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল। তার আগে থেকেই ইংরেজি শিখছে দেশের লোক। ইংরেজি সাহিত্য কি এক নতুন আশার বাণী নিয়ে এসেছে। কিন্তু ইংরেজরা?

ঈশ্বরগুপ্ত মশায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার নিয়ে কেঁদে কেঁদে ভিক্টোরিয়াকে জানান—

করি শুভ অভিলাষ
মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গোরু
শিখিনি সিং বাঁকানো।
কেবল খাবো খোল বিচিলি ঘাস।
যেন রাঙা আমলা, তুলে মামলা,
গামলা ভাঙে না,
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হবো,
ঘুষি খেলে বাঁচব না।
জমি চুণচে দিন গুণচে, কেবল বুন্‌চে বীজ
দোহাই না শুন্‌চে একটিবার।
নীলের দাদন, ঠেঙার গাদন, বাঁধন চমৎকার,
করে ভিটে মাটি চাটি সার।

চারদিকে শোনা যায় কেবল আর্তনাদ। তার মাঝে হঠাৎ যেন বজ্রপাত হ'ল। নীল চাষীরা বিদ্রোহ করেছে। দেশে দুর্ভিক্ষ—চাল নেই ঘরে। যারা ভিক্ষে দেবে, তারাও ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে।

নন্দীগাঁয়েও চালের অভাব। নায়েব এসে খবর দিল দেবীর চরের ধান সব কারা যেন কেটে নিয়েছে।

কালীপ্রসাদ অত ভাবতে পারে না। এত দুঃখ, এত অভাব,—কেন—কি করে হ'ল!

কে জবাব দেবে!

অনাবৃষ্টির ছাপ লেগে রয়েছে অক্ষয়বটের পাতায় পাতায়, ডালে ডালে। ক্লান্ত বৃদ্ধ পথিকের মতো নির্জীব হয়ে রয়েছে—এখনও অনেক—অনেক পথ বাকি।

কালীপ্রসাদ ভাবে প্রতাপ বড় হলে কলকাতায় পড়তে পাঠাবে। বৌদি পারবে ত একলা থাকতে? তবুও জগৎটাকে চিনুক সে। বাপ ত তার বেঁচেও মরে রয়েছে।

সতী এসে বলে, 'ঠাকুরপো, খবর পেলে কিছু?'

'কার-!—ও—' কালীপ্রসাদ বুঝতে পারে কার কথা হচ্ছে। জানে সবই, তবু সেকথা গোপন করে বলে, 'না, খবর কিছু আসেনি।'

আর কোনো কথা হয় না। মনে মনে ভাবে, এবার দাদার মদ-বাইজীর টাকা বন্ধ করতে হবে। এমনি করে একটা পরিবারকে উচ্ছন্নে দিতে চায় সে।

'জানো বৌদি, এবার ঠিক করেছি খোকা বড় হ'লে কলকাতা পাঠাবো পড়াশুনা করতে। আজব শহর কলকাতা। কত কী যে সেখানে হচ্ছে এখানে বসে বসে তার কতটুকুই বা জানি। ওখানে গেলেই ও মানুষ হবে,' কালীপ্রসাদ সতীর দিকে না তাকিয়ে দূরে সাঁঝের আকাশের দিকে তাকিয়েই বলে ফেলে।

সতীর বুক কেঁপে ওঠে। 'আমায় তাড়িয়ে দেবে, ঠাকুরপো?'

'সে কি কথা, বৌদি—এ সবই ত তোমার। দাদা দেখেন না, তাই আমি তোমার হয়ে সব দেখাশুনা করছি। কতবার ভেবেছি আলাদা হয়ে যাবো, কিন্তু খোকা আর তোমার জন্য হয়ে ওঠে না।'

'দিদি'—আড়াল থেকে ডাকলো সর্বাণী।

'কি রে!'

'কাল শনিঠাকুরের পূজো ঠাকুরমশায় ফর্দ দিয়ে গেছেন। নায়েবকাকা তোমাকে ডাকছেন—'

শনিঠাকুরের পূজো—দত্তবাড়িকে অভিশাপ-মুক্ত করার জন্য। এত দুঃখেও হাসি পায় সতীর। কিন্তু ঠাকুর যে আবার চটবেন!

নন্দীগাঁয়ের বুকে আরেকটি রাত নেমে আসে। জটাধর বট অন্ধকারে দাঁড়িয়ে যেন মাথা দোলায়। কালীপ্রসাদ বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ায়।

রহমৎ বসে আছে তার ছেলেকে নিয়ে। দত্তবাড়ির সরকার মধুসূদন হুঁকো হাতে বসে শহরের গল্প করছিল। গতকাল গিয়েছিল ইসলামাবাদে দেবীপ্রসাদের কাছে টাকা দিতে। কালীপ্রসাদকে দেখতে পেয়ে রহমৎ ছাড়া সবাই উঠে দাঁড়ায়। বৃদ্ধ রহমৎ আশিবছর পেরিয়ে গেছে। কালীপ্রসাদের বাবার আমলের লোক। এখনও সোজা হয়ে হাঁটে। হাতে সেই বাঁশের লাঠিটি—একদিন যা নিয়ে দেবীর চর দখল করেছিল।

—'কেমন আছো, রহমৎ কাকা?'

—'খোদার মেহেরবানি—আছি বাবা টিঁকে।'

এদের বাঁচার সার্থকতা শুধু টিঁকে থাকায়।

মহিম আচার্য বসে ছিল একপাশে—হঠাৎ বলে উঠে, 'আচ্ছা, ছোটবাবু, সিপাইরা ত গেল—দেশের মুনিব হ'ল বিলিতি সায়েবরা। আমাদের হ'ল কি?'

'কে মুনিব? ওই ইংরেজরা—কতগুলো চোর-বাটপাড়ের দল—এদেশে এসে দু'হাতে লুটে খাচ্ছে—'

দূরে ঝুন ঝুন আওয়াজ শোনা যায়। ডাকহরকরা যাচ্ছে বুঝি কোথাও। এদের বলে 'রাণার'—গাঁয়ের সবাই বলে ডাক-হরকরা। গ্রাম থেকে গ্রামে দৌড়ে তারা চিঠি বিলি করে আসে। ডাকে আবার টাকাও নাকি আসে। নন্দীগাঁয়ের ডাক বয়ে আনে সিধুচরণ।

কালীপ্রসাদের কথা থেমে গিয়েছিল -অন্ধকারে দীঘির পারের পথের দিকে একবার তাকায়। অক্ষয়বটের কালো ছায়ায় কিছুই দেখা যায় না।

'ইংরেজকে বল মুনিব?' কালীপ্রসাদ আবার বলল।

'শুনেছি ওদের হুকুম না মানলে নাকি ওরা কয়েদ করে?' মহিমের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।

ডাকের ঘণ্টাটা একটু জোরে বাজছে। এদিকেই আসছে না!

দেখতে দেখতে ডাক-হরকরা সিধু দত্তবাড়ির সামনে এসে পড়ে। এক হাতে তার বিলিতি বাতি—আর এক হাতে বল্লম। বল্লমের গায়ে নূপুরের মতো তামার টুকরো বেজে ওঠে।

সিধু এসে ঢোকে দত্তবাড়িতে। লণ্ঠনের আলোতে দেখে কালীপ্রসাদ বাহির বাড়িতে বসে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়। 'কিরে সিধু', কালীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করল।

'আজ্ঞে, বড় কর্তার নামে চিঠি এসেছে কাশী থেকে—'

'কাশী থেকে? কই দে দেখি', কালীপ্রসাদ ব্যস্ত হ'য়ে হাত বাড়ায়।

নন্দীগাঁয়ের ডাকঘর। সেই ডাকঘরে চিঠি এসেছে কাশী থেকে। দত্তবাড়ির প্রথম চিঠি। কালীপ্রসাদ মাথায় ঠেকিয়ে খোলে চিঠিখানা। বাবার চিঠি—অনেক দিন কোনো খবর নেই তাঁদের।

কিন্তু—

এ ত বাবার হাতের লেখা নয়! চল্লিশ বছর পেরিয়ে গেছে বটে কিন্তু চোখ ত ঠিক আছে।

হঠাৎ 'উঃ' বলে আর্তনাদ করে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল কালীপ্রসাদ। সিধু ভয়ে কাঁপছে। ভেবেছিল কিছু বকশিস পাওয়া যাবে। কি হ'ল! পাশে কাছারি ঘরে নায়েব মশায় ছিলেন—ছুটে এলেন। নায়েব চিঠিটা তুলে নিয়ে পড়লেন। চিঠিতে লেখা আছে:

'দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে সস্ত্রীক ফিরিবার পথে রাজেন্দ্রনারায়ণ দত্ত কোম্পানির সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েন। তাহাদের গুলিতে বিদ্ধ হইয়া তিনি নিহত হন। তাঁহার স্ত্রী কুসুমদাসীও জমাদার সাহেবের পদাঘাত সামলাইতে না পারিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। কাশীধামে অশান্তি থাকায় যথাসময়ে পত্র দেওয়া সম্ভব হয় নাই। জ্ঞাত কারণ লিখিলাম, ইতি।

গতিগোবিন্দ শর্মণঃ

রাজেন্দ্রনারায়ণ ও কুসুমের মৃত্যুর একবছর পরের সংবাদ।

দীঘিতে স্নান করে এসে কালীপ্রসাদ গলায় উত্তরীয় পরে। মনে পড়ে তার বাবার কথা। যাবার দিন—কি ক্লান্ত উদাস দৃষ্টি তাঁর। কিন্তু এ মৃত্যু যে অস্বাভাবিক। নীলসাহেবের হুকুমে অশীতি-পর রাজেন্দ্রনারায়ণকে গুলি করে মারা হ'ল! আর মা!

কালীপ্রসাদের চোখে আর জল নেই। আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে দুচোখ থেকে। রাত্তিরেই গ্রামে প্রচারিত হয়ে গেছে রাজেন্দ্রনারায়ণ ইংরেজের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন।

দেবীপ্রসাদকে খবর দিতে হবে। রাজেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবীপ্রসাদ! সিপাই তাড়ানোর জন্য উইল্‌সন সাহেবকে টাকা দিয়েছে। কালীপ্রসাদ খবর পেয়েছে সব। রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু ঘটল উইলসনদের দলের হাতে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেদিন কালীপ্রসাদ ইসলামাবাদে গেল। বড় ছেলের দায়িত্বই বেশী। দেবীপ্রসাদকে জানাতে হবে বাবার মৃত্যু সংবাদ!

বেলা গড়িয়ে গেছে। কালীপ্রসাদ ধীরে ধীরে এসে পৌঁছল দেবীপ্রসাদের বাড়ির সামনে। ভেতরে যেতে ইচ্ছে করে না—তবু যেতে হবে। ফটকে লেখা রয়েছে 'হীরা মহল'!

দরজার কাছে যেতেই দেবীপ্রসাদের দারোয়ান জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই?' পিতৃদায়গ্রস্ত কালীপ্রসাদকে দেখে তার মনে হল, বোধ হয় মুনিবের কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছে।

'তোমার মুনিব আছেন?'

'তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না।'

কালীপ্রসাদের বড়ো দুঃখেও হাসি পেল। দেখা করার মুখ আছে কি দেবীপ্রসাদের!

'বলগে, নন্দীগাঁ থেকে লোক এসেছে।'

মুনিবের গাঁয়ের নাম শুনে ভাবল—হয়ত কর্তার দরকার থাকতে পারে।

'দাঁড়াও, খবর দিয়ে দেখি—'

দেবীপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে হ'লে কালীপ্রসাদের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

কিছুক্ষণ পরে এসে দারোয়ান বলল, 'যা বলবার আমাকে বলে যাও—কর্তা দেখা করবেন না।'

শুনে কালীপ্রসাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল। দেবী-প্রসাদের ওপর যা রাগ ছিল সব গিয়ে পড়ল দারোয়ানের ওপর। প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিল তার গালে। দারোয়ান কি করবে ভেবে নেবার আগেই একেবারে দেবীপ্রসাদের খাস কামরায় গিয়ে ঢুকল সে।

হীরার কণ্ঠলগ্ন দেবীপ্রসাদ হঠাৎ তার ঘরে নতুন মানুষের আবির্ভাব দেখে চমকে উঠে।

কালীপ্রসাদ না!

হীরা উঠে যাবার চেষ্টা করতেই দেবীপ্রসাদ তাকে টেনে বসাল।

কারও মুখে কোনো কথা নেই। জীবনে ব্যভিচার, অত্যাচার কাকে বলে এক মুহূর্তের মধ্যে দেখে নেয় কালীপ্রসাদ। অত্যাচার—পাপের চিহ্ন ফুটে উঠেছে দেবীপ্রসাদের চোখে মুখে।

'বাবা-মা দুজনেই ইংরেজসৈন্যের হাতে কাশীধামে পরলোক গমন করেছেন—'কালীপ্রসাদ যেন অনেক দূর থেকে কথা বলছে। দেবীপ্রসাদের কিছুই কানে গেল না।

'কি বললে?'—নেশায় জড়ানো কণ্ঠ দেবীপ্রসাদের।

'মা বাবা কেউ নেই? কোম্পানির সৈন্য তাঁদের মেরে ফেলেছে আজ এক বছর আগে।'

'আমায় কি করতে হবে?' দেবীপ্রসাদ হীরার দিকে তাকিয়ে বললেন।

'তুমি বড় ছেলে, তাঁদের কাজের ভার তোমার ওপর।'

'আমার ও সব ভালো লাগে না। বুড়োমানুষ মরেছে—স্বর্গে গেছে—'

'দাদা'—চিৎকার করে উঠল কালীপ্রসাদ।

চমকে উঠেছিল দেবীপ্রসাদ—চোখ মেলে তাকিয়েই আবার হেসে চোখ বুজল, 'শাসাতে এসেছ বুঝি—হীরা আর একটু সরাব দাও।'

'তোমার সঙ্গে কথা কইতেও ঘেন্না করে—তুমি মানুষ নও। তুমি জানোয়ার।' কালীপ্রসাদের মুখখানা যেন পাথরের মতো নিশ্চল, শক্ত।

'জানোই ত সব– আবার কান্না গাইতে এসেছো কেন? সতী পাঠিয়েছে বুঝি?'

'তুমি ইতর—তাই একথা বলতে পারলে!'

'আমি ইতর তা জানি—সতীর সতীপনা আমাকে নিয়ে নয়, ও তোমার—'কথা শেষ করতে দিল না কালীপ্রসাদ। দেবীপ্রসাদের চুল ধরে টেনে তুলল। বাঁধ ভেঙে গেল ধৈর্যের।

'মানুষটাকে খুন করবে নাকি?' হীরা এসে কালীপ্রসাদের হাত ধরে ছাড়াতে গেল দেবীপ্রসাদের চুলের গোছা।

এতক্ষণে নেশা কেটেছে দেবীপ্রসাদের। হঠাৎ যেন কান্না উথলে উঠল তার।

হীরা ভাবল, কালীপ্রসাদের ভয়ে বুঝি এই কান্না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে হাঁক দিল—'আমজাদ!'

আমজাদ ছুটে এসেই কালীপ্রসাদকে দেখে হটে গেল। কিছুক্ষণ আগে এরই চড় খেয়েছে সে। হীরা তাকে বলল, 'ইসকো নিকাল দেও।' এ হুকুম পালন করা আমজাদের পক্ষে দুঃসাধ্য।

দেবীপ্রসাদকে ছেড়ে দিতেই মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। 'আমি যাচ্ছি। মা-বাপের মৃত্যু-সংবাদ দিতে এসেছিলাম। এই শেষ বন্ধন ছিল তোমার সঙ্গে। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। বাড়িতে তোমার ছেলে আছে, বউ আছে—আর তুমি এখানে বসে উচ্ছৃঙ্খল জীবন কাটাচ্ছ। এরপর পয়সা আসবে কোত্থেকে!' কালীপ্রসাদ যেন...

'আমার জমিদারি থেকে'—দেবীপ্রসাদের নির্লিপ্ত উত্তর।

'জমিদারি তোমার একা নয়। এখন থেকে তোমার ছেলের দিকে তাকিয়ে আর তোমার খেয়ালখুশি মেটাবার জন্য কোনো টাকা পাঠানো হবে না।

'আলবৎ হবে, ও টাকা আমার।'

'তোমার নয়—তুমি যেভাবে পারো আদায় করবার চেষ্টা কোরো।' কালীপ্রসাদ বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। 'আঃ বাঁচা গেল'—ফিরে এল সে নন্দীগাঁয়ে। তার চেহারা দেখে কারও সাহস হলনা কিছু জিজ্ঞাসা করতে। শুধু নায়েবকে ডেকে কালীপ্রসাদ বলে দিল, 'ইসলামাবাদে আমার হুকুম ছাড়া টাকা পাঠাবেন না।'

আরও কিছুদিন পেরিয়ে গেছে। রাজেন্দ্রনারায়ণ আর কুসুমের কাজ শেষ হয়েছে। দেবীপ্রসাদ আসেনি। কেউ মুখ ফুটে তার নামও উচ্চারণ করেনি। সতী একা বসে শুধু চোখের জল ফেলে। তার জীবনে সব মিথ্যে হয়ে গেছে—এক প্রতাপনারায়ণ ছাড়া।

নন্দীগাঁয়ের আকাশে বাতাসে শুধু কান্না আর কান্না। কিছুতেই যেন সে থামতে চায় না।

কালীপ্রসাদ কিছুই ভেবে পায় না। নন্দীগাঁয়ের বাইরে একটা নতুন দেশ জেগে উঠছে। কিন্তু নন্দীগাঁ পড়ে আছে সেই আলিবর্দীর যুগে। সেই চতুষ্পাঠি আর মক্তব। এখানে নতুনের কোনো আভাষ নেই।

ইংরেজ আমলের বিকৃতিটুকু পেল দেবীপ্রসাদ। পাপের চরম সীমাও সে অতিক্রম করে গেছে। ঘর ছেড়ে, স্ত্রীপুত্র ছেড়ে অন্ধ উন্মত্ততার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে। ঘরও বাঁধতে পারলে না—বাইরকেও আপনার করে পেলে না।

হীরা বাইজীর নামে বাড়িখানা লিখে দিয়েছে দেবীপ্রসাদ। এখন সে আছে তার আশ্রয়ে। এই হীরার জন্য তার আপনার বলতে কেউ আর রইল না। হীরা তা কতখানি বোঝে!

আজ তিন মাস চলে গেল—নন্দীগাঁ থেকে কোনো টাকা আসছে না। দেবীপ্রসাদ বুঝতে পেরেছে—এ কারসাজি কালীপ্রসাদ আর সতীর।

খবর পাঠালো কয়েকবার কিন্তু কোনো উত্তরও আসে না, টাকাও আসে না। হীরা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। যে ভালোবেসে রাখে তাকে নাকি তারা দিল্ দেয়। মিছে কথা! অর্থ সামর্থ্যের কাছেই তারা ধরা দেয়।

'আর কদিন এভাবে চলবে', হীরা অধীরভাবে প্রশ্ন করে।

'যে কয়দিন চলে—কাছে এস!'

'না।' এখন হীরা আর আসে না।

সুলতানপুরের পাঁচকড়ি রায়ের লোক হাঁটাহাটি করছে হীরার কাছে। অনেক টাকাপয়সা, হীরা-জহরৎ—রানীর হালে রাখবে তাকে।

দেবীপ্রসাদও এবার দেখে নেবে কালীপ্রসাদ আর সতীর চক্রান্ত কতদূর যেতে পারে।

দেবীপ্রসাদের দিন ফুরিয়ে এলো বুঝি।

মহারানীর প্রজা দেবীপ্রসাদ—কালীপ্রসাদের বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন। তার অংশ জবরদখল করেছে কালীপ্রসাদ—তহবিল তছরুপও করেছে। তার স্ত্রী সতীও এই চক্রান্তে জড়িত আছে।

বলতে দ্বিধা হলনা একটুও। ইংরেজের আইন ন্যায়ের কণ্ঠ-রোধ ক'রে অন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করে।

নন্দীগাঁয়ের জমিদার দত্তদের সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেল।

সতী কালীপ্রসাদকে বললেন, 'গরিবের ঘর থেকে এসেছিলাম—আবার তাই হলাম। বাপের বাড়িতেও জায়গা হবে না। এখন কোথায় যাই বল ত?'

কালীপ্রসাদ অবাক হয়ে যায় সতীর কথায়।

'তুমি আমার বৌদি, প্রতাপের মা, তুমি যাবে কোথায়? এ বাড়ির বড় বউয়ের মর্যাদা কোনো দিক থেকেই ক্ষুণ্ণ না হয় সে আমি দেখব।' একটু থেমে আবার বলল, 'বাবা আমাদের দু'জনের বিয়ে দিয়েছিলেন দুই বোনের সঙ্গে। তাঁর ভয় ছিল পাছে কোনো গোলমাল হয়। কিন্তু তোমরা রইলে ঠিক—যত গোলমাল আমাদের দু'ভায়ে।'

সর্বাণী এসে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েছে। দিদি হলেও বড় জা ত। দিদির কি হবে সে ভেবে পায় না। কালীপ্রসাদের কথা শুনে দুহাত তুলে ইষ্টদেবকে প্রণাম জানালো।

বাড়ির ছেলেমেয়েরা খেলছে উঠোনে। কালীপ্রসাদ প্রতাপের মুখখানা ভালো করে চেয়ে দেখে। রাজেন্দ্রনারায়ণের মুখের সংযত গাম্ভীর্য যেন ওর মুখে ফুটে উঠেছে।

বাবার কথা মনে পড়ে কালীপ্রসাদের। নীলসাহেবের হুকুমে তাঁকে গুলী করে মারা হয়েছে। আর মা কোম্পানির জমাদারের—

কালীপ্রসাদ আর ভাবতে পারে না। আর ওদিকে দেবীপ্রসাদ উজার ক'রে দুহাতে টাকা বিলিয়ে দিল কোম্পানিকে।

নায়েব এসে খবর দিল তালুক বিজয়পুর দেবীপ্রসাদ বিক্রি করে দিচ্ছে। কালীপ্রসাদ বলে, 'ও আর কিছুই রাখতে পারবেনা—একে একে সবই যাবে। লোক পাঠিয়ে কিনে রাখুন।'

হীরার খেয়াল মেটাতে গিয়ে একে একে বিষয়-সম্পত্তি সবই যাচ্ছে। দেবীপ্রসাদ হীরাকে বলে, 'তোমাকে সবই দিয়েছি—আজ আর আমার বলতে কিছুই নেই।'

'সব দিয়েছ বলেই ত দিল্ দিয়েছি।'

হায়রে দিল্! নিজেকে ফতুর করে দিয়েও তার নাগাল পেল না দেবীপ্রসাদ।

তবুও, উপায় কি! যে ক'টা দিন কাটে কেটে যাক।

কালীপ্রসাদ বেনামদার দিয়ে দেবীপ্রসাদের সমস্ত সম্পত্তি একে একে কিনে নেয়। আবার নন্দীগাঁয়ের দত্তদের বিষয়-সম্পত্তি এক হ'ল। কিন্তু বাবুরা আর এক হলো না। দেবীপ্রসাদ হারিয়েছে তার সব অধিকার। নন্দীগাঁয়ে ফিরে আসার পথও তার বন্ধ হয়ে গেছে।

এত দুঃখে, এত অপমানে সতী তবুও স্বপ্ন দেখে। ব্যর্থজীবনে জাগে দুরাশার স্বপ্ন। হায়রে মানুষ!

॥ পাঁচ ॥

হিন্দুধর্ম একটা জীর্ণ খোলস ধারণ করে যেন কোনোরকমে টিঁকে আছে। ইংরেজরা এসে সংস্কারের দীনতা থেকে তাকে কিছুটা মুক্ত করেছিল। তবুও প্রাচীনপন্থীদের হাতে রইল জীর্ণ সংস্কার ব্যবস্থার অনুশাসন অস্ত্র।

তারই বিরুদ্ধে যেন শুরু হ'ল ব্রাহ্ম আন্দোলন। মহাত্মা রামমোহনে যার শুরু—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে যার প্রতিষ্ঠা। কলকাতায় এই ধর্ম আন্দোলন শুরু হয়ে ধীরে ধীরে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

ইসলামাবাদেও তার হাওয়া এসে লেগেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ তার অর্থ বোঝেনা, তাই তার মূল্যও দিতে পারে না। নানা দেবদেবী, আচার-বিচার, সংস্কার সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ থেকে সাধারণ মানুষ মনে করে—এই ভালো। যারা সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসে আছে তাদের জীবনের শত গলদও এদের চোখে পড়েনা।

মহারানীর রাজত্ব কাল। জাতীয় জীবনে ছোটখাটো দু'চারটি উদ্বেগময় মুহূর্ত ছাড়া দেশের মানুষের মধ্যে একটা নিষ্ক্রিয়তা যেন এসে পড়েছে। একেই বলা হচ্ছে শান্তি। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর অসন্তোষের আগুন ক্ষণিকের জন্য শুধু চাপা পড়েছে। অনেক দুঃখে, অনেক আঘাতে, অনেক অসম্মান লাঞ্ছনায় দেশের মানুষ এখন বুঝেছে পরাধীনতার গ্লানিকে। বিত্তহীন দরিদ্রজীবনে এই পরাধীনতার বেদনা আরো তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে।

দেশ অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে আছে। ধর্মবুদ্ধিও তার সম্পূর্ণ জাগ্রত নয়—ধর্মমোহই তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ইসলামাবাদের দুচারজন ভদ্রলোক
আকৃষ্ট হলেন। অনেকেই গ্রাম ছেড়ে শহরে।
তবে গ্রামের সম্পর্ক একেবারে ত্যাগ করে.
রজনী দাস, সুখচরের রমেশ সেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প.
ইসলামাবাদে সবাইকে বলতে শুরু করলেন, 'মূর্তিপূজে.
ঈশ্বর এক—ব্রহ্মই সত্য।' কিন্তু কেউ সায় দেয় না ত? পিতৃপিত.
চোদ্দ পুরুষের সংস্কার—হঠাৎ একদিনে ত আর হয়না।

নন্দীগাঁয়েও এ খবর গেছে। দ্বারিক শিরোমণি, মহিম আচার্য আঁতকে উঠলেন। দত্তবাড়ির নাট-মন্দিরে বসে গাঁয়ের বৃদ্ধরা। মহিম আচার্য ইসলামাবাদ গিয়েছিলেন যজমান বাড়িতে। ফিরে এসে একে একে সবাইকে একবার বলেছেন। জমিদার বাড়িতেও খবরটা পৌঁছে দেওয়া দরকার। নইলে গাঁয়ের সর্বনাশ হবে।

বামুন কায়েত সবাই এসে বসেছেন। দ্বারিক শিরোমণি মহিমকে ঠেলা দিয়ে বললেন, 'বলি, ব্যাপাবটা একটু সবাইকে খুলেই বলনা।'

মহিম এর মধ্যে হিন্দু-মুসলমান কাউকে বলতে বাকি রাখেনি। তবুও আর একবার যখন বলবাব উৎসাহ পেল তখন মুখ বেঁকিয়ে বলতে শুরু করেন, 'ছি, ছি, হিঁদুব ছেলে হয়ে বলে কিনা পুতুল পুজো ক'রোনা। এযে একেবারে কেরেস্তানী ব্যাপার। দুপাতা ইংরেজি শিখেছে আর অমনি বলে বসল ঈশ্বর নিরাকার। বলি, দেশের হ'ল কি খুড়ো!'

কথা শেষ হবার আগেই কালীপ্রসাদ এসে পড়ল। দ্বারিক শিরোমণি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'বাবাজী যেন আবার গাঁয়ে ইংরেজি পাঠশালা না খোলেন। দেশ উচ্ছন্নে যাবে।'

কালীপ্রসাদ তাঁর কথার কোনো জবাব দিলনা। ইংরেজ নামটা শুনতেই তার বুকের মধ্যে যেন আগুন জ্বলে ওঠে—প্রতিশোধের প্রচণ্ড আবেগ সমস্ত মনের ওপর বৈশাখী ঝড়ের সম্ভাবনা জাগিয়ে

৬

.ার মৃত্যুর কথা সে ভোলেনি। ভোলেনি
.া। পদ্মনাভ ঠাকুরের বিধবা কন্যা বৃদ্ধা নেত্যর
। বেঁচে আছে ত ?
.য়ের প্রতিশোধ যে তাকে নিতেই হবে।

নন্দীগাঁয়ের নতুন খবর—সদরের বড় সায়েব আসছেন। নন্দী-গাঁয়ে পায়ের ধুলো দেবেন। তিনি তাঁর বোটেই থাকবেন। এত বড়ো একটা খবর—কিন্তু কারও মনে যেন কোনো উৎসাহই নেই। বরং সবার মনে কি যেন একটা আশঙ্কা জেগেছে। কেন আসছে ?

হিল সায়েবও একদিন এসেছিল। এবার আসছে উড্ সায়েব। একশ বছরের মধ্যে তাদের কোনো পরিবর্তন ঘটেছে কি ?

নায়েব এসে কালীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করল, 'একটা কিছু না করলে ত চলবেনা। সায়েব আসছে—এখন সে-ই খোদ-কর্তা। শেষে না এই একটি ব্যাপারের জন্য—'

'না—,' কালীপ্রসাদ যেন হঠাৎ গর্জে উঠল, 'মা বাবার কথা কি ভুলে গেছেন, নায়েব মশায় ! ওদের নিয়ে রোশনাই করা চলবে না।'

'কিন্তু ছোটকর্তা, এখন যে তাদের কথাই মেনে চলতে হবে,' নায়েব মশায় অনুনয় করে বলে।

যুগ বদলেছে—কিন্তু মানুষের দুঃখ ত একই আছে। ইংরেজের রাজ্য—কিন্তু রাজেন্দ্রনারায়ণের হত্যার বেদনা তাতে ঘুচল কি !

'দেবীপ্রসাদ দত্তের আমলে যা ঘটতে পারত আমার আমলে তা পারেনা।' কালীপ্রসাদের শেষ কথা।

নায়েব মশায় বুঝল—এখানে হবে না। বড় মার কাছে যেতে হবে।

সতী এত সব বোঝেনা। বাইরের জগতের এত জটিলতা তার জীবনের সঙ্গে যেন খাপ খায়না। দত্তবাড়ির এক কোণে সে পড়ে আছে—জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তার কুণ্ঠা জড়ানো। অথচ কালী-প্রসাদ তার মতামত নিয়ে জমিদারি চালিয়ে যাচ্ছে।

নায়েব অন্দরে এলো—দরজার আড়ালে সতী দাঁড়িয়ে। সেদিকে লক্ষ্য করে নায়েব বলল, 'মা, আপনি না বললে ত ছোটকর্তা শুনবেন না। বড় সায়েব সদর থেকে আসছেন। আমাদের একটা-কিছু ব্যবস্থা করা উচিত।'

'ছোটকর্তা কি বলেন?' সতী প্রশ্ন করে।

'তিনি স্বর্গীয় কর্তার মৃত্যুর নজির দেখিয়ে কোনো ব্যবস্থা না করাই উচিত মনে করেন।'

'তা হলে কিছু করাও ত সম্ভব নয়!'

'কিন্তু মা,—'

'সায়েব কেন আসছে তাও আমরা জানিনে। আর শুনেছি এ বাড়িতেও সায়েব কারও ধাতে সয়না! আপনি ত আমার চেয়ে ভালো জানেন,' সব কথা একসঙ্গে সে বলতে পারলো না। 'সায়েব কারও ধাতে সয়না' বলেই তার মনে হ'ল কথাটা ত ঠিক নয়। দেবীপ্রসাদেব কি করে সইল!

নায়েব বিপদে পড়ল। তবু চেষ্টা করে একবার দেখতে হবে ত! 'দিনকাল বদলে গেছে, মা! এখন ঘোর কলিকাল—সমস্ত দেশের রাজা এখন ইংরেজ। আপনি একটু বলুন, মা—নইলে যা আছে তাও থাকবেনা। ছেলেমেয়েরা খাবে কি?'

ছেলেমেয়েদের খাওয়া—সতী একটু চমকে ওঠে। 'আচ্ছা, আমি ছোটকর্তাকে বলে দেখব।'

অনাদৃতা-সতী ও মা-সতী—নিত্যকালীন নারীজীবনের সহজ সুন্দর রূপটি তার মাঝে প্রকাশ পেল। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েও মাতৃহৃদয় কেঁদে ওঠে।

এরাই পৃথিবীর কন্যা!

সব গেছে—কিছু নেই। ধন-দৌলত, রূপ, স্বাস্থ্য—সব হারিয়ে দেবীপ্রসাদ আজ হীরার দয়ার ভিখারী। হীরামহলের মালিক হীরা বাইজী। সুলতানপুরের জমিদার হীরার কৃপা-দৃষ্টি লাভ করেছে।

পাপের ইমারতে নন্দীগাঁয়ে আর সুলতানপুরে এক হয়ে গেছে।

হীরা দেবীপ্রসাদের সন্তানের মা। কিন্তু পূর্ণ যৌবনের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গবেগ মাতৃত্বকেও ছাপিয়ে ওঠে।

দেবীপ্রসাদ হীরামহলের কেউ নয়। বা'র-দেউড়িতে তার বাসা। ছেলেটাকে রাখে সে—আদর করে ছেলের নাম রেখেছে রূপনারায়ণ।

জীবনের ভুল তার চোখে ধরা পড়ে না। মাঝে মাঝে মনে হয় অতীতের কথা। কিন্তু একেবারে সেদিনগুলোতে আর ফিরে যেতে পারে না। সব যেন গুলিয়ে যায়।

ছাপরার বেহারী হীরার দারোয়ান। আমজাদ বেঁচে নেই। বেহারীর ঘরে বসে দেবীপ্রসাদ মাঝে মাঝে বলে, 'জানিস বেহারী, আমার অনেক ছিল। এই বাড়িও আমার ছিল। কিন্তু আজ আর কিছুই নেই।'

বেহারীর বিশ্বাস হয় না। সে এই মুনিবকে দেখেনি। হীরা বাইজীর চাকর সে।

ওদিকে হীরা বাইজীর ঘরে গান হচ্ছে—

বুল বুল শুনে না কেঁও কফসমেঁ চমনকী বাত।
আবরএ বতন কো লগে খুশ বতন কী বাত॥

'আম্সুক-মাস্সুকের' মনের কথা—প্রেমিক-প্রেমিকার জীবন ভোগের গান।

এখন হীরামহলে আরও দুচারটি মেয়ে থাকে। হীরার আশ্রিতা তারা।

দেবীপ্রসাদ রূপনারায়ণকে কোলে করে ঘুরে বেড়ায়। বাইজীর হুকুম। মদের নেশা তার ছুটে গেছে।

ধিক্কৃত এই জীবনের কোথাও কি দত্তবংশের মর্যাদাবোধ নেই।

সেদিন দেবীপ্রসাদ হীরাকে একা পেয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হীরা বিরক্ত হয়ে বলল, 'এখানে কি চাই?'

'জানো, এ আমার বাড়ি। তুমি বাইরের লোক নিয়ে মাতামাতি করবে এ আমি সহ্য করব না—'দেবীপ্রসাদের মুখে কথাটা যেন বড় বেমানান হয়ে পড়ল।

হীরা খিল খিল ক'রে হেসে বলে, 'তোমার বাড়ি। আমার কাছে তুমি সবই বিকিয়ে দিয়েছ। তোমায় আমি দয়া করে থাকতে দিয়েছি। কারণ তুমি আমার ছেলের বাপ। একটু মায়া হয়। নইলে—যাক। আমি যেভাবে থাকি তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। খবরদারি করতে এসনা।'

হীরার গায়ে দেবীপ্রসাদের দেওয়া গয়নাগুলো যেন ঝলমল করে উঠল। তারাও যেন তাকে বিদ্রূপ করছে।

দেবীপ্রসাদের আজ আর নেশা নেই।

'তোমায় মাথায় করে রেখেছিলাম—সর্বস্ব তোমায় দিয়েছি। এত নেমকহারাম তোমরা। তুমিই না বলতে—যে আদর করে রাখে তাকে দিল্ দিয়ে দিই!' মরিয়া হ'য়ে বলে ফেলল দেবীপ্রসাদ।

'এই ঘরবাড়ি আমার—আর যদি চেঁচাও ত বেহারীকে দিয়ে ঘাড় ধরে বার করে দেবো।'

সহ্য হ'ল না দেবীপ্রসাদের। যার জন্যে আজ সে সব হারিয়ে নিঃস্ব ভিখারী হয়েছে তার মুখে এই কথা! মোহ কেটে গেল তার।

'বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও বলছি—আমার বাড়িতে বসে অন্য মানুষ নিয়ে—' বলেই হীরার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিতেই টাল সামলাতে না পেরে হীরা পড়ে গেল।

গোলমাল শুনে বেহারী ছুটে এসেছিল। সুলতানপুরের জমিদারও টল্‌তে টল্‌তে এলেন।

বেহারী মারধোর করে বার করে দিল দেবীপ্রসাদকে।

আহত, নিঃস্ব দেবীপ্রসাদ আজ পথে।

একদিন সুলতানপুরের নীলরতন রায় দেবীপ্রসাদের পিতা রাজেন্দ্রনারায়ণের কাছে হার মেনে নন্দীগাঁ দখলের আশা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল।

আর আজ!

ওদিকে নন্দীগাঁয়ে সদরের বড় সায়েব এসেছে। গাঁয়ের সবাই সায়েবকে সেলাম জানাতে গেল। দ্বারিক ঠাকুর আর মহিম আচার্য নিজেদের হিন্দুয়ানির গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে সায়েবের সামনে একেবারে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন। গেল না শুধু কালীপ্রসাদ। মা-বাবার চিতার আগুন যেন তার চোখের সামনে এখনও জ্বলছে।

উড্‌সায়েবের সঙ্গে দোভাষীও এসেছে। এরা সামান্য একটু ইংরেজি শিখে কথাবার্তা বোঝবার এবং বুঝিয়ে দেবার কাজ চালিয়ে যায়। আবার অনেকে ইংরেজের গুপ্তচরের কাজও করে। উড্-সায়েবের সঙ্গে যে এসেছে তার নাম কালীকিঙ্কর। দরিদ্র প্রজাদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে টাকা আদায় করা, আদায় করতে না পারলে ভিটেমাটি ছাড়া করা—এই ছিল তার ব্যবসা। উড্‌সায়েবের আস্‌কারা পেয়ে কালীকিঙ্কর এখন আর কাউকে মানুষ বলেই মনে করে না।

নন্দীগাঁয়ের সব খবরই তার নখদর্পণে। এখানে আসার পর সারা গাঁখানা ঘুরে সব খবর নিয়েছে। কালীপ্রসাদ আসছে না দেখে উড্‌সায়েবকে বলল, 'হুজুর, এই গাঁয়ের জমিদার কিন্তু আপনাকে এখনও সেলাম জানাতে আসে নি।' উড্‌সায়েব ভাঙা বাঙ্‌লায় বলল, 'আজই টাকে খবর ডিবে।'

কালীকিঙ্কর উৎসাহ পেয়ে বলল, 'কালীপ্রসাদের দেমাক বড় বেড়ে গেছে। ওর বাপ-ঠাকুর্দাও কোম্পানির সঙ্গে গোলমাল করেছিল।'

উড্ সায়েব বলল, 'একি ডাকু জমিদার নাকি? টা হইলে টাকে শায়েস্টা করিটে হয়।'

কালীকিঙ্কর বলল, 'আমি হুজুরের হুকুম তাকে জানিয়ে আসি, তারপর হুজুর বিচার করবেন।'

দত্তবাড়িতে এসে পৌছল কালীকিঙ্কর। নায়েব তখন রজনী তহসিলদারের সঙ্গে বসে উসুল মিলিয়ে নিচ্ছিল। জমিদারের কাছে প্রজার খাজনা দু'টাকা—কিন্তু দিয়েছে সে আড়াই টাকা। পেয়াদা, তহসিলদার, নায়েবরা নিজেদেব বখরা ভাগ করে নেয়। অনেক সময় খাজনা আদায় করেও জমা করে না! জমিদার সরকারকে দেবে বারো আনা! পেয়াদা থেকে সরকার পর্যন্ত সবার মন রেখে চলতে হয় এই হতভাগা প্রজাদের।

সেই প্রজা ঠেঙানো পয়সা মেলাচ্ছে নন্দীগাঁয়ের নায়েব। এমন সময় কালীকিঙ্কর এসে সেখানে দাঁড়াতেই নায়েব একগাল হেসে 'এই যে আসুন—গরিবের বাড়িতে হঠাৎ আপনার ' বলেই উঠে দাঁড়াল। ওর কাছে কালীকিঙ্কর আর উড্ সায়েব প্রায় একই। বড় সায়েবের সঙ্গে এসেছে—একটু বেশি খাতির না দেখালে চলে কি করে।

'এলাম আপনাদের বাবুর সঙ্গে দেখা করতে—একবার ডেকে দিন ত!' কালীকিঙ্করের কণ্ঠে যেন তাচ্ছিল্যের আভাস।

নায়েব পড়ল বিপদে। কালীপ্রসাদের কাছে এ খবর দেওয়া যে কি তা তার জানা আছে।

একটু আমতা আমতা করে বলল, 'তা আমাকে বললে হ'ত না। উনি হয়ত—' কথা শেষ করতে না দিয়েই কালীকিঙ্কর বলল, 'না, ওঁকেই দরকার, হুজুর পাঠিয়েছেন।'

'আচ্ছা, আমি দেখছি। আপনি একটু বসুন। ওরে কে আছিস —এদিকে একটু তামাক দিয়ে যা'—বলেই নায়েব চিন্তিতমনে অন্দরের দিকে গেল।

দীঘির পাড়েই কাছারি ঘর। ওদিকে চোখ পড়তেই কালীকিঙ্কর চমকে উঠল। দীঘির ওপর বটের কালো ছায়া নেমে এসেছে। ওদিকটা যেন কি রকম থমথমে। হঠাৎ সে আপন মনেই বলে উঠল, 'বাড়ির সামনে ওরকম গাছ রেখে কি লাভ?'

রজনী তহসিলদার তালুক শ্রীপুরের কিস্তি জমা মেলাচ্ছিল। কালীকিঙ্করের গলা শুনতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমায় কি কিছু বললেন?'

হুঁকোটা হাতে নিয়ে কালীকিঙ্কর অক্ষয়বটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাড়ির সামনে ঐ অলক্ষুনে গাছ। ওটাতে নিশ্চয়ই দৈত্যি-দানা আছে।'

মানুষের বহুদিনের সংস্কার। রজনী তহসিলদার বলল, 'আজ্ঞে, ও কথা বলবেন না। এদের পূর্ব-পুরুষ ওঁর নাম রেখেছিলেন 'অক্ষয়বট'। উনি জাগ্রত দেবতা। গ্রামের সবাই ওঁকে খুবই মান্য করে।' কলম রেখে হাত তুলে প্রণাম করল তহসিলদার মশায়।

নায়েবের কাছে সব শুনে কালীপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে গেল। আজ পর্যন্ত কেউ তাকে হুকুম করেনি! দত্তবাড়ির কেউ কোনদিন কারও হুকুম তামিল করেনি। উড্‌সায়েবের চাকর হুজুরের হুকুম জানাতে এসেছে!

'বলে দিন, আমার সঙ্গে দেখা হবে না। যা বলার আপনাকে বলে যাক,' কালীপ্রসাদের কণ্ঠস্বর উত্তপ্ত।

নায়েব বিপদে পড়ল। এ বাড়ির দুর্যোগ কি কাটবে না!

বৃদ্ধ নায়েব হাত জোড় ক'রে বলল, 'ছোটকর্তা, আমার অনুরোধ রাখুন। দিন-কাল বড় খারাপ। এরা যদি অনিষ্ট করতে চায় তাহলে আর রক্ষে নেই।'

কালীপ্রসাদের কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। ভৃত্য হরিচরণকে ডেকে বলল, 'বাইরে যে লোকটা বসে আছে তাকে

বলে আয়—আমার সঙ্গে দেখা হবে না। সায়েবের দরকার থাকলে এখানে আসতে পারে।'

নায়েব বুঝল কোনো প্রকারেই মত করানো যাবেনা। ধীরে ধীরে কাছারি ঘরে এসে উপস্থিত হল।

হরিচরণ আগেভাগেই খবর দিয়েছে। নায়েবকে দেখে কালী-কিঙ্কর একটু হেসে বলল, 'আমি জানতাম—কিন্তু কাজটা ভাল হলনা। যাক্ চললাম।' নায়েবের বলার নেই কিছুই।

কালীকিঙ্কর কিছুদূর গিয়েই আবার ফিরে এসে নায়েবকে বলল, 'একজন লোক দিতে পারেন এই গাছটা শুধু পার করে দেবে।'

হরিচরণ সঙ্গে গেল। কালীকিঙ্কর অক্ষয়বটের নীচ দিয়ে প্রায় চোখ বুজেই পেরিয়ে গেল। তার অবস্থা দেখে হরিচরণের হাসি পায়।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। চারদিক স্তব্ধ। নন্দীগাঁয়ের আকাশে রাত ঘনিয়ে এলো। অক্ষয়বটের পাতাগুলোও যেন স্তব্ধ হয়ে আছে।

দূরে চন্দনার বুকে উড্‌সায়েবের বাঁধা বোটে তখন নৈশবিকৃতির উল্লাস জেগে উঠেছে। মহিম আচার্যের অক্লান্ত চেষ্টায় কৈবর্ত পাড়ার মনোরমাকে পাওয়া গেছে। সদরের বড় সায়েব মহিম আচার্যের টিকিটি টেনে দিয়ে গালে মৃদু করাঘাত করে বললেন, 'That's like a good boy'.

'হুজুর মা-বাপ—এ আর এমন কি।' মহিম আচার্য সাহেবের কথার অর্থ না বুঝেই বলে ফেলল।

এ অন্যায়ের শুধু একটি ভাষাই আছে। সুদূর ইংলণ্ড থেকে নন্দীগাঁ পর্যন্ত তার এক রূপ—এক অর্থ।

সে রাত্রে কালীকিঙ্করের কথা উড্‌সায়েবের কানে গেল না।

পরদিন। ভোরবেলাতেই জমিদার বাড়ির সামনে বড় সায়েবের হুকুমে সরকারী পুলিশ এসে উপস্থিত। এরা সায়েবের সঙ্গেই এসেছিল।

হরিচরণ কালীপ্রসাদকে গিয়ে বলল, 'কর্তা, সরকারী পাইক এসেছে। তারা কেবলই বলছে আপনাকে ডেকে দিতে।'

'তেওয়ারী, ফরিদ—এরা কেউ খবর পায়নি?'

'আজ্ঞে, ভোরবেলা থেকে এসেই দাঁড়িয়ে রয়েছে—কোনোদিকে বেরুতে পাচ্ছিনে। ওদের জন্য দীঘিতে মেয়েরাও যেতে পাচ্ছে না। দীঘির দিকে মেয়েদের আসতে দেখলেই ওরা হাতছানি দিয়ে ডাকে।'

'আমার বন্দুকটা নিয়ে আয়—আর বড়মাকে ডেকে দিস্।'

হরিচরণ চলে যায়।

সর্বাণীর ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে—আজ নিশ্চয় একটা বিপদ ঘটবে। 'কি হবে!' সর্বাণী ভয়ে ভয়ে কালীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করে।

'কিসের?'

'এই যে ওরা এসেছে—'

এত উত্তেজনার মধ্যেও কালীপ্রসাদের হাসি পেল।

'দেখই-না, কি করি।'

'তুমি আবার কি করবে? না-না, তোমার কিছু করার দরকার নেই। তুমি যেও না—' সর্বাণীর দুচোখে জল।

সতী এসে পড়েছে।

কালীপ্রসাদ কোনো ভূমিকা না করেই সতীকে বলল, 'উড্ সায়েবের লোক এসেছে, বৌদি। হয়ত গোলমাল বাধাতে পারে। আমি দেখে আসি ওরা কি চায়।'

হরিচরণ বন্দুক আর টোটা এনে দিল।

সতী কি আর বলবে! দত্তবাড়ির মান-মর্যাদা খুইয়ে ত চলা যায়না। নিরপরাধ শ্বশুর-শাশুড়ীকে এরাই যে মেরে ফেলেছে!

বন্দুক হাতে কালীপ্রসাদ বেরিয়ে এল। বড় সায়েবের পাইকরা দাঁড়িয়ে আছে লাঠি হাতে।

কাছারি ঘরে এসে দাঁড়াল কালীপ্রসাদ। ওর হাতে বন্দুক দেখে সরকারী পাইকরা যেন একটু দমে গেছে। এমন সময় ফরিদ তার দলবল নিয়ে এসে পড়ল। কালীপ্রসাদকে দেখে ফরিদ বলল, 'হুজুর, আমাকে দিন—এক হাত খেলে নিই।'

কালীপ্রসাদ গম্ভীরভাবে সরকারী পাইকদের জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই তোমাদের ?'

ওদের ওপর হুকুম –কালীপ্রসাদকে বেঁধে নিয়ে যেতে। কিন্তু একটি বন্দুকের ভয়ে কেউ আর এগোতে সাহস করছে না।

ফরিদ সামনে এগিয়ে গিয়ে বলে, 'এক পা এগোবে ত মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।' ফরিদের দল আর নিজেদের সামলাতে পারল না। লাঠি নিয়ে তাড়া করল।

সেদিন ভোরবেলা নন্দীগাঁয়ের দীঘির পারে আবার রক্তের চিহ্ন আঁকা হল।

প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ অক্ষয়বট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখল—নন্দীগাঁয়ের মানুষ আজও বেঁচে আছে।

খুন চেপেছে সবার। ফরিদের দলের দুচারজন জখম হলেও বাকিরা ছুটল চন্দনার দিকে।

বেগতিক দেখে উড্ সায়েব বন্দুকে কয়েকটি ফাঁকা আওয়াজ করল। কিন্তু খুনের নেশায় পাগল ফরিদকে থামায় কে!

কালীপ্রসাদও বন্দুক নিয়ে এগিয়ে গেল সেদিকে।

উড্ সায়েবের আর বোট নিয়ে নোঙর করে থাকা হ'ল না। কৈবর্ত পাড়ার মনোরমাকে নিয়ে সায়েবের বোট চলল ইসলামাবাদের দিকে।

কালীকিঙ্কর বারবার বোটের মাঝিদের বলছে, 'আজই ফৌজ এনে এদের বুঝিয়ে দিতে হবে। একটু তাড়াতাড়ি বেয়ে যা।'

মহিম আচার্য কোথায় যে গা ঢাকা দিয়েছেন বোঝা গেল না।

উড্ সায়েবের বোট চন্দনার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে। ফরিদ ফিরে এলো। অক্ষয়বটের নীচে পড়ে আছে সায়েবের দুচার জন পাইক ; তারা আর পালাতে পারেনি।

নন্দীগাঁয়ের দত্তবাড়িতে গাঁয়ের মোড়লরা এসে বসল। কালীপ্রসাদ অস্থির হয়ে এদিক-ওদিক পাইচারি করছে। রজনী তহসিলদারও চোখ বুজে বসে আছে।

কালীপ্রসাদ তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'নায়েব মশায়কে দেখছি না যে।'

ঘোষবাড়িব রাধারমণ বলল, 'তাঁকে যেন পশ্চিম গাঁয়ের দিকে ছুটে যেতে দেখলাম। মহিম ঠাকুরও পেছন পেছন ছুটছেন।'

'আচার্যি মশায়ের পরিবাররা রয়েছেন না?' কালীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওঁরা সবাই আছেন।'

কালীপ্রসাদ চুপ করে বসে কি যেন ভাবল। পরে ফরিদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ না হ'ক কাল ওরা আসবেই। ঘরের মেয়েদের ইজ্জত বাঁচাতে হবে, ফরিদ।'

গাঁয়ের আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই তটস্থ হয়ে আছে। উড্ সায়েব যে অপমান বয়ে নিয়ে গেছে তার প্রতিশোধ সে নেবেই।

কালীপ্রসাদ সেদিনই সতী, সর্বাণী আর ছেলেমেয়েদের শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিল। সর্বাণী যেতে চায়নি। অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠে তার বুক। বারবার কালীপ্রসাদকে বলে, 'দিদি যাক ছেলেমেয়েদের নিয়ে, আমি থাকি।'

'না—ওরা মেয়েদের সম্মান রাখতে জানে না। তোমরা যাও, আমি পরে আসছি তোমাদের কাছে।'

চোদ্দজন কাহার আর হরিচরণ গেল তাদের সঙ্গে

নন্দীগাঁয়ের দত্তবাড়িতে কালীপ্রসাদ আজ একা। দু'চার জন যারা রয়েছে তারাও 'পালাই-পালাই' করছে। বুড়ো রজনী তহসিলদার কেবল লিখে চলেছে 'জমা নটবর বেরা—এক টাকা সাত আনা তিন পাই—সাং—রাজাপুর।'

কাঞ্চনপুরের লেঠেলরা এসেছে। ফরিদ আরও দু'দশ গাঁয়ের জোয়ান লেঠেলদের নিয়ে এসেছে।

ডাকাতে বিল গেছে শুকিয়ে—আজ তার বুকে হবে ভাগ্যের পরীক্ষা।

সেদিন আর কেউ এল না। ফরিদ দত্তবাড়িতে বসে আছে। চন্দনার ঘাটে লোক মোতায়েন রেখেছে। মাঝে মাঝে খবর দিয়ে যায়। কালীপ্রসাদ দোতলার বারান্দায় পায়চারি করছে। মাঝে মাঝে কি যেন সে কান পেতে শোনে।

আজ মনে পড়ে মা-বাবার কথা—দাদার কথা। মানুষ ঠিক যেভাবে চায় সেভাবে তার কাটে না। মানুষের এত আশা, এত স্বপ্ন মুহূর্তে যেন মিলিয়ে যায়।

নায়েব পালিয়েছে। কালীপ্রসাদ ভাবে, প্রাণের ভয় না আর কিছু? প্রায়ই নায়েব বলত—দিনকাল বদলে গেছে। কিন্তু আলীবর্দির আমল থেকে আজ একশো বছরের মধ্যে মানুষের দুঃখের কোনো বদল হয়নি ত? যে দুঃখ রাজীবলোচন থেকে শুরু সে দুঃখ কালীপ্রসাদে এসেও শেষ হয়নি।

একশ' বছরে নন্দীগাঁয়ে একশ'টি পরিবার বেড়েছে—একশ' বছরে একশ' জনের বেশী মানুষ মরেছে। একশ' বছরে রাজা বদলেছে—সমাজ বদলেছে। সবই হয়েছে—কিন্তু দুঃখ একই রয়ে গেল।

আজ দেবীপ্রসাদ কোথায়—তার খবর কেউ জানে না। দত্ত-

বাড়ির একটি অংশ যেন ধ্বসে পড়ছে। অনেক জমিদারের সঙ্গে লড়াই করে, মানুষ ঠেঙিয়ে নন্দীগাঁয়ের জমিদার দত্তরা টিঁকে ছিল। তারই মধ্যে আবার ঘুণ ধরছে।

দুদিন পর। কালীকিঙ্কর পথ দেখিয়ে আনল সিপাইদের। এবার কালীপ্রসাদ বুঝবে মহারানীর রাজত্বে অত বেশি ঘাড় উঁচু করে বাস করাব পরিণতি কি? কটা মাথা আছে তার ঘাড়ে! মহারানী দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করেন। তাই শিষ্ট কালীকিঙ্কর দুষ্ট কালীপ্রসাদকে দমন করতে এসেছে!

প্রায় একশ' বছর পর—নন্দীগাঁয়ের বুকে আবার ঝড় দিল দেখা। লড়াই বেঁধেছে উড্ সায়েবেব দলে আর ফরিদের দলে। এবার উড্সায়েবের সঙ্গে এসেছে ছোট সায়েব কেলী। সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে একদিক থেকে তেওয়ারী আর একদিক থেকে ফরিদ ঝাঁপিয়ে পড়ল সরকারী সিপাইদের ওপর। কালীকিঙ্কর কেলী সায়েবের পেছন পেছন আসছিল—হঠাৎ পথের উপর লেঠেলদের ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে 'আমি লাঠি নিয়ে আসি, হুজুব' বলেই ছুটল নৌকার দিকে। লড়াইতে তাকে আর দেখা যায় নি।

সেদিকেও সুবিধে নেই। দেবীর চরের কিষাণরা সায়েবের নৌকাগুলোয় যে দুচার জন পাহারাদার ছিল তাদের হাত পা বেঁধে নদীতে ফেলে দিয়ে জিনিসপত্র লুঠে নিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছে সব নৌকা।

উপায় নেই কালীকিঙ্করের—নদীর পার ধরে 'দুর্গা দুর্গা' বলে ছুটছে,—কোথায় ইস্লামাবাদ আর কোথায় নন্দীগাঁ। উল্‌টো পথ ধরে ছুটে চলেছে কালীকিঙ্কর। ছুটছে, ছুটছে, কেবলই ছুটছে।

এদিকে অন্ধকারে সিপাইরা বন্দুক ছুঁড়বার সুযোগ পাচ্ছেনা। কেলী সায়েব মাঝে মাঝে শব্দভেদী গুলি ছুঁড়ছে। কিন্তু তার বেশির ভাগ জখম করল নিজের দলের লোককে।

পিছু হটছে সরকারী সিপাই। মার ঠেকাতে ঠেকাতে চন্দনার দিকে হটছে। অন্ধকারে মাঝে মাঝে কেলী সাহেবের গলা শোনা যায়—'পিছু হঠো মৎ—হারামী কা জাত।' কিন্তু শোনে কে? 'চণ্ডীমায়ী কি জয়'! আর 'রে রে রে' চিৎকারে নন্দীগাঁয়ের দলের উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। অন্ধকারে আহতদের গোঙানির শব্দ—আর লাঠির ঠকাঠক শব্দ—মাঝে মাঝে ছুয়েকটা বন্দুকের শব্দ হচ্ছে। তখনও লাঠির দিন যায়নি।

হঠাৎ কালীপ্রসাদের গলা শোনা গেল—'সায়েবকে ছাড়িস না।' কিন্তু সে যাবেই বা কোথায়? নদীর পারে এসে যখন দেখল একখানা নৌকাও নেই তখন আর উপায় না দেখে সিপাইদের সামনে এগিয়ে এল তলোয়ার বাগিয়ে। ইংরেজের নাম ডোবাবে না সে। একা তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরতে নন্দীগাঁয়ের লেঠেলদের পিছু হঠিয়ে দিল। কিন্তু সামনে শক্র আর পেছনে বিরাট নদী—কতক্ষণ পারা যায়!

কেলী সায়েবকে ধবে ফেলল ফরিদের দল। সিপাইরাও নিরুপায় হয়ে বন্দুক লাঠি ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অনেক রক্তস্রোতের ওপর নন্দীগাঁয়ের জিৎ হ'ল। যারা ধরা দিল তাদের নিয়ে এলো বেঁধে। মৃত আর অর্ধমৃত যারা তারা পড়ে রইল মাঠের ওপর নিস্তব্ধ রাত্রির নিঃশব্দতার প্রতিবাদের মতো।

বন্দী কেলী সায়েব কালীপ্রসাদের সামনে দাঁড়িয়ে। বিন্দুমাত্র ভয় নেই তার মুখে। কালীপ্রসাদের মাথায় খুন চেপেছে। নীল সায়েব তার মা ও বাবাকে হত্যা করেছে। সিপাহী-বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে যাকে পেয়েছে তাকেই খুন করেছে সে। তারই জাতের আর একটি বর্বর এই কেলী।

দাঁতে দাঁত ঘষে কালীপ্রসাদ বলে, 'আমাঃ বলেছিল, 'মাদের হাতে খুন হয়েছে। তোমায় আমি—'ব।'

কেলীর লাল মুখখানা আরও লাল করে বলল, 'ইহার প্রতিফল পাইবে, You infernal bitch !'

'চোপরও শয়তান, ফরিদ ওর হাত খুলে দে'—ছোড়া হাতে দাঁড়িয়ে আছে কালীপ্রসাদ।

হাত খুলে দিতেই কেলী ধরতে গেল কালীপ্রসাদকে—কিন্তু তার আগেই কালীপ্রসাদ ছোড়া বসিয়ে দিল তার বুকে।

'Oh Lord, I am murdered' বলেই পড়ে গেল কেলী। সুদূর ইংলণ্ডের একটি মানুষ নন্দীগাঁয়ের মাটিতে পড়ে আছে। কেউ কি আর খবব জানে !

ইংলণ্ড থেকে নন্দীগাঁ কতদূর !

এতদিন পর কুসুম ও রাজেন্দ্রনারায়ণের হত্যার প্রতিশোধ নিল কালীপ্রসাদ।

থমথমে রাত। আজকের রাত যেন নন্দীগাঁয়ের বুকে শতাব্দীর অভিশাপকে বহন করে নিয়ে আসছে। অক্ষয়বট স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটি শতাব্দীর সুখ দুঃখের ইতিহাসের বোঝা নীরবে মাথায় তুলে নিয়ে চিরজাগ্রত প্রহরীর মতো দত্ত-দীঘির পাড়ে দণ্ডায়মান। দুর্যোগের এখনও শেষ হয়নি—সবে শুরু মাত্র। রাজীবলোচন থেকে যার শুরু—তার শেষ কোথায় ?

গ্রামবৃদ্ধরা সবাই দত্তবাড়ির নাটমন্দিরে এসে বসেছেন। লড়াইর এক পর্ব ত শেষ হ'ল। এখন কি করা যায় ?

নন্দরাম চৌধুরী বললেন, 'আমার মনে হয় বাবাজীর এখন একটু সরে থাকাই ভালো। এই জাতকে ত বিশ্বাস নেই ! হয়ত দেখবে কালই হয়েছে।'

ওরা 'আমাদের নায়েব আর আচার্য মশায়

আর ঐ ব্যাটা কালীকিঙ্কর নির্ঘাত একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করবে।'

'তা হলে আমরা রইছি ক্যান!' ফরিদ বুক চিতিয়ে বলে।

শ্রীনিবাস মাথা পেতে বলল, 'আর সেদিন নেই রে, ফরিদ। কোম্পানি গেলেও সায়েবরা রয়েছে। তাদের কতো বন্দুক, কামান—লাঠির দিন আর নেই রে, ফরিদ—লাঠির দিন আর নেই। সে দিন ছিল তোর বাপের আমলে।'

'মিছে কথা, হাজরা মশাই, আপনি দেখেন না ক্যান, কি করি। গাঁ-ভরা মানুষ কি মরে গেছে?' ফরিদের রক্ত টগবগ করে ওঠে।

রজনী-তহসিলদার আজিজের হাতে কলকেটা দিয়ে কাশতে কাশতে বলল, 'একটা রফা করলে হ'ত না?

'সাপের মুখেও চুমু আর বাঘের মুখেও চুমু—এ সম্ভব নয় তহসিলদার মশায়,' বলেই আজিজ কল্‌কেতে শেষ টান দিয়ে ফরিদের দিকে এগিয়ে দিল।

'তুমি ঠিক বলেছ, আজিজ, এতখানি এগিয়ে এসে এখন আর পেছুনো চলবেনা, ওদের বিষদাঁত ভাঙতে হবে।' রামমনি সিং বলে উঠল।

ওদিকে অন্ধকারে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে কালীপ্রসাদ। ভাবছে নন্দীগাঁয়ের এ দুর্যোগ থামবে কবে? সমস্ত গ্রামটা যেন থমথমে হয়ে গেছে। দু'তিন পুরুষে আজ এই গাঁয়ে প্রায় দেড়শো ঘর হিন্দুমুসলমানের বাস। এরা কি নিশ্চিন্তে একদিনও থাকতে পারবেনা?

সমস্ত দত্তবাড়িখানা এক বিরাট শূন্যতা বক্ষে নিয়ে যেন নিস্তব্ধ রাত্রির নির্জন কোণে বসে চোখের জল ফেলছে। কালীপ্রসাদ একা—বাড়ির মেয়েরা সবাই চলে গেছে। সর্বাণী যাবার সময় চোখের জল ফেলেছিল। সতী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, 'ছি, কাঁদিসনে বোন, ঠাকুরপোর অকল্যাণ হবে।'

তবুও কি চোখের জল বাধা মানে। সর্বাণীর মুখখানা কালীপ্রসাদের চোখের সামনে ভাসছে। যাবার সময় কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল সর্বাণী। যাবার আগে বাড়ির প্রতিটি তুচ্ছ জিনিসের জন্য তার কি মমতা! পাল্কীতে ওঠার আগে কালীপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কবে আসবে?'

'তুমি কিছু ভেবনা। গোলমাল থামলেই আমি তোমাদের নিয়ে আসব।' কালীপ্রসাদ তাকে সাহস দিয়ে বলেছিল।

তবুও তার যেন কি একটা ভয়। অক্ষয়বটের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতে গিয়ে সর্বাণী যেন আর উঠতে চায়না।

রাত আরও গভীর হ'ল। বাইরে কাছারি ঘরে শ্রীনিবাস, ফরিদ ওদের কথা শোনা যাচ্ছে। পাইক বরকন্দাজরা সবাই তৈরি আছে। কালীপ্রসাদ অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাল। মেঘে ঢাকা আকাশে একটিও তারা দেখা যায় না। দূরে অক্ষয়বটের দিকে চোখ পড়ল। আকাশের মেঘে, পাতায় আর ডালে মিশে একটা অদ্ভুত ভয়াল রূপ ধারণ করেছে। কি অজানা আশঙ্কায় সেও যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দত্তদীঘির পাড়ে অটল অচল স্থির দণ্ডায়মান প্রহরীর মতো ঐ অক্ষয়বট।

কালীপ্রসাদ ইচ্ছে করলে এখান থেকে চলে যেতে পারে। হয়ত তাকে আর উড সায়েবের লোক খুঁজেও পাবেনা। কিন্তু সে কি করে যাবে? পিতৃপুরুষের ভদ্রাসন—প্রজাদের ভালো মন্দ—সব দায়িত্বই যে তার।

সতী, সর্বাণী আর ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিতে হল। ওদের বাঁচাতে হবে। দাদার কথা মনে পড়ে কালীপ্রসাদের। কোথায় সে?

অন্ধকারে কে একজন ছুটে এল। কালীপ্রসাদ চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করল, 'কে রে?'

'হুজুর, আমি আবদুল। সায়েবের ডিঙি আসছে—এক আধখানা নয়—আট দশখানা ত হবেই।'

রজনী-তহসিলদার হুঁকোটা রেখে বলল, 'কি হবে এবার ?'

কালীপ্রসাদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'যা হবার হবে, তহসিলদার কাকা—যেমন করে হোক ওদের ঠেকাতে হবে।'

'লড়াই জিতে ওরা দেশের রাজা হয়েছে—আমরা পারবো তাদের ঠেকাতে ?'

'দেখা যাক। ফরিদ, আজিজ তোরা তৈরি হয়ে নে। আপনাকে এখান থেকে যেতে হবে, কাকা।'

'তোমাকে একা ফেলে ?'

রজনী-তহসিলদারকে কথা শেষ করতে না দিয়েই কালীপ্রসাদ বলল, 'আমার জন্য ভাববেন না। নন্দীগাঁয়ের দত্তরা মরতে মরতেও বাঁচবে। তবুও বাড়ির ওরা সবাই আছে। নায়েব মশায় পালিয়েছেন। বাবার আমলের শুধু আপনিই আছেন। আর কারও ওপর ভরসা করতে পারিনে, আপনি আজই যান।'

লেঠেলরা সব চন্দনার দিকে ছুটছে। রজনী-তহসিলদারকে যেতে হবে শ্রীপুরের দিকে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর আজ নন্দীগাঁ ছেড়ে যেতে হচ্ছে তার। বহু দিনের একটি পরিচয়ের করুণ ইতিহাসের পাতা যেন নন্দীগাঁয়ের ইতিহাস থেকে মুছে যাচ্ছে। বৃদ্ধ তহসিলদার কালীপ্রসাদের হাত ধরে বলল, 'যাচ্ছি বাবা—ঠাকুর তোমার ভালো করুন। এভাবে যেতে হবে কখনও ভাবিনি। তোমরা ছাড়া কেউ নেই আমার। ভেবেছিলাম জীবনের শেষ কটা দিন তোমাদের নিয়েই কাটাব। অত সুখ কপালে নেই।'

কালীপ্রসাদের চোখে জল এসে পড়ে। ছেলেবেলা থেকে এই লোকটিকে দেখে আসছে।

বৃদ্ধ-তহসিলদার শ্রীপুরের দিকে যাত্রা করল। অক্ষয়বটের

সামনে এসে প্রণাম করে সে আকুল প্রার্থনা জানায়, 'ঠাকুর, কালীকে রক্ষা কোরো—আমি চললাম।'

অক্ষয়বটের কোনো প্রশাখায় কি বৃদ্ধের করুণ আবেদন সাড়া জাগিয়েছিল ?

গভীর রাত। নন্দীগাঁয়ের বুকে—চন্দনার বুকে একই অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। রাতের কালো পাহাড়ের মতো নিথর, নিস্পন্দ অক্ষয়বট মৌন আশঙ্কায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

সবাই ছুটে চলেছে চন্দনার দিকে। কালীপ্রসাদও গেল তার বন্দুক নিয়ে। আজ ভাগ্যের চরম পরীক্ষা হবে।

সরকারী দল এসে পড়েছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই তারা পারে উঠবে। কালীকিঙ্করের গলা শোনা যাচ্ছে, 'ওরে এবার নেমে পড়। সিপাইরা বন্দুক নিয়ে একে একে নৌকা থেকে নামছে। কে যেন একটু জোরেই বলে উঠল, 'বাঁয়ে ঘুরে গেলেই একেবারে দত্তবাড়ির সামনে গিয়ে পড়বে।'

মহিম আচার্যের গলা শোনা গেল না? ফরিদ মাটিতে থুতু ছিটিয়ে বলে, 'বেইমান!'

চুপ করে আড়ালে লুকিয়ে আছে নন্দীগাঁয়ের দল। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সিপাইদের ওপর।

সবার শেষে উড সায়েব, ইন্সপেক্টর বুথ, কালীকিঙ্কর আর মহিম আচার্য নৌকা থেকে নামল। মহিম আচার্য পেছন পেছন আসছে দেখে কালীকিঙ্কর মুচকি হেসে বলে, 'ভয় কি আচার্যি মশায়, আমরা ত চুরি করতে যাচ্ছিনা—আর ওঁরাও তো রয়েছেন।'

'আজ্ঞে না—ভয় কি, আপনি ত আছেন। তবে কিনা গাঁয়ের লোকরা পুরানো মানুষ—সবাই আমাকে চেনে। আর ঐ যে ফরিদ ব্যাটা—ওর মাথাটা একটু গরম কিনা—দেখতে পেলে হয়ত—'

কথা শেষ হ'ল না মহিম আচার্যের। নন্দীগাঁয়ের দল ঝাঁপিয়ে পড়েছে উড সায়েবের দলের ওপর। মহিম আচার্য অন্ধকারে ঠাউর করতে না পেরে জলে পড়ে গেল।

চন্দনার পাড়ে লড়াই চলেছে। অন্ধকার রাত—মানুষের রক্তে যেন করালবদনা হয়ে উঠল। লাঠির শব্দ, বন্দুকের গুলির শব্দ নৈশ অন্ধকারকে যেন আরো ভীষণ করে তুলল। আজ উড সায়েবের দলকে ফরিদের এঁটে ওঠা সম্ভব হ'লনা। বন্দুকের কাছে লাঠির হার মানতে হ'ল। কালীপ্রসাদ দূরে থেকে গুলি চালাচ্ছিল। কিন্তু আর বেশিক্ষণ সম্ভব হ'লনা। গুলি ফুরিয়ে গেছে। কালীপ্রসাদ বাড়ি ফিরে এসে ঘোড়ায় করে বেরিয়ে পড়ল। এদের হাতে ধরা দিয়ে কুকুরের মতো মরবেনা সে। রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল। মুহূর্তের জন্য অক্ষয়বটের কাছে এসে প্রণাম করে বলল, 'চললাম—যদি ফিরে আসি ত আবার দেখা হবে। তোমার হাতে সব রইল।'

নিথর নিস্পন্দ অক্ষয়বট—অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে যেন নন্দীগাঁয়ের করুণ ইতিকথা রচনা করে চলেছে। দত্তবাড়িতে কেউ নেই—অক্ষয়বট শুধু একা তার প্রহরী—তার অভিভাবক। তিন পুরুষের সুখ-দুঃখের ইতিহাস তার পাতায় পাতায়:

চন্দনার পাড়ে লড়াই থেমেছে—বহু খুন-জখমের শেষে। ফরিদের দল জান দিয়েছে তবু মান খোয়ায়নি। সরকারী সিপাইরাও জখম হয়েছে কিন্তু ক্ষতি হয়েছে বেশি নন্দীগাঁয়ের।

সিপাইরা মশাল হাতে ছুটল গাঁয়ের দিকে। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল মহিম আচার্য। জল থেকে তাকে তুলেছে সিপাইরা। মাঝে মাঝে করুণভাবে কালীকিঙ্করকে সে বলে, 'দেখবেন আমার বাড়িটা যেন—'

'ও ঠিক আছে—'বেশ মুরব্বীআনার সুরে বলে কালীকিঙ্কর।

'তা নয়, ঘরে সোমত্ত মেয়ে'—চাপা স্বরে বলে মহিম আচার্য। কালীকিঙ্করের মুখে কথা নেই।

অন্ধকারে তার মুখের চাপাহাসি ঢাকা পড়ে গেল।

দত্তবাড়ির সামনে এসে স্মিথ হুকুম দিল, 'আগ্ লাগাও।' সায়েবের হুকুম—সঙ্গে সঙ্গে দশ পনেরো জন সিপাই মশাল নিয়ে ছুটে গেল। সামনের উঠোনে একটা কুকুর শুয়েছিল—অচেনা মানুষ দেখে একবার ঘেউ ঘেউ করে উঠে সরে গেল।

কালীকিঙ্কর খুশি চাপতে না পেরে মহিম আচার্যকে বলে, 'সেদিন বলেছিলাম, আখেরে ভালো হবে না। তার ওপর কেলি সাহেবকে খুন করা—'

'পাপ—পাপ ঢুকেছে—ঘোর কলি—' মহিম আচার্য চোখ তুলে বলে।

'এবার ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হবে—'

কালীকিঙ্করের কথায় মহিম আচার্যের বুক কেঁপে উঠল।

রাত ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। জমিদারবাড়ি পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। গাঁয়ের লোক হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সেই লাল আলোর দিকে। কারও মুখে একটি কথাও নেই।

অক্ষয়বটের ডালপালাগুলোও আগুনের আভায় লাল হয়ে উঠেছে। যেন রুদ্রের তৃতীয় নয়নের বহ্নি এখনই সব পুড়িয়ে শেষ করবে। একদিকে করুণায় ভরা তার গাম্ভীর্য—অন্যদিকে কি কঠোর, কি ভীষণ ভয়াল তার রূপ—তীব্র তিরস্কারের আভাস তার মাঝে।

কালীকিঙ্কর অক্ষয়বটের দিকে তাকিয়েই ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। প্রথমদিন থেকেই তার মনে একটা ভয়। মনে মনে ঠিক করল—সায়েবকে বলে এই গাছটা কাটাতে হবে।

চারদিকে সিপাইদের চিৎকার। মহিম আচার্য ভাবছে, দত্ত-বাড়ির সবাই গেল কোথায়! কালীকিঙ্করের অনুমতি নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই নজর পড়ল অক্ষয়বটের দিকে। আর এগোতে পারে না সে। ঐ গাছতলা দিয়েই তাকে যেতে হবে। ফিরে এসে কালীকিঙ্করকে বলে, 'একটু এগিয়ে দেবার কাউকে পাওয়া যায় না—এমনিতে সবাই ক্ষেপে আছে, আবার কে কখন এক ঘা বসিয়ে দেয়।'

'সরকারী সিপাই কারো গোলাম নয়—কেউ যেতে পারবেনা।' কালীকিঙ্করের কথায় মহিম আচার্য চুপসে গেল। হায়রে, যাদের জন্য এত করা তারাই আজ সুর বদলায়।

এক পা এক পা ক'রে বাড়ির দিকে চলল মহিম আচার্য। পূব আকাশে আসন্ন প্রভাতের রক্তিম আভাস। মরিয়া হয়ে 'অক্ষয় বটের থান' পেরিয়ে গেল। কান্না পাচ্ছিল তার। মুখ তুলে তাকাতে পারেনি ওই প্রাচীন প্রহরীর দিকে।

গাঁয়ের লোকেরা আচার্য ঠাকুরকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। কারও দিকে তাকাবার সাহস নেই তার। আজকের দুর্যোগের জন্য সেও যে অনেকখানি দায়ী একথা সে যেমন জানে, নন্দীগাঁয়ের সবাইও জানে।

বাড়ী পৌঁছে বসে পড়ল দাওয়ায়—ভিজে কাপড় ছাড়ার কথা মনেও নেই তার। মহিম-গিন্নিরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে 'এদ্দিন কোথায় ছিলে গো' বলে কান্না জুড়ে দিল।

'চেঁচাসনি পোড়ারমুখীরা—এক্ষুণি সিপাইরা এসে সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে।'

'ওমা সেকি কথা—আমাদের ধরবে কেন—' বড় গিন্নী চোখ ছানাবড়া করে বলে।

'ওরা সব পারে—যা, এখন যা—ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে

থাক্।’ আচার্য ঠাকুর কি করবে ভেবে পায়না। গাঁয়ের কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। ব্যাপার কি?

চণ্ডে পাগলা সকাল বেলা গান গাইতে গাইতে চলেছে—

ওরে সুবল ভাই—
রাত পোহাইল চল গোঠে যাই।

নন্দীগাঁয়ের দুর্যোগে তার খ্যাপা মনে কোনো আঁচড় কাটেনি। আচার্য বাড়ির সামনে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। মহিম আচার্য একবার তার দিকে তাকিয়েই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল।

হঠাৎ হো হো করে হেসে চণ্ডে পাগলা শুধোয়, ‘দাঠাকুর, কখন এলে?’

‘যা-যা, এখন বিরক্ত করিসনে—সকাল বেলা এলেন আমায় উদ্ধার করতে।’ মারমুখো হয়ে উঠল মহিম।

চণ্ডের কানে গেল না সে কথা। সে বলেই চলল, ‘ঠানদিদের কোথাও পাঠিয়ে দাও—নয়ত—হ্যাঁ সায়েবরা—গাঁয়ের মেয়ে মানুষ সবাই কেটে পড়েছে।’

সর্বনাশ! মহিম আচার্যের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। উড সায়েব, স্মিথ সায়েব, কালীকিঙ্কর, সিপাইরা! এদের হাতে আর রক্ষে নেই।

সিপাইরা লুঠতরাজ করে বেড়াচ্ছে। দূর থেকে তাদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। মুসলমান পাড়ায় আগুন ধরিয়েছে। ওদের ওপর সায়েবের রাগ বেশি। ফরিদ-আজিজের দলকে ভোলেনি তারা। মাঝে মাঝে ‘ইয়া আল্লা’ চিৎকারও শোনা যাচ্ছে।

সিপাইরা বামুন পাড়ার দিকে এগিয়ে আসছে না!

ওই যে বড় সায়েব আর কালীকিঙ্করও আসছে। ঠাকুর দেবতার নাম মনে পড়ছে না মহিম আচার্যের।

তার বাড়ির সামনে এসে সবাই থামল। কালীকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করে, ‘সবাই গাঁ ছেড়ে পালালো কোথায়?’

'তা ত জানি না, কর্তা—' অপরাধীর মতো হাত জোড় ক'রে বলে মহিম আচার্য।

'সায়েব তোমাকে ডাকছে। এবার তোমার বরাত ফিরে গেল, ঠাকুর', কালীকিঙ্কর একগাল হেসে বলে।

বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে যায় হতভাগা ব্রাহ্মণ।

উড সায়েব তার টিকি নেড়ে পিঠ চাপড়ে বলে, 'কি বেবসৃটা হোবে।'

'হুজুর'—আর কিছু বলতে পারে না সে।

'এ ঘর কার আছে?'

'আমার—হুজুর।'

কালীকিঙ্কর সাহেবকে কি যেন ইসারা ক'রে বলে।

সাহেব মুচকি হেসে মহিম আচার্যকে বলে 'টোমার উপব ভার ঠাকে—আজ রাটে বোটে হাজির হোবে—লেকিন শূন্য হাটে নয়। বকশিষ মিলবে।'

'আর কি ঠাকুর—এমন সুযোগ আর পাবে না!' কালীকিঙ্কর গদগদকণ্ঠে বলে।

'হুজুর, গাঁয়ে যে কেউ নেই।'

'সে হামি জানে না—না হ'লে হামি সিপাইকে হুকুম ডেবে।'

সায়েবের দল চলে গেল।

কার কাছে যাবে মহিম আচার্য। মুখ দেখাবার জো নেই কারো কাছে। ভগবানকে ডাকতেও সঙ্কোচ হয়।

নন্দীগাঁয়ের বুকে আর একটি সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। দত্তবাড়ি একশ বছর পর আবার শ্মশানে পরিণত হয়েছে। মুসলমান পাড়া পুড়ে শেষ হয়েছে। সমস্ত গ্রামখানা যেন নীরবে চোখের জল মোছে।

সিপাইরা এসেছে মহিম আচার্যের বাড়িতে। পাগলের মতো

সবার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে সে। 'হুজুর, আপনারা মা-বাপ। আমাকে রেহাই দিন।'

এ কান্নার কোনো মূল্য নেই। পাপের মাশুল এমনি করেই বুঝি দিতে হয়।

সিপাইরা আচার্য ঠাকুরের মেয়ে গিন্নি সবাইকেই নিয়ে গেল। মহিমের কান্না রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেল। কেউ এলো না তাকে সান্ত্বনা দিতে। কেউ ফিরেও তাকাল না।

এ রাতের শেষে আবার নতুন দিন আসবে নতুন আলো, নতুন আশা নিয়ে। আজ রাতে তাই বুঝি অক্ষয়বটের ডালে ডালে দোলা দিয়ে যায় অচেনা কোন হাওয়া।

এ পৃথিবীতে আহুতিরও শেষ নেই—আকুতিরও শেষ নেই।

নন্দীগাঁয়ের বুকে নামলো আঁধার।

আলোর আর কতো দেরি—তার সংবাদ অক্ষয়বটের পাতায় পাতায় লেখা আছে নইলে সে অমন নির্বিকার থাকে কি করে!

॥ ছয় ॥

নন্দীগাঁয়ের লোক এমনিতেই রেহাই পেল না। উড সায়েবের অত্যাচার বেড়েই চলল। কালীপ্রসাদের খবর কেউ দিতে না পারাতে সায়েব আরও ক্ষেপে গেল। সুলতানপুরের পাঁচকড়ি রায় দেখল এই সুযোগ। বাপের অপমানের প্রতিশোধ নেবার এই ত উপযুক্ত সময়।

ইংরেজ রাজত্ব—সারা দেশের মালিক ইংরেজ। পাঁচকড়ি রায় উড সায়েবের শরণাপন্ন হল। হাত জোড় করে সে বলে, 'হুজুর, এই বান্দা নন্দীগাঁয়ের বদ্‌মায়েসদের সায়েস্তা করবে। আপনি গাঁখানা আমায় ইজারা দিন। আমি হুজুরের কাছে উশুল আদায় সময় মতো হাজির করে দেব।'

কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হয়। উড সায়েব তা বিলক্ষণ জানে। নন্দীগাঁয়ের জমিদার হ'ল পাঁচকড়ি রায়। কালীকিঙ্করের আশা ছিল সেই হবে নন্দীগাঁয়ের জমিদার। কিন্তু সুলতানপুরের পাঁচকড়ি—উড আর কালীকিঙ্কর দুজনকেই উজাড় করে টাকা দিয়ে হাত করেছে। কালীকিঙ্কর বেশ-কিছু কাঁচা পয়সা হাতে নিয়ে তবে চুপ করেছে।

হীরামহল আর নন্দীগাঁয়ের মালিক পাঁচকড়ি রায়। হীরামহলে বসেই সে সব ব্যবস্থা করল। একদিন নীলরতন রায়ও নন্দীগাঁয়ের ইজারা নিয়েছিল। সেদিন রাজেন্দ্রনারায়ণ লাঠির দাপটে নন্দীগাঁয়ের মান রেখেছিলেন। আজ আবার সুলতানপুরের হাতে চলে গেল নন্দীগাঁ।

হীরা তার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, 'নন্দীগাঁ আমার নামে লিখে দাও, তবেই বুঝব তুমি আমায় কেমন ভালোবাসো !'

পাঁচকড়ি গোঁফে তা দিয়ে বলে, 'এ সবই ত তোমার জন্য—'

'বেশ ত—আমার নামেই লিখে দাও,' হীরা আবদার ধরে।

'সায়েবের কাছ থেকে ইজারা নিয়েই তোমার নামে লিখে দেব।' পাঁচকড়ি মদ ঢেলে নিতে যেতেই হীরা তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল, 'আমি রয়েছি কেন ?'

একেবারে গলে পড়ে পাঁচকড়ি রায়।

রূপনারায়ণ বড়ো হয়েছে। মাকেই চেনে। বাপকে তার মনেই পড়ে না। কিন্তু মাও ত সব সময় কাছে থাকতে দেয় না। হীরা-মহলের সবাইকে তার কেমন অদ্ভুত লাগে এক ভোজপুরী দারোয়ানকে ছাড়া। দারোয়ান বেহারী সিং। বড় ফোঁটা কেটে ফটকের সামনে বসে রামায়ণ পড়ে। রূপনারায়ণ অবাক হয়ে শোনে। সব কথা সে বোঝেও না—তবু বেহারীর সুর করে পড়া তাকে মুগ্ধ করে। এরই ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে শুনতে পায় হীরা মহলের ভেতর থেকে ভেসে আসা গান—অশ্লীল জীবনের অট্ট-হাসি। চমকে ওঠে সে।

বেহারী তাকে রঘুজী-হনুমানজীর গল্প বলে। রূপনারায়ণ বলে, 'ল্যাজে আগুন ধরিয়ে হনুমান যে লঙ্কা পোড়ালো সেটা আবার বল।' কপালে দুহাত ঠেকিয়ে বেহারী শুরু করে লঙ্কাকাণ্ডের কাহিনী।

মাঝে মাঝে হীরা কাছে যায়। পাঁচকড়ি না থাকলে তাকে কোলে নিয়ে আদর করে হীরা। রূপনারায়ণ একদিন হীরাকে ধরে বসল, 'আমার বাবা কোথায়, মা !'

হীরা কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। রূপনারায়ণের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে বলে, 'তোমার বাবা অনেক দূরে থাকে। মাঝে মাঝে আসে। তখন তুমি ঘুমিয়ে থাকো কিনা, তাই দেখতে পাও না। এবার এলে তোমায় জাগিয়ে তুলে দেখাবো।'

আর কি বলবে সে। হঠাৎ মনে পড়ে দেবীপ্রসাদকে, কিন্তু সে শুধু ক্ষণিকের জন্য। এ জীবনে সে মনে পড়ার দাম কতটুকু। জলের ওপর দাগ কাটা যায় না—হীরা তা জীবন দিয়ে জানে।

শিশুকে ভোলানো সহজ—কিন্তু তারপর? অতো ভাবতে পারে না হীরা। তার জন্য কোনো বেহেস্তের দরজা খোলা আছে কি? সরাব—শুধু সরাব—আর কিছু নয়।

ভাবনার এখনও অনেক দেরি।

নন্দীগাঁ ছেড়ে কালীপ্রসাদ রাতের আঁধারে চলে গেল। পিছন ফিরে তাকাবার অবকাশ সেদিন নেই। ইংরেজের হাতে ধরা দেবে না সে।

পথ যেন আর ফুরোয় না। সতী, সর্বাণী সবার কথা মনে পড়ে। কখন যে আর তাদের সঙ্গে দেখা হবে তাও সে জানে না। একের দুর্জয় লিপ্সা আর একজনকে দাঁড় করায় পথে।

কনকপুরে এসে পৌঁছুল কালীপ্রসাদ। এখান থেকে নন্দীগাঁ-শ্রীপুর অনেক দূর। গ্রামের পাশ দিয়ে খরস্রোতা শঙ্খিনী নদী বয়ে চলেছে। এপারে কনকপুর, ওপারে পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা দেশ। কনকপুরের অধিবাসী প্রায় সবাই মুসলমান। কয়েকঘর দরিদ্র হিন্দু আছে। এখনকাব জমিদার মুসলমান—নাম তাঁর আমীর খান। ইনি জাতিতে পাঠান। কয়েকঘর শেরওয়ানীরাও আছে। এখানকার মুসলমানরা মোগল আমলের আগেই এখানে এসেছিল। কয়েকঘর দেশী মুসলমানও আছে। এরা আগে ছিল হিন্দু। ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে তারা মুসলমান হয়। এরা পাহাড়ীদের সঙ্গে বংশপরম্পরা লড়াই করে এই গাঁয়ে বাস করছে। কে যে এ গাঁয়ের নাম কনকপুর রেখেছিল কেউ জানে না। হিন্দু-মুসলমান কেউ আর গাঁয়ের নাম নিয়ে মাথায় ঘামায় না। মুসলমানদের পরবে হিন্দুরাও

যোগ দেয়, আবার শ্রাবণ মাসে মনসা পূজোয় মুসলমানরাও প্রতি রাতে বাইশ কবির মনসা-ভাসান ভক্তিভরে শোনে।

অচেনা মানুষ দেখে গাঁয়ের লোকেরা কালীপ্রসাদের চারদিকে ভিড় করে দাঁড়াল। ক্লান্ত কালীপ্রসাদ ঘোড়া থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করল, 'এ গাঁয়ের মোড়ল কে?'

কালীপ্রসাদের কথা এদের কাছে নতুন ঠেকে। কালীপ্রসাদও বুঝল, তাই আবার সে বলে, 'এখানে মাতব্বর কে আছেন?'

গাঁয়ের পীর মহম্মদ এগিয়ে এসে বলে, 'খান সাহেবের কাছে চলুন। তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করিয়ে দিচ্ছি।'

কালীপ্রসাদের কাছে আমীর খান সব শুনলেন। দুশমন গোরাদের তিনিও মনে প্রাণে ঘৃণা করেন। কিন্তু তাদের রাজ্যে বসে তাদেরই বিরুদ্ধে লড়াই করা—এও এক অসম্ভব ব্যাপার। মুসলমানরা এদেরই হাতে রাজ্য হারিয়েছে। দু'চারটি বেইমান হিন্দু-মুসলমান এদের ডেকে এনে নিজের দেশ তুলে দিল তাদেরই হাতে।

"আপনি এখানে কদিন থাকুন। তবে এক জায়গায় বেশি দিন থাকাও নিরাপদ নয়! আমাদের ওপরও ওদের চোখ আছে। কিন্তু আপনার কি ব্যবস্থা করি বলুন ত! আমি মুসলমান।' আমার খান একটু চিন্তিত হয়েই বললেন।

'আমি নিজে সব করে নিতে পারবো। আমার ঘোড়ার দানা-পানির একটা ব্যবস্থা করে দিন।'

আমীর খান যথারীতি ব্যবস্থা করে দিলেন। কালীপ্রসাদ দু'চারটি ফল খেয়েই রইল। একটি গাঁয়ের দায়িত্ব তাঁর ওপর। এখানে বেশিদিন থাকাও চলবে না। অসহায়, নিরাশ্রয় কালীপ্রসাদের সেদিন একটা বিরাট লাভ হ'ল। আমীর খানের সম্পূর্ণ পরিচয়ই পেল। এ পরিচয় মানুষের পরিচয়।

ওদিকে উড সায়েবের লোক কালীপ্রসাদ আর তার পরিবারের

সবাইকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওকে পেলে সায়েব ফাঁসি কাঠে ঝোলাবে —এই তার প্রতিজ্ঞা। কেলির মৃত্যু সে ভোলেনি। ইংরেজও প্রতিশোধ নিতে জানে। দত্তবাড়ির মেয়েরাই বা গেল কোথায়!

নবীন বসু জানেন নন্দীগাঁয়ের লড়াইর পর তাঁরও আর রক্ষে নেই। মেয়েরাও তাঁর কাছে রয়েছে। উড সায়েবের প্রতিহিংসার আগুন এখানেও জ্বলে উঠবে। দরিদ্র মানুষ—দত্তদের মতো লড়াই করার ক্ষমতাও নেই তাঁর। বৃদ্ধ বয়সে কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারেন না তিনি। ইংরেজ রাজত্ব—তাদের হাতেই দেশের বিধি-বিধানের দায়িত্ব। প্রতিটি দিন তাঁর উৎকণ্ঠায় কাটে।

সর্বাণী একেবারে ভেঙে পড়েছে। কালীপ্রসাদের কোনো খবর নেই। বিয়ের পর দুটি বোনই আর শান্তি পেল না। দুঃখের তীব্রতা সতীকে ক'রে তুলেছে পাষাণ আর সর্বাণীকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। নারীর জীবন সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে তাকে তবুও বেঁচে থাকতে হয়। কালীপ্রসাদের দুটি ছেলে—রুদ্রনারায়ণ ও দর্পনারায়ণ আর মেয়ে নীরজা। এদের নিয়েই সর্বাণী রয়েছে অধীর প্রতীক্ষায়। মায়ের চেয়ে মাসীকেই বেশি ভালোবাসে প্রতাপ। তাই সর্বাণীর সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। সতীর করুণ মুখে কেবলই যেন কান্না ছাপিয়ে ওঠে। কোথাও যেন একটু হাসির আভাসও নেই।

প্রতিদিন কতো না কাহিনী শুনেছে সতী আর সর্বাণী। অভিশপ্ত দত্তপরিবারের দীর্ঘ করুণ ইতিহাস। নন্দীগাঁয়ে আসা অবধি এদের জীবনে শান্তি কখনও পায়নি—পায়নি একটুকু আনন্দের অবসর। হাসির আভাস দেখা দিয়েও চকিতে মিলিয়ে গেছে। অভাব অনটন না থাকলেও জীবনের আর সব কিছুরই যে অভাব রয়ে গেল। রাজীবলোচনের কোনো চিহ্ন রইল না কোথাও। রাজেন্দ্রনারায়ণ ইংরেজের গুলিতে নিহত। কালীপ্রসাদও আজ সেই ইংরেজের খেয়াল মেটাতে গিয়ে হারালো তার সব কিছু।

আর দেবীপ্রসাদ! পাপের নির্মম আঘাত তাকে করেছে ঘর-ছাড়া।

সতী সর্বাণী আর ভাবতে পারে না। বৃদ্ধ পিতাও একেবারে ভেঙে পড়েছেন। অভাব দারিদ্র্য জীবনে দুঃখ আনে বটে—কিন্তু অত্যাচার,. লাঞ্ছনা—বিশেষ করে মাতৃহীন মেয়েদের সম্মান বাঁচানো—এই বিদেশী রাজশক্তির অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর কণ্ঠও যে তাঁর বড়ো ক্ষীণ—বড়ো দুর্বল।

নন্দীগাঁয়ের আকাশে যে মেঘ দেখা দিয়েছে শ্রীপুরের আকাশকেও যেন তা ছেয়ে ফেলে।

রজনী-তহসিলদার রয়েছে শ্রীপুরে। নন্দীগাঁয়ের শেষ চিহ্ন। সতী মাঝে মাঝে এসে জিজ্ঞাসা করে, 'ওদিকে কোন খবর এলো না, কাকা!'

'খবর আর কি আসবে, বড় মা! ছোটকর্তা নিরুদ্দেশ—আর—' চুপ করে রইল রজনী-তহসিলদার।

'আর কি?'

সুলতানপুরের জমিদার নন্দীগাঁয়ের মালিক। কর্তার অত সাধের দেবীর চর—সেও গেল। একটি দীর্ঘশ্বাস চেপে রজনী-তহসিলদার চুপ করে গেল।

'সুলতানপুরের জমিদার পাঁচকড়ি রায়?' সতী যেন আর কিছু বলতে পারে না।

'এখানে আমাদেরও আর বেশি দিন থাকা হবে না, মা। দত্তবাড়ির সব নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যে সায়েবের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে' —উৎকণ্ঠিতভাবে বলে বৃদ্ধ তহসিলদার।

'তারা' 'তারা' বলে নবীন বসুও বাইর বাড়িতে এসে বসলেন। রজনী-তহসিলদার হুঁকোটা এগিয়ে দিল তাঁর দিকে।

'কি বলছিলেন তহসিলদার মশায়?' নবীন বসু জিজ্ঞাসা করলেন।

'এখানেও আর আমাদের বেশিদিন থাকা চলবে না, তাহ'লে নন্দীগাঁয়ের আগুন এখানেও জ্বলবে।' বহুদিন পর রজনী-তহসিল-দারের ঘুমিয়ে পড়া মন যেন জেগে উঠল।

'আমার মেয়ে দুটির কি হবে?' গলা কেঁপে উঠল নবীন বসুর।

এ প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। এই অরাজকতার মধ্যে কি যে তার উপায়- কে বলে দেবে? হরিচরণও দাওয়ায় বসে বসে ভাবে। মনে পড়ে তার পুরানো দিনের কথা। নন্দাগাঁয়ের মাটি যেন তাকে ডাকছে। কিন্তু সেখানে কি আর ফিরে যেতে পারবে?

সতী ও সর্বাণীর সঙ্গে যে সব কাহার এসেছিল তারাও রয়েছে সেখানে। ফিরে আর যাবে কোথায়? কালীপ্রসাদের দলের লোক ভেবে তাদেরও ত কেউ রেহাই দেবে না। মহিম আচার্যের মতো বেইমান, নেমকহারাম তারা নয়—তা জাতে যতোই ছোট হোক না কেন।

তাই বৃদ্ধ সদা মোড়ল জবাব দিল, 'আমাদের হাতে ছেড়ে দিন, কর্তা। ওই লালমুখোদের আর এমুখো হতে হবেনা।'

কালের পরিবর্তন এরা বোঝেনা কিন্তু এরা জীবনে কোনো পরিবর্তনও চায় না—না সততার—না একাগ্রতার। তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নবীন বসু ব্যস্ত হয়ে তহসিলদার মশায়কে বলেন, 'একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। আমার ভাবনা ওদের জন্ত। আমি আর কদিন—তারা! তারা!'

'একমাত্র তিনিই জানেন—' আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখায় রজনী-তহসিলদার।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সমস্ত বাড়িটা রাত্রির অটল শান্তি রক্ষার জন্য নিস্তব্ধতা ও নির্জনতার মহড়া দিচ্ছে। বড় করুণ এই সন্ধ্যাটি।

হঠাৎ ছুটি লোক যেন তাড়াতাড়ি নবীন বসুর বাড়ির সামনে একটু দাঁড়িয়েই চলে গেল। চমকে উঠে বসু মশায় হাঁক দিলেন, 'কে যায়?'

কোনো জবাব নেই। সদা কল্কিটা নামিয়ে বলল, 'দেখ্‌ত ভূষ্‌ণ, কোন্ সুমুন্দির পো গেল? একটা রা-ও কাড়তে পারে না!'

ভূষণ উঠে এগিয়ে গিয়ে দেখে কিছুটা দূরে চার পাঁচ জন লোক কি যেন জটলা করছে। ফিরে এসেই বলে, 'গতিক ভালো নয়, কাকা—কয় স্যাঙাত মিলে ওই গাবগাছতলায় দাঁড়িয়ে।'

'শেষ করে দে—একটাকেও যেতে দিস নে,' বলেই বৃদ্ধ হরিচরণ সোজা হয়ে বসল।

সেই রাতেই চন্দনার বুকে আবার জোয়ার জেগেছে। একখানি বড় নৌকা তারই বুকেব ওপব দিয়ে অজানা তীবেব দিকে এগিয়ে চলেছে। দেবীর চর পেরিয়ে নন্দীগাঁয়েব কাছে এসে পৌঁছুতেই রজনী-তহসিলদার ছইর ভেতর থেকে বেরিয়ে একবার তাকালেন অনেক স্মৃতিজড়িত পুরানো গাঁয়ের দিকে।

চাঁদের আলোয় দূর থেকেও চেনা গেল নন্দীগাঁয়ের বৃদ্ধ প্রহবী অক্ষয়বটকে। ছইর ওপর বসে হরিচরণ যেন শেষ প্রণাম জানায় ওই বনস্পতিকে।

নদীর জলের শব্দ আর নৌকার দাঁড়ের শব্দ ছাড়া সবই যেন স্তব্ধ হয়ে আছে।

উন্নতশির অক্ষয়বটের দৃষ্টির সীমা পেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল নৌকাখানা।

আরও অনেক দিন কেটে গেল—জীবনের সুখ দুঃখের দিন।

কালীপ্রসাদ আমীর খানের আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে অনেকদিন। কোথাও যে স্থায়ীভাবে থাকবে সে উপায়ও নেই। নিজের ওপর ধিক্কার আসে। এরকম ভীরুর মতো লুকিয়ে থাকা। অথচ উপায় কি! খুনী আসামী সে। ইংরেজ সরকারের কাছে ক্ষমা নেই—দয়া নেই। বিশেষ করে কেলি সাহেবকে খুন করে কালীপ্রসাদ তাদের মাথায়ও খুন চাপিয়েছে।

ইসলামাবাদ শহরে যাবারও উপায় নেই। সর্বত্র উড সায়েবের লোক। ভয় বেশি ঘরের মানুষকে। নিজের দেশের লোককেই বিশ্বাস করা যায় না। কালীকিঙ্কর, মহিম আচার্যের দল চিরকাল দেশে অশান্তির দুষ্ট আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। এরা ঘর ভেঙেছে—বাইরের শত্রুকে ঘরে ডেকে এনেছে।

সবাইকে বিশ্বাস ক'রে সব জায়গায় যেতেও পারেনা কালীপ্রসাদ! এমন চেহারা হয়েছে যে তাকে আর চেনাও যায় না। নন্দীগাঁয়ের জমিদার রাজেন্দ্রনারায়ণের ছেলে আজ পথে পথে ঘুরে বেড়ায়!

মাথা উঁচু ক'রে চলতে গেলে অন্যায়ের আঘাত প্রথম এসে লাগে নিজেরই গায়ে—একথা কালীপ্রসাদও জানে।

সর্বাণীর কথা তাকে আরও বিব্রত করে। ভাবে, 'ওর জীবনে আমিই যত দুঃখ বহন করে এনেছি।' কাঁদতে ইচ্ছে করে কালী প্রসাদের। চোখের জল যে শুকিয়ে গেছে। সতী-প্রতাপের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েও সে পালন করতে পারেনি। আজ তারা কেমন আছে তারও কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

এভাবে আর ত চলে না। রাতের অন্ধকার তাকে যেন ঠেলে দিল আবার নন্দীগাঁয়ের দিকে। একটু দেখতে ইচ্ছে করে পিতৃ-পুরুষের প্রতিষ্ঠিত গ্রামখানিকে। কিন্তু দিনের আলোয় সবাই চিনবে তাকে। রাতের অন্ধকারই ভালো। হায়রে ভাগ্য, নন্দীগাঁয়ের মানুষ তাকে দেখতে পাবে বলে আজ তার এতো সঙ্কোচ!

সর্বাণী এখন কি করছে। নন্দীগাঁয়ে যাবার আগে কালীপ্রসাদ শ্রীপুরের পথ ধরল। সর্বাণী, সতী, প্রতাপ, রুদ্রনারায়ণ, দর্পনারায়ণ, নীরজা—আবার এদের সঙ্গে দেখা হবে। যেদিন নন্দীগাঁ ছেড়ে সর্বাণীরা শ্রীপুর যায় সেদিন কালীপ্রসাদকে করুণ মিনতি জানিয়ে সে বলেছিল, 'দিদি যাক—আমি তোমার কাছে থাকব।' জোর করে পাঠাতে হ'ল তাকে। সর্বাণীর সেদিনের চোখের জল তার মনে পড়ে।

নিশুতি রাত। শ্রীপুরের একটি লোকও যেন আর জেগে নেই। নবীন বসুর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় কালীপ্রসাদ। এখানে তার কোনো ভয় নেই।

কিন্তু—

বাড়ির দরজার কাছে এসে দেখল—বাইরে থেকে তা বন্ধ। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল কালীপ্রসাদের। তবে কি—

কে তার জবাব দেবে। পাথরের মতো নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে কালীপ্রসাদ। . নন্দীগাঁ গেল—কিন্তু যারা জীবনের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা ছিল তারা আজ হারিয়ে গেল কোথায়!

ছুটে বেরিয়ে এল কালীপ্রসাদ।

দীর্ঘ পাঁচ ক্রোশ পথ—শ্রীপুর থেকে নন্দীগাঁয়ের পথে একটি মানুষ এগিয়ে আসছে। রাত না ফুরোতেই তাকে বোঝাপড়া করে নিতে হবে।

নতুন প্রভাতের নবারুণের আবির্ভাব আসন্ন। বাসাছাড়া পাখির দল অজানা সমুদ্রের পানে উড়ে গেল। দুলে উঠল অক্ষয়বটের কচি ডালগুলো।

অক্ষয়বটের মূলে প্রণাম করতে গিয়েই একেবারে লুটিয়ে পড়ল কালীপ্রসাদ। পিতামহ বনস্পতি—তার কাছে একান্ত শিশু সে।

বড়ো অসহায়, বড়ো একা কালীপ্রসাদ। সারা দুনিয়ায় একমাত্র বন্ধু, গুরু, দেবতা—ওই অক্ষয়বট।

'এমনি করে সব কেড়ে নিও না, ঠাকুর।' শ্রাবণের ধারার মতো চোখের জল যেন আর বাধা মানতে চায় না। সমস্ত অহংকার, সমস্ত শক্তির দম্ভ এক মুহূর্তে যেন মিশিয়ে গেল।

এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল অক্ষয়বটের পাতা থেকে। ও তো শিশির বিন্দু নয়, নন্দীগাঁয়ের অভিভাবক অক্ষয়বটের কান্নার স্বাক্ষর।

দত্তবাড়ির পুড়ে যাওয়া ভিটের পাশে নতুন চকমিলানো দালান-কোঠা গড়ে উঠছে। সুলতানপুরের পাঁচকড়ি রায়ের সখের দালান-বাড়ি। হঠাৎ কালীপ্রসাদের যেন মনে হল পোড়া ভিটের ওপর এখনও যেন আগুন জ্বলছে।

এ আগুন কি নিববে না!

নন্দীগাঁয়ের মানুষ আবার ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। আর একটি দিন নন্দীগাঁয়ের বুকে নেমে এলো।

বিধবার করুণ হাসির মতো এ আলোর হাসি—শিশির-ভেজা ঘাসের বুকে অশ্রু-সজল হাসি। বড় করুণ—বড় মধুর।

কালীপ্রসাদ ভুলে গেছে তার বর্তমানকে, ভুলে গেছে তার ভবিষ্যতকে। অতীতের মায়া-ঘেরা নন্দীগাঁ তার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখল। পুরানো দিনগুলো তার সামনে ভিড় করে দাঁড়াল।

অক্ষয়বটের ছায়ায় বসে আছে কালীপ্রসাদ। বহুদিনের চেনা স্পর্শ তার মনকে বিধুর করে তুলেছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, একটা মানুষও এ পথ দিয়ে আসে না। দীঘির একটা পাড়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এই অক্ষয়বট। আজ নন্দী-গাঁয়ে এই বন্ধুটি ছাড়া কালীপ্রসাদের আর কেউ নেই।

পোড়া ভিটের দিকে তাকিয়ে কালীপ্রসাদের মনে হয় এখনও যেন সে সবাইকে দেখতে পাচ্ছে। ওই তো তার মা ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। রাজেন্দ্রনারায়ণ কাছারি ঘরে বসে জমিদারির তদারক করছেন। রজনী-তহসিলদার বসে লিখে চলেছে—'রতন পাল—জমা তিন টাকা নয় আনা ছ'পাই—।' রহমান কাকা ওই যে বসে।

চোখের সামনে ভেসে উঠল সর্বাণীর মুখখানি।

নন্দীগাঁয়ে আবার কর্মব্যস্ততা দেখা দিয়েছে। কালীপ্রসাদ অক্ষয়বটকে প্রণাম করে উঠে চলল চন্দনার পাড়ের দিকে। দূর থেকে দেবীর চরের হরিৎ আভাস দেখে আপন মনে সে বলে উঠল, 'এ দুঃখেও তোমার মুখের হাসি মিলায়নি!'

দেবতার দান মানুষের অপরাধ ভুলে যায়।

কতোক্ষণ যে এভাবে দাঁড়িয়েছিল কালীপ্রসাদের তা খেয়াল নেই। হঠাৎ তার চমক ভাঙল মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে। বড় চেনা গলা ত! মুখ ফিরিয়ে দেখে তারই নায়েব আর মহিম আচার্য। প্রায় চল্লিশ জন লোক নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

মুখোমুখি দাঁড়াতেই সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কালীপ্রসাদের দিকে। নায়েব আর মহিম আচার্য ঠিক চিনেছে। ওরা ছাড়া আর কেউ দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না যে লোকটি কালীপ্রসাদ।

"তোমরা আমায় ধরতে এসেছো?' কালীপ্রসাদ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল। কেউ জবাব দেয় না। মহিম আচার্য নায়েবের পেছনে লুকিয়ে আছে।

আজ কালীপ্রসাদের কোনো মোহ নেই-- কোনো ক্ষোভ নেই।

কালীপ্রসাদ ধরা পড়েছে। নন্দীগাঁয়ের লোকরাই ধরিয়ে দিল তাকে। এ ব্যাপার আজ নতুন নয়। বাঙলায় মীর জাফরআলি খাঁ তার ঘৃণ্যতম দৃষ্টান্ত। উড সায়েবের আজ আর খুশিতে ধরে না। এতদিনের প্রতিশোধের উদগ্র কামনা আজ সফল হতে চলল।

ইসলামাবাদ শহর! ইংরেজের আদালতে বিচার হচ্ছে কালী-প্রসাদের। আসামীকে নিজ পক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দিতে হবে। কালীপ্রসাদের পক্ষে উকিল রয়েছে।

নির্ভীক কালীপ্রসাদ। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত মুখে চোখে তার লাঞ্ছনার চিহ্ন আঁকা। বিচারক দুই পক্ষের সওয়াল জবাব শুনলেন। আসামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার কিছু বলার আছে?'

কালীপ্রসাদ ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'আছে।'

সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে তাব দিকে তাকিয়ে আছে।

'আমি কেলি সায়েবকে খুন করেছি। আমার বৃদ্ধ পিতামহ রাজীবলোচন দত্ত এদের হাতেই প্রাণ দিয়েছেন। আমার পিতা নীল সায়েবের গুলিতে কাশীতে খুন হয়েছেন। তারই প্রতিশোধ আমি নিয়েছি। আমার পরিবারের সবাইকে এরা—যাক—। আমি চাইনে এদের দয়ায় বাঁচতে।'

বিচার কক্ষ নিস্তব্ধ। বিচারকের রায় শোনার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। অনেকক্ষণ পর বিচারক বললেন, 'জানো এর শাস্তি কি?'

'না।'

'তোমার ফাঁসির হুকুম দিলাম।'

একটি গুঞ্জরণও শোনা গেল না। কেবল আদালতের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল একটি পাগল। সে শুধু বলে উঠল, 'গেল গেল, সবই গেল—দত্তরা এভাবে যাবার জন্যই এসেছে। আমিও গেছি—তুইও

গেলি, কাঁদারও কেউ নেই। এবার ভগবান বসে বসে কাঁদুন—আমার কি?' ভিড়ে মিশে গেল লোকটি।

বড় চেনা কণ্ঠ মনে হ'ল কালীপ্রসাদের।

সত্যের খাতিরে চিরকাল এভাবেই বলি দিয়েছে মানুষ নিজেকে। অন্যায় যখন মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে তখন তাকে সামলাবে কে? বিচারের প্রহসনে কালীপ্রসাদকে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়। কিন্তু যারা এ জীবন ছিনিয়ে নিল তাদের বিচার করবে কে?

সে যুগের মানুষ বলবে, 'ভগবান—ভগবান এর বিচার করবেন।'

নন্দীগাঁয়ের দত্ত পরিবারের আর একটি অধ্যায় শেষ হতে চলল। আকাশে বাতাসে সেদিন শরতের সোনার আলো ছড়িয়ে পড়েছে। দেবীর চর ফসলের খুশিতে ভরে আছে। পাঁচকড়ি রায়ের দাপটে দুর্ভাগ্যের কান্না শোনা যায় না নন্দীগাঁয়ে।

তবুও অক্ষয়বটের পাদমূলের ম্লান ছায়া আর ঘোচে না। বাইরের আলোর পথ সেখানে বন্ধ। তার প্রতিটি পাতা যেন অশ্রুসিক্ত। ক্লান্ত মৌন বনস্পতি নন্দীগাঁয়ের দুঃখের ইতিকথা রচনা করে চলেছে তমসার-কূলবর্তী বাল্মীকির মতো।

ইসলামাবাদের হীরামহল আর নন্দীগাঁয়ের রূপমহল আজ হীরা বাইজীর সম্পত্তি। দেবীপ্রসাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হীরামহল—আর পাঁচকড়ি রায়ের ভোগপিপাসার ডালি ওই রূপমহল। নন্দীগাঁয়ের মানুষের কতো দুঃখের দিনের ওপর এই মহল দু'খানা তৈরি।

হীরা কখনও ইসলামাবাদে থাকে, কখনও আবার নন্দীগাঁয়েও থাকে। তবে নন্দীগাঁয়ে ব্যবসার দিক থেকে তেমন সুবিধে নেই। এগাঁয়ের বেশির ভাগ লোক গরীব। ইসলামাবাদই ভালো। পাঁচকড়িও আর ক'দিন! সুলতানপুরের জমিদারের বাতির তেল ফুরিয়ে আসতে আর বেশি দেরি নেই। আবার নতুন মানুষের মনে রঙ ধরাতে হবে।

ছেলেটা বড়ো হয়েছে। ওকে আর কাছে রাখাও যায় না। অথচ কোথাও পাঠাবারও জায়গা নেই। বাইজীর ছেলে—পয়সার অভাব হবে না। কিন্তু—

আর ভাবতে পারে না হীরা—মদ আর পাশবিক উল্লাস তার জীবনকে যেন ঘোলাটে করে তুলেছে। দেহকামনার উর্ধ্বে আর কি থাকতে পারে তা ভেবেও পায় না।

হঠাৎ একদিন রূপনারায়ণ এসে তাকে বলে—'মা আমি পড়ব।

'কি পড়বি ?'

'বই পড়ব, পাঠশালায় যাবো।'

হীরা ভাবে, 'এ আবার কি !'

তবুও তার কথা রাখতে হয়। পড়তে চায়—পড়ুক না। যতটা সহজ বলে মনে হয়, যদি ততটা সহজ হত এই পৃথিবী—তাহলে মানুষের জীবনে থাকতো না কোনো দ্বন্দ্ব, কোনো দ্বিধা। ওসব আছে বলেই মানুষের পৃথিবী এত জটিলতা, এত সংকীর্ণতায় ভরা।

তাই রূপনারায়ণকে কেঁদে কেঁদে ফিরে আসতে হয় পাঠশালা থেকে। হীরা তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, 'কি হল রে—কাঁদছিস কেন ?'

'আমায় পাঠশালায় পড়তে দেবে না।' রূপনারায়ণের অভিমানাহত কণ্ঠ।

'কেন ?'

উত্তর দিতে পারে না রূপনারায়ণ। হীরারও জিদ চেপেছে। বারবার প্রশ্ন করতে হঠাৎ বলে ফেলল, 'তুমি নাকি ভালো না।'

এই ছোট্ট কথাটির উত্তর নেই হীরার। ছেলের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে হীরা। মুখখানি দেখে মনে পড়ে দেবীপ্রসাদের কথা। একই চোখ, একই মুখ, কিন্তু এই ভাবনা ক্ষণিকের। তার জীবনের যে কলঙ্কময় দিক আজ তার ছেলের

কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে তার কথা সে ভাবতে পারে না। তবুও রূপনারায়ণের কথায় যেন সঙ্কোচ হয় তার।

'নন্দীগাঁয়ে গিয়ে থাকবি? সেখানে বেহারীও তোর সঙ্গে থাকবে!'

'ওখানে ত পাঠশালা নেই'—রূপনারায়ণ আজ যেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

'তাহলে তোর কি করতে ইচ্ছে করে বল?'

'আমায় দূরে কোথাও পাঠিয়ে দাও, আমি সেখানে গিয়ে পড়ব।'

'তোর এত বিষয় সম্পত্তি কে দেখবে?'

'তুমি!'

'আমি আর কদিন বাঁচব? তারপর তোকেই যে সব দেখাশুনা করতে হবে।'

'আমার ভালো লাগেনা—কিছুই।'

বাইজীর ছেলের মুখে নতুন কথা। যে ঐশ্বর্য সম্পদ হীরা-বাইজীর জীবনের একমাত্র কামনা তারই সন্তান তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। হীরার মনে ভাবনা ধবে যায়।

নন্দীগাঁয়ের পোড়া ভিটে পড়েই আছে। গাঁয়ে যারা নতুন এলো তারা শোনে তার কাহিনী আর যারা পুরানো—তারই উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘশ্বাসকে তারা রেখে যায়।

নন্দীগাঁয়ে দত্ত-পরিবারের কোনো চিহ্নই নেই। কেউ-বা বরণ করল মৃত্যুকে আর কেউ-বা কোথায় যে চলে গেছে কেউ তার সংবাদ রাখেনা। ডাকাতে বিল, চন্দনা আর অক্ষয়বট রইল তার ইতিহাসের সাক্ষী।

ওদিকে রূপমহলে নৈশ বিকৃতির উল্লাস জেগে উঠে। কিন্তু সারা গাঁয়ের আর্তনাদকে ত আর ছাপিয়ে উঠতে পারে না। হীরা যখন নন্দীগাঁয়ে আসে রূপনারায়ণ থাকে ইসলামাবাদে বেহারীর কাছে।

পাঁচকড়ি ওই ছেলেটাকে সহ্য করতে পারে না, কিন্তু হীরার ভয়ে কিছু বলতেও পারেনা। হীরাও তা বোঝে।

সেবার নন্দীগাঁয়ে দশহরার পূজো হবে। পাঁচকড়ি রায় প্রজাদের জানিয়ে দিয়েছে—এবার পূজোয় জমিদার-প্রণামী দিতে হবে সবাইকে—আর পূজোর জন্য প্রত্যেককে সিধে আনতে হবে। গাঁয়ের লোক আর দেবীর চরের প্রজারা অনুনয় ক'রে বলে, 'কোথায় পাবো অতো!'

'সে আমি জানিনে,' পাঁচকড়ি তার ভাঙা কাঁসার মতো গলা কাঁপিয়ে বলে।

'রাজার জমিদারিতে থাকবি আর তাঁর প্রণামী দিবিনে—একি মগের মুল্লুক পেয়েছিস?' নায়েব বাকিটা পূরণ ক'রে দিল।

ভুবন হাজরা রাজেন্দ্রনারায়ণের দিনের মানুষ। এমন কথা সে কখনও শোনেনি। দুবেলা দুমুঠো খাবার জোটেনা -তার ওপর আবার জমিদারের নজরানা। নায়েবের কথা শেষ না হতেই ভুবন হাজরা বলে উঠল, 'খেতে না পেলে দেব কোত্থেকে কর্তা।'

'ভিটে-মাটি বিক্রী করে দিতে হবে', বলেই নায়েব একবার পাঁচকড়ি রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

'বুড়ো কর্তার আমলে ত এমন ছিলনা,' ভুবন হাজরা যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। গ্রামের আরও কয়েকজন চাষী জমিদার বাড়িতে বসে আছে। নায়েবের কথায় তারাও অবাক হয়েছে।

'ওরে কে আছিস'—পাঁচকড়ি রায়ের দারোয়ান ছুটে এল। ভুবন হাজরাকে দেখিয়ে পাঁচকড়ি বলে, 'এই বুড়োটাকে কয়েদখানায় বেঁধে রাখ্। কাল বিচার হবে। বাড়াবাড়ি করলে বেত মারবি।'

'বাঁধতে পারো তুমি, কিন্তু হক্ কথা বলতে আমি ছাড়বনা। ও করতে গেলে শুধু আমি নই—সবাই খেপবে,' ভুবন হাজরার কথা শেষ হলনা, দারোয়ান তাকে ধরে নিয়ে চলে গেল।

পাঁচকড়ি সবার মুখের দিকে একবার তাকালো। মুখে তার আত্মপ্রসাদের হাসি। নায়েব ছাড়া সবাই যেন কি এক অজানা আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত।

হীরা বাইজী এসেছে পাঁচকড়ি রায়ের সঙ্গে। পুজো দেখবে বলে রূপনারায়ণও সঙ্গে এসেছে। রূপমহলে লোকজনের ভিড়। প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। বাইজী নাচ হবে—কৃষ্ণ-যাত্রা হবে। চার-দিনের পুজো—কিন্তু চারমাসের আয়োজন করা হয়েছে। নন্দীগাঁয়ের মানুষগুলো কিন্তু তেমন উৎসাহ পায়না। দেবীর চরের চাষীরা নন্দীগাঁয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে হয় ওখানে কোথাও যেন একটু বেঁচে থাকারও অবকাশ নেই।

রূপনারায়ণ এখন বড়ো হয়েছে। সবই সে বুঝতে পারে। পাঁচকড়ি রায়কে তার ভালো লাগে না। এখানকার হিন্দুস্থানী দারোয়ান রামলগন সিং তার একমাত্র বন্ধু। রামলগন তাকে সিপাই-লড়ায়ের গল্প শোনায়। বাইরে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। সবাই কেমন ক'রে যেন তার দিকে তাকিয়ে থাকে। একদিন সে নিজের কানেই শুনল, দুয়েকটি মেয়ে বলাবলি করছে, 'ওই দেখ, বাইজীর ছেলে যাচ্ছে। ঠিক যেন বড়কর্তার মতো মুখখানা।'

কেউ তাকে ডেকেও কথা বলেনা। ছেলেরা ওকে দেখলে পালিয়ে যায়। নিজের পিতৃপরিচয় সে জানে না।

হীরাও লক্ষ্য করেছে, রূপনারায়ণ যেন সব সময় কি ভাবে। কামনার আগুনে নিজেকে আহুতি দিলেও মাঝে মাঝে কোন গভীর থেকে একটুখানি স্নেহ ভালবাসা করুণ সুর তাকে ব্যথিয়ে তোলে। রূপনারায়ণকে একা পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'কি অতো ভাবিস তুই বলত?'

'তোমরা সবাই কেমন জানি,' রূপনারায়ণ আর কিছুই বলতে পারেনা!

হীরাও একথার জবাব দিতে পারে না। সত্যিই ত, ছেলের মা হয়েও কি তাকে আপনার করে নেবার ফুরসৎ পেয়েছে? রূপনারায়ণও তার ভোগতৃষ্ণারই প্রকাশ। কিন্তু এই সন্তানের মাঝেই যে নারীর স্বর্গ লুকানো আছে এ তাকে কে বলে দেবে?

আজ নন্দীগাঁয়ে এসে যেন হঠাৎ তার মনের মাঝে নতুন সুর বেজে উঠতে চায়। দেবীপ্রসাদের কাছে শুনেছে সে নন্দীগাঁয়ের কথা। এই নন্দীগাঁয়ের সৌরভীর সঙ্গে জড়িত রয়েছে তার জন্মরহস্য। এখানকার আকাশে বাতাসে যেন ইসলামাবাদের সেই উদগ্রতা নেই। এখানকার হাওয়া যেন মাতাল করে না। সত্যি বলতে কি, পাঁচকড়ির উন্মত্ততা এখানে তাকে লজ্জা দেয়। রূপনারায়ণের কাছে মায়ের প্রাণ সহজভাবে ধরা দিতে পারে না। তার মতো মেয়ের বন্ধন বলে ত কিছু নেই। ওই রূপনারায়ণই যা কিছু মায়া সৃষ্টি করেছে। তবুও তাকে উজাড় করে ভালোবাসা দিতে পারেনি বলেই কি আজ ওই কিশোরের মনেও দ্বিধা জাগে!

হীরা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। বাইরে চাঁদের আলোয়-কি সুন্দর দেখাচ্ছে গ্রামখানা। দূরে ঐ চন্দনা—তারই বুকে দেবীর চর। মুখ ফেরাতেই দেখতে পেল দীঘির পাড়ের নিঃসঙ্গ অক্ষয়বটকে। হীরা শুনেছে এই অক্ষয়বটের কথা! মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সে। নিজেরই অজ্ঞাতসারে দুহাত তুলে নমস্কার জানালো হীরা। হঠাৎ নিজের আচরণে নিজেই অবাক হ'ল।

গ্রামবৃদ্ধ অক্ষয়বটের মাঝে তার জন্য কোন আশীর্বাদ নেই কি!

নন্দীগাঁয়ের সব কিছুই যেন ভালো লাগছে তার। যদি জীবনটা এইখানেই কেটে যায়! পাঁচকড়ি রায়ের উদগ্র কামনার ইন্ধন জুগিয়ে জীবনে বড়ো ক্লান্তি নেমে এসেছে। বিশেষ করে রূপনারায়ণের জন্য তাকে ভাবতে হবে। এই ভাবনা ত ইসলামাবাদে ছিলনা! পাঁচকড়ি রায়ের জমিদারি—হীরার নামে লিখে দিলেও মালিক ত সেই।

এ শুধু ক্ষণিকের দোলা যেন—পর মুহূর্তেই হীরার মাঝে বাইজী হীরা ঝলমল করে উঠলো। পাঁচকড়ি রায়ের দৌলতে

আজ হীরামহল রূপমহলে বর্বর উল্লাস চললেও এর আয়ু আর কদিন।

সুলতানপুরের বাতি নিবে আসছে। দমকা হাওয়া এসে তাকে একেবারে নিবিয়ে দেবে। তবু যে কদিন চলে চলুক না।

হঠাৎ পেছন থেকে রূপনারাণ ডাকল, 'মা।'

'কি বাবা'—নিজের হলেও বড় অচেনা কণ্ঠ থেকে যেন অজানা সুর ধ্বনিত হল বলে হীবার মনে হয়।

'চল, আমরা কোথাও চলে যাই—এখানকার মানুষ আমাদের ভালোবাসেনা।'

'শুধু এখানকার কেন, কেউ আমাদের ভালোবাসে না—মানুষ আমাদের ভালোবাসে না। কিন্তু এখান থেকে কোথাও যে যাওয়া চলবে না—এ দেশের মাটির সঙ্গে আমাদের যে রক্তের সম্পর্ক, বাবা।' হীরার গলা কেঁপে উঠল।

রক্তের সম্পর্ক! রূপনারায়ণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে হীরার দিকে।

দূরে কে যেন গান গেয়ে চলেছে—

সখি, কি মোর করম লেখি,
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি।

বহু দূর থেকে ভেসে আসা গানের সুর চমক লাগায় হীরার মনে। কে এই মানুষটি!

রূপনারায়ণকে বুকের কাছে টেনে নিল হীরা। আজ তার মনে মাতৃত্বের জোয়ার জেগেছে। দেবীপ্রসাদের কথা মনে পড়ল।

রূপনারায়ণ হীরার জীবনে অভিশাপ নয়—আশীর্বাদ। ওস্তাদ গুলাব খাঁর কথা মনে পড়ল তার। ছেলেবেলা থেকে গান শিখেছে তাঁর কাছে। গুণীর কণ্ঠে আকাশ-বাতাস ছাপিয়ে সুর জেগে উঠত

জিস্‌নে দিয়া দরদে দিল্‌

উস্‌কো খোদা ভালা ক্যরে।

ডাকতে ইচ্ছে করছে ভগবানকে, কিন্তু হারানো সুর যেন আর খুঁজে পায় না জীবনের মাঝে!

রাত-জাগা কোন অজানা পাখি অক্ষয়বটের ডাল থেকে উড়ে মিলিয়ে যায় রাতের অস্পষ্টতায়।

পূজার আর দুটো দিন বাকি। নহবতে সানাই বাজে—বাজে তাতে আগমনীর সুর। পাঁচকড়ি রায় নায়েবকে ডেকে বলে—'প্রজারা সবাই পুজোর সিধে দিয়ে গেছে কি না দেখবে! আর মহাষ্টমী তিথিতে নজরানা দিয়ে যাবে।'

নায়েব এইটুকুর জন্যই অপেক্ষা করছিল। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সব ব্যবস্থা আমি করছি, কিন্তু ঐ ভুবন হাজরাকে বাগ মানাতে পারছি না। ওর পরামর্শে শূদ্দুররা কেউ এদিকে এগোচ্ছে না। ওকে দু' ঘা লাগিয়েই ছেড়ে না দিলেই ছিল ভালো।'

'খবর পাঠাও, পুজোর পরদিন সবাই এখানে হাজির থাকবে। আর ভুবন হাজরাকে—'

ষষ্ঠীর রাত—অকাল বোধনের আগ্নেয় রজনী শূদ্র পাড়ায় আগুন জ্বলে উঠল। রাতের অন্ধকারে নন্দীগাঁয়ের আকাশকে রক্তচক্ষু কাপালিকের মতো দেখাচ্ছে। চারদিকে আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে—'আগুন, আগুন!' পাঁচকড়ি রায়ের মুখে বীভৎস হাসি!

চিৎকার শুনে হীরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আগুন দেখে পাঁচকড়িকে ব্যস্ত হয়ে বলে, 'এ কি করে হ'ল?'

'শয়তানের শাস্তি এমনি করেই হয়—আমি রাজেন্দ্রনারায়ণ দত্ত বা তার ছেলে নই। আমার জমিদারিতে ওসব শয়তানি চলবেনা।'

'শয়তান কে?' হীরার ঝাঁঝালো প্রশ্ন।

পাঁচকড়ি হীরার দিকে ফিরে তাকাতেই মদের নেশা যেন কেটে যায়। একটু চুপ করে থেকে বলে, 'ওই ছোট লোকরা ঠিক করেছে, পুজোয় জমিদারকে নজরানা দেবে না—'

'তাই ওদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হ'ল?'

পাঁচকড়ির মনে হয়, এত হীরা বাইজী নয়। আজ সরাবের নেশা হয়নি বুঝি। পাঁচকড়ির চোখে আবার নেশা ধরছে।

'আমি এ গাঁয়ের জমিদাব। ওরা নজরানা দিতে হয় আমাকে দেবে, তোমাকে নয়। আমি, ওদের কাছে নজরানা চাইনি'—হীরার কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে উঠছে।

'ওভাবে কথা বোলনা, পিয়ারী, এ যে একেবারে ঘরের মেয়েমানুষের মতো কথা হ'ল—'

'চুপ করো, তুমি হুকুম দেবার কে?' হীরা আবার প্রশ্ন করে। বাইরে গোলমাল শুনে রূপনারায়ণও মার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

'জমিদারি আমার, তাই হুকুম দিয়েছি',—পাঁচকড়ি এবার একটু মেজাজ দেখাতে গেল। 'এখানে আমার হুকুম চলবে, তোমার নয়।' হীরা ছুটে বেরিয়ে গিয়ে ডাক দিল—'রামলগন সিং!'

রামলগন আসতেই বলল, 'শূদ্দুর পাড়ায় বলে আয় তারা আমার এখানে আশ্রয় নেবে। বলবি—আমি বলেছি। তাদের ঘর-বাড়ি আবার সব হবে।'

উত্তেজনায় হীরার সমস্ত হাতপা কাঁপছে। হঠাৎ চোখ পড়ল তার দত্তবাড়ির পোড়া-ভিটের উপর। চমকে উঠল। কে একজন বসে রয়েছে না? ভয় পেল হীরা।

লোকটা একবার রূপমহলের দিকে তাকালো, তারপর উঠে ধীরে ধীরে অন্ধকারে কোথায় চলে গেল। হীরা আর এক পাও এগোতে পারছে না। একি মানুষ, না আর কিছু।

পাঁচকড়ি রায় টলতে টলতে নেমে এসেছে। হীরার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আমার হুকুমের ওপর আবার হুকুম চালালে কেন ?'

কোনো জবাব দিল না হীরা। কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করতে যেতেই হীরা ধাক্কা দিয়ে হাত সরিয়ে দিল। মদের নেশায় টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে বসে পড়ল পাঁচকড়ি রায়।

'আমার গায়ে হাত তোলো তুমি কোন্ সাহসে ?' পাঁচকড়ি চেঁচিয়ে ওঠে।

রূপনারায়ণ দোতলার বারান্দা থেকে 'মা' বলে ডাক দিতেই হীরা ছুটল ঘরের দিকে। পাঁচকড়ি ভাবল, ছেলেটাকে এখান থেকে সরাতে হবে। তারপর—না এখন থাক।

পরদিন। পুজোবাড়িতে যথারীতি পুজো শুরু হয়েছে। কিন্তু গাঁয়ের কেউ আসেনা। রামলগন যাদের জমিদার বাড়িতে আশ্রয় নিতে বলেছিল তারাও কেউ আসেনি। সবাই বলে জমিদার যেখানে ঘরে আগুন ধরায় সেখানে তার মেয়েমানুষ আর কি করবে ?

তারা চলেছে ভিন গাঁয়ে। মা এলেন স্বর্গ থেকে নেমে, সন্তান চলেছে অচেনা পথ ধরে। আগমনীতেই বিজয়ার সুর যেন বেজে ওঠে।

জীবন কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম ওই অক্ষয়বট—আনাগোনার পথপ্রান্তে দাঁড়িয়ে শুধু চেয়েই রইল। মৌনী তাপসের মতো বাণী জেগে থাকে তার অন্তরে—বাইরে সে স্থির, অচঞ্চল।

পাঁচকড়ি রায় অপমানে, রাগে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। প্রজারা কেউ আসেনি—নজরানাও দেয়নি।

রূপনারায়ণ নতুন জামা কাপড় পরে পুজো দেখতে যাচ্ছিল। হঠাৎ ঠাস করে তার গালে চড় কসে বলে, 'কোথায় যাচ্ছিস ?'

এই প্রথম আঘাত। রূপনারায়ণের গায়ে কেউ কখনও হাত তুলতে সাহস করেনি। তার কান্না শুনে হীরা ছুটে এসে তাকে বুকে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কি হয়েছে, বাবা?'

'যাও, অতো সোহাগ করতে হবেনা—বাইজীর আবার ছেলে সোহাগ?' পাঁচকড়ি খোঁচা দিয়ে বলে।

হীরা বুঝল—আর এভাবে চলবেনা। পাঁচকড়ি তাকে বুঝিয়ে দিতে চায় যে হীরা তার রক্ষিতা। কিন্তু সে যে রূপনারায়ণের মা এটাও সে বুঝিয়ে দেবে।

'নন্দীগাঁয়ের মালিক আমি। এখানে যদি কোনো গোলমাল করো ত তোমায় তার প্রতিফল পেতে হবে। এটা সুলতানপুর নয়।'

'কাগজপত্র সব বার কর—আমার দরকার আছে।' পাঁচকড়ি ধমক দিয়ে বলে।

'হীরা বাইজী নিতেই শুধু জানে, দিতে জানেনা—'

পাঁচকড়ি রায় প্রমাদ গোণে।

তারপর আরও দিন কেটে গেছে। সেদিনগুলোর আকাশে কখনও মেঘ দিয়েছে দেখা, কখনও বা সে সুপ্রসন্ন। নন্দীগাঁয়ে আরও নতুন মানুষ এসে বাসা বেঁধেছে। মানুষের কান্না অক্ষয়বটকে যেমন অশ্রুসজল করে তুলেছে তেমনই তার হাসিও জাগিয়েছে প্রাণের আবেগ।

সুলতানপুরের বাতি গেছে নিবে। হীরা বাইজীকে ফেলেই চলে গেছে পাঁচকড়ি রায়। নন্দীগাঁয়ে হীরা থেকে যেতে চায়, কিন্তু এখানকার মানুষ তাকে চায়না। সমাজে তার পরিচয় কি?

দেবীর চরের চাষীরা হীরাকে পেয়ে খুশি। হীরা তাদের বলে দিয়েছে, 'বুড়োকর্তার সময় যে নিয়ম ছিল, যে আইন ছিল—তাই তোমরা মেনে চলবে।' নায়েব আর মহিম আচার্যের যেন আবার

দুশ্চিন্তা ধরল। এই মুনিব নিয়ে ত পারা যাবেনা। কিন্তু উপায় কি ? আগুন নিয়ে ত খেলা করা যায় না ?

রূপনারায়ণ আরো বড়ো হয়েছে। এবার সে বুঝেছে তার-জীবনের কলঙ্ক শত চেষ্টা করলেও মুছবেনা। এ কলঙ্কের বোঝা আর কতদিন বইতে হবে ? মা তার কাছ থেকে যেন দূরে দূরে থাকে। মানুষের মতো বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই কি তার জীবনে ?

ঘর ছেড়ে একদিন সে বেরিয়ে গেল। হীরা একা—বড়ো একা। জীবনের উদগ্র উল্লাস থেমে যেতে কোনো এক শুভ মুহূর্তে সে জেনেছিল যে তারও মাঝে একটি হৃদয় আছে। সন্তানের প্রতি ভালোবাসা এতদিন তাব বুকে সুপ্ত ছিল। যেদিন জেগে উঠল সেদিন সে জেনেছিল যে সে শুধু পুরুষেব ভোগবিকৃতির উপকরণ নয়—সে মা। কিন্তু সেই মাতৃহৃদয়ের সম্পূর্ণ প্রকাশেব আগেই রূপনারায়ণ সরে গেল—তার জীবন থেকে। আজ সেই সন্তানের অভাব ঐশ্বর্য-সম্পদের প্রাচুর্যে আকণ্ঠ-নিমগ্ন হীবা বাইজীকে একেবারে পথের কাঙালিনী করে দিল। কিছু বলে গেল না—কোনো চিহ্নও রেখে গেলনা। আজ মনে পড়ে দেবীপ্রসাদকে। সেও তো সরে গেল জীবন থেকে।

ইসলামাবাদে গিয়ে অনেক খোঁজ কবেও পেলোনা রূপনারায়ণের দেখা। আবার ফিরে এল নন্দীগাঁয়ে। সবকিছু হারিয়ে প্রতিটি দিন তার কাটে অধীর প্রতীক্ষায়। আবার যদি সে ফিরে আসে। এই জীবনে তার পর থেকে কতো প্রলোভন এল—আবর্জনার মতো জীবন থেকে সবই সরিয়ে ফেলেছে হীরা।

জীবনে কামনার যজ্ঞে নিজেকে আহুতি দিয়ে কি মায়ের বুকের জ্বালা মেটে ?

নন্দীগাঁয়ের বুকে আর একটি রাত এলো। রূপমহলের রূপ গেছে হারিয়ে। নিকুঞ্জ অরণ্য রূপ ধারণ করেছে। হীরা বাইজী আছে একা—শুধু একমাত্র সঙ্গী তার দারোয়ান রামলগন সিং। গ্রামের কেউ আসেনা তার কাছে। বাইজীর পরিচয় বাইজীই রয়ে গেল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন গগনের সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিম গগনে। নতুন জীবনের সংবাদ শোনা যায় সেই অপরাহ্ন বেলায়। দরিদ্র চাষীরা করে বিদ্রোহ।

নন্দীগাঁয়ে সাঁঝ বেলায় নীরবে প্রদীপ জ্বালে মেয়েরা। মানুষের জীবনের গতির পদধ্বনি যেন শোনা যায় না। শতবর্ষের অভিশাপের বোঝা বহন করে চলেছে নন্দীগাঁয়ের মানুষগুলো। হীরা এলো জীবনের রঙীন স্বপ্ন নিয়ে—তারও চোখে নেমে এলো শ্রাবণের দুঃখ রজনীর অশ্রুধারা।

শুধু ওই বৃদ্ধ অক্ষয়বটই কান্নাহাসির ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে নন্দীগাঁয়ের বুকের ওপর নিশ্চল নিস্তব্ধ হয়ে অনাগতের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

হীরা বাইজীর রূপের আলোও স্তিমিত হয়ে এসেছে। ইসলামাবাদের হীরামহলের নেশা গেছে তার কেটে। এখন শুধু টিকে থাকা—শুধু চোখের জল নিয়ে পথ চাওয়া।

সেদিনেও এমনই রাত ছিল! হীরা ঘর থেকে বেরিয়ে দত্তবাড়ির পোড়া-ভিটের দিকে তাকিয়ে আছে। অনেকদিন স্বপ্ন দেখেছে, ওই ভিটের ওপর আবার ঘর তুলবে।

আজ যে রূপনারায়ণ তার বুক খালি করে দিয়ে চলে গেছে। একদিন তার আবির্ভাবের আশীর্বাদ যে বহন করে এনেছিল, এই ভগ্নস্তূপের মাঝে যেন তারই দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। হীরার এই আকুল বেদনা বুঝবে কে?

চমকে উঠল হীরা—ওই যে বড় ক্লান্ত, বড় শ্রান্ত একটি ছায়া টলতে টলতে ভিটের উপর এসে বসে পড়ল। শক্ত করে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে হীরা। বহুদিনের পুঞ্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের যেন ওই মূর্ত্ত্য প্রতীক।

একবার মনে হ'ল ছুটে গিয়ে ঐ ছায়াকে ধরে ফেলে। কিন্তু অনেকদিন—অনেক ভেবেও সে ওই ভিটের কাছে যেতে পারেনি! কি যেন এক সংস্কার তাকে বার বার বাধা দেয়। পাপের পঙ্কিল স্রোত ওখানে তার গতি হারিয়েছে।

আজ সে সংস্কারমুক্ত। বার বার ওই ছায়াটি তাকে বিব্রত করে তুলছে। শরীরী হোক আর অশরীরী হোক আজ যেতেই হবে তাকে। দুঃখের দুঃসহ দাহনে অতৃপ্তির আগুন আজ একেবারে নিবে গেছে। ছলনায় সিদ্ধি নেই—আছে সাধনায়।

হীরা কাউকে নিল না সঙ্গে। নন্দীগাঁয়ের জাগ্রত রাত্রির নিস্তব্ধ আঁধারে একা বেরিয়ে পড়ল। এগিয়ে গেল পোড়া-ভিটের দিকে।

ছায়ামূর্তি বসে আছে—এতো মানুষ! কিন্তু চেনা যায় না।

'হি হি' করে হেসে উঠল মানুষটি।

হীরা আরও এগিয়ে আসে।

'যাও, এখানে এসো না—' কঠিন আদেশ। হীরা দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কে তুমি?' হীরার বিস্মিত প্রশ্ন।

'কেউ না—'

'এখানে কেন বসে থাকো—কেন আসো এখানে?'

'এমনি—' হীরার মনে হয় বড় চেনা-চেনা কণ্ঠস্বর।

'তুমি?'—

'হ্যাঁ আমি—অনেক ছিল আমার, সব গেছে।'

হীরা চিনেছে। এতদিন যাকে সে খুঁজে বেরিয়েছে সেই মানুষটিকে চিনেছে। হীরা কাছে এসে বসে পড়ল। আতকে উঠল—পাগলু।

'তুমি চলে যাও—কাছে এসো না', উঠে দাঁড়ালো।

হীরা তার হাত ধরতেই ছাড়িয়ে নিল সে।

'শোনো, তোমার সবই আছে, সবই আমার কাছে আছে, আমি সব আগলে বসে আছি। তুমি যেওনা।'

'কিছু নেই, কিছু নেই, তোমাকে চিনি না। তুমি কে?'

'আমি হীরা—তুমি চিনতে পারছো না আমাকে?'

'না, দুটি খেতে দেবে আমাকে? বড় খিদে পেয়েছে।'

'এসো আমার সঙ্গে,' হীরা আবার তার হাত ধরল।

পাগল কি যেন ভাবলো। হঠাৎ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'তোমার অন্ন আমার সহ্য হবে না। তুমি নীচ, তুমি—তুমি—' অন্ধকারে মিলিয়ে গেল কালো ছায়া।

পরদিন। অক্ষয়বটের কোলে মরে আছে একটি মানুষ। গাঁয়ের সবাই ভিড় করে আছে। রামলগন সিং এসে হীরাকে জানাল। সারা রাত চোখের পাতা পড়েনি। রামলগনের কথা কানে গেল না তার। বার বার মনে হল—ও বলেছিল, 'তুমি নীচ—।' তাইত আর কি পরিচয় আছে তার।

ভিড় ঠেলে মৃতের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল হীরা। সবাই অবাক হয়ে ভাবে, পাগল নিয়ে এ কোন্ পাগলামি!

কিন্তু কি করে ওরা বুঝবে হীরার কতখানি আজ হারিয়ে গেলো। নামহীন, গোত্রহীন, অপরিচয়ের অখ্যাত লোকের একটি মেয়ে আজ লুকিয়ে আছে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ওপর। পাঁচকড়ি রায় তার জীবনে মৃত। রূপনারায়ণ তার বুকখানি খালি করে দিয়ে গেছে। যেদিন সে বুঝল বাইজীও ভালোবাসতে জানে—সেদিন থেকেই তার জীবনে কান্নার পালা শুরু হ'ল। কয়েকটি মুহূর্তের জন্য ফিরে পেল জীবনের বহু-প্রতীক্ষিত মানুষটিকে। হারিয়ে গেল সে চিরদিনের মতো।

অক্ষয়বটের কোলে ঘুমিয়ে আছে দেবীপ্রসাদ। শেষ মুহূর্তে জীবনকে খুঁজে পেল তার একমাত্র বন্ধুকে। অক্ষয়বটের একটি পাতাও নড়ে উঠল না। অতি সন্তর্পণে সে যেন ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। পাতায় পাতায় তার শাসন, 'কথা কয়ো না, বড়ো ক্লান্ত মানুষটি—ওকে ঘুমুতে দাও।'

কোথায় কোন সুদূরের আকাশে বাতাসে জেগে উঠল আর্তনাদ, হারিয়ে যাওয়া কোন্ মানুষের চোখের জলের বারতা বয়ে আনল মধু-চৈত্র মাস। কোথায় সতী, কোথায় প্রতাপ—নন্দীগাঁয়ের কেউ তার খবর রাখে না। যে মানুষটি এতদিন খুঁজে বেরিয়েছে তারও খোঁজার শেষ হল। কালীপ্রসাদ রেখে গেলো সর্বাণীর জন্য প্রতিদিনের চোখের জলের করুণ পূরবী। সব যেন শেষ হয়ে এল।

তবুও কি শেষ হয়! কোথায় যে তার শেষ কেউ কি তা জানে! দুর্যোগের আড়ালে কি প্রচ্ছন্ন কল্যাণের আভাস নেই? শুধু অক্ষয়-বট জানে তার ভাষা!

নন্দীগাঁয়ের শ্মশানে জ্বলে উঠল চিতার আগুন। হীরার চোখের জল আজ আর বাধা মানে না। একেবারে নিঃসঙ্গ, একা—কেউ যে তার নেই।

মৌন বটের পাতায় পাতায় চিতার আগুনের রক্তিম আভা জড়িয়ে আছে। যেন প্রিয়জন বিরহে বৃদ্ধ বটের বুকেও আগুন জ্বলে ওঠে।

হীরা দীঘির জলে স্নান করে এসে অক্ষয়বটের পাদমূলে জানালে জীবনের অকুণ্ঠ প্রণাম।

'ঠাকুর, কেউ নেই আমার। মানুষের ঘৃণা থেকে, জীবনের দুঃখ থেকে আমাকে মুক্তি দাও।'

সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে অক্ষয়বটের পাতায় পাতায় অচেনা হাওয়া দোলা দিয়ে যায়। যেন সে মাথা দুলিয়ে বলে, 'আমি ত আছি।'

চৈত্র সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত এলো।

বাইজী হীরার মরণ হ'ল—বেঁচে রইল শুধু শাশ্বত নারী! এবার সমস্ত জীবন দিয়ে তার খোঁজার পালা।

শবরীর প্রতীক্ষার শেষ হবে কি!

অক্ষয়বটের ইতিকথার আর একটি অধ্যায় শেষ হতে চলল। নন্দীগাঁয়ে আবার দিনের আলো দেবে দেখা! আবার ফুল ফুটবে, পাখি গাইবে গান। আবার আসবে নতুন মানুষ—জাগবে নতুন জীবন। সেদিনের সুরে হয়ত আর পুরানো সুরের স্পষ্ট পরিচয় থাকবে না—থাকবে শুধু করুণ আভাস। পোড়া-ভিটের কালো দাগ যাবে মুছে।

মহাকালের ইতিহাসের সে অধ্যায়ের আর দেরি নেই। অক্ষয়-বটের ডালে ডালে তারই আমন্ত্রণ-লিপি লেখা হয়ে গেছে।

রূপমহলের জীর্ণ প্রকোষ্ঠে শবরী হীরার দীর্ঘশ্বাস আগামী দিনের ইতিহাসের পাতাটা উল্‌টে দিল।

দীঘিতে ঝড়ে পড়া কাঠগোলাপের মাঝে রয়েছে মানস-সরোবরের নীলোৎপলের আবেগ।

নন্দীগাঁয়ের আকাশ বাতাসে তপোমগ্ন রিক্ত ধূর্জটির তপোবনের মহিমা ছড়ানো।

প্রলয়ঙ্করের প্রশান্ত আভাস রয়েছে কি তার আগামী দিনের আলোয়?

॥ সাত ॥

সতী আর সর্বাণী শ্রীপুর থেকে পালিয়ে যাবার পর আরও দীর্ঘ দশটি বছর কেটে গেছে। শ্রীপুব ছেড়ে কোথায় যাবে প্রথমে তারা ঠিক করতে পারেনি। জীবনে ইসালামাবাদ নন্দীগাঁ আর শ্রীপুর ছাড়া আর কিছু চেনেওনি। তবুও একদিন তাদের বেরিয়ে পড়তে হল জীবনের অজানা বন্দরের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে দুই বৃদ্ধ—নবীন বসু আর রজনী-তহসিলদার। পথের সকল দুর্যোগ, বাধা অতিক্রম করে ফতেপুর গ্রামে এসে তারা আশ্রয় নিল। নন্দীগাঁ থেকে ফতেপুর—অনেক—অনেক দূর।

নন্দীগাঁয়ের দুর্যোগের আঘাত অসহায় দুটি নারীকেও ঘরছাড়া করেছে। গ্রামের লোক অচেনা মানুষকে স্থান দিতে চায়নি। অনেক করে একটু আশ্রয় পেয়েছে তারা। অর্থের অভাব ছিল না তাদের—অভাব ছিল শুধু জীবনের একটুখানি শান্তির।

সর্বাণীব জীবনেব সমস্ত আশা ভরসা শেষ হয়ে গেছে। অনেকদিন পর কালীপ্রসাদের খবর তাদের কাছে আসে। বৃদ্ধ হরিচরণ খবর পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে শিশুর মতো কেঁদে উঠল। কালীপ্রসাদকে ছেলেবেলা থেকে দেখেছে—তাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। হরিচরণ এই শোক আর সামলাতে পারে নি। ফতেপুরের মাটিতে নন্দীগাঁয়ের একটি সাধারণ মানুষ নিজেকে নিঃশেষে শেষ করে দিল।

বৃদ্ধ নবীন বসু আর রজনী-তহসিলদার প্রতিটি দিন দিয়ে শুধু জীবনের শেষ অধ্যায় রচনা করে যাচ্ছেন। এই দুই বৃদ্ধের জীবনে

আর কোনো আশা নেই—আনন্দের কোনো ক্ষীণতম আভাসও নেই। কালীপ্রসাদের অনুরোধ রজনী-তহসিলদার নিজের জীবন দিয়ে গ্রহণ করেছেন। নন্দীগাঁয়ের দত্তপরিবারের সুখ দুঃখের ভাগ নিজেও গ্রহণ করেছেন। দিন শেষ হয়ে এল তাঁর—তবু দায়িত্ব এখনও ফুরোয়নি। কার হাতে দিয়ে যাবেন এই গুরুভার! প্রতাপ নারায়ণের এখন আঠারো বছর বয়েস হ'ল। জীবনে দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে সে—কিন্তু বাইরের পৃথিবীকে চিনতে শেখেনি।

মৃত্যুকে প্রাণপণে দূরে সরিয়ে রাখে রজনী-তহসিলদার; বাঁচতেই হবে তাকে। এদের জন্যই বাঁচতে হবে।

ফতেপুরের বাড়ির সামনে মাঝারি রকমের একটা পুকুর ছিল—তারই পাড়ে ছোট একখানি ঘর—রজনী-তহসিলদার থাকেন সেই ঘরে। আজ আর জমাখরচের হিসাবের কোনো তাগিদ নেই। বৃদ্ধ নবীন বসু এসে মাঝে মাঝে বসেন। কারও মুখে কোনো কথা নেই—শুধু উদার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন পুকুরের দিকে। মৃদু বাতাস জলের বুকে যে নিরন্তর কম্পন সৃষ্টি করে তার সঙ্গে কোথায় যেন এই দুই বৃদ্ধের অন্তরের ভাবসংযোগ আছে, মাঝে মাঝে নবীন বসু 'তারা' 'তারা' বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। রজনী-তহসিলদার চোখ বুজে থাকেন। হয়ত বা অতীতের দিকে তার স্বপ্নাতুর দৃষ্টি ফিরে যায়।

প্রতাপ, রুদ্রনারায়ণ আর দর্পনারায়ণ—এরাও মাঝে মাঝে তহসিলদার মশায়ের কাছে এসে বসে। নীরজা ত সুযোগ পেলেই ছুটে এসে কোলে উঠে বসে থাকে। রজনী-তহসিলদার মনে মনে বলে—বড় মায়া ধরিয়ে দিলে এরা। এ যে একেবারে জড়-ভরতের অবস্থা! কিন্তু উপায় কি! তিনি তাদের কাছে নন্দীগাঁয়ের করুণ ইতিহাস বলেন। তাদেরই বংশের অশ্রুসজল ইতিকথা—অবাক হয়ে তারা শোনে।

আর কি কখনও তারা ফিরে পাবে সেই দিনগুলো? প্রতাপ নতুন দিনের স্বপ্ন দেখে। একটি অভাব রয়ে গেল তার জীবনে। বাবার খবর পেলনা কারও কাছে। প্রতিদিন প্রশ্ন জেগেছে তার মনে—মাকে জিজ্ঞাসাও করেছে কিন্তু কোনো জবাব পায়নি সে। অভিমান জাগে তার—অপরিচয়ের গ্লানিতে মন কেঁদে ওঠে।

কালীপ্রসাদ চেয়েছিল—লেখাপড়া শিখিয়ে ছেলেগুলোকে মানুষ করবে। 'আজব শহর' কলকাতায় ওদের পাঠাবার স্বপ্ন দেখেছিল সে। সব ব্যর্থ হয়ে গেল—কালীপ্রসাদও বেঁচে নেই।

সতী জীবনে কোনো বৈচিত্র্য খুঁজে পায়না। নিজের চোখের জল শুকিয়ে গেছে। সর্বাণীর বৈধব্য তার মনে শঙ্কা জাগায়। সমস্ত সংসারের দায়িত্ব তাকে বহন করতে হয়। জমিদার বাড়ির বড় বৌ—এখানে এসে তাকেই সবদিক সামলাতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে মন তার কোথায় উধাও হয়ে যায়।

ফতেপুর গ্রামেও দিনের পর রাত—রাতের পর দিন ফিরে ফিরে আসে। বড়ো একঘেঁয়ে—বড়ো করুণ।

প্রতাপ ভাবে একবার নন্দীগাঁয়ে গেলে হয়না? কেউ ত তাকে চিনবে না। তহসিলদার দাদুর কাছে পুরানো দিনের নানা কথা শুনে বড়ো দেখতে ইচ্ছে করে তার। সেই চন্দনা, ডাকাতে-বিল, দত্তদীঘি, অক্ষয়বট চোখের ওপর অস্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে। যেতেই হবে তাকে।

কালীপ্রসাদের মেয়ে নীরজা বড়ো হয়েছে। বারো বছর তার বয়েস হ'ল! গাঁয়ে নানা কথা উঠবে। সতী তার বাবাকে বলে, 'নীরজার জন্য একটি পাত্র ঠিক না করলে ত গাঁয়ে টেঁকা দায় হবে।'

নবীন বসু কি যে করবেন বুঝতে পারেন না। এখন তাঁর আর চলে বেড়াবার সামর্থ্যও নেই।

রজনী-তহসিলদার বলে, 'অমন করে মেয়ে বিদেয় করতে যেওনা মা—তাতে দুঃখ আরও বাড়ে বই কমে না। এ বাড়ির লক্ষ্মীও

একদিন শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল।' চুপ করে রইল বৃদ্ধ তহসিলদার। রাজেন্দ্রনারায়ণের রক্তাপ্লুত ভীষণ চেহারাটি মনে পড়ল তার।

সবাই জানে তাই সবাই চুপ করে যায়।

ফতেপুর গ্রামে নন্দীগাঁয়ের দত্তপরিবারের ভগ্নাবশেষ শুধু প্রহর গোণে। সন্ধ্যার নির্জনতায় ভোরের আলোয় এদের জীবনে কোনো আনন্দকে বহন করে আনে না।

তবু দিন কেটে যায়।

বৈচিত্র্যহীন আরও কয়েকটি বছর গেল কেটে। দুঃখ আবও গভীর চিহ্ন এঁকে গেল দত্তবাড়ির মানুষগুলোর ওপর।

নবীন বসু আর রজনী-তহসিলদার দুজনেই বিদায় নিলেন সংসার থেকে। প্রতিটি দিন যে উৎকণ্ঠায় এদের দুজনের কেটেছিল তার আজও শেষ হয়নি, বরং আরও বেড়ে গেছে। অভাব দারিদ্র্য কাকে বলে সতী-সর্বাণীকে বুঝতে হয়েছে। কিন্তু যাবার দিন যখন এলো—তখন নবীন বসু ও রজনী-তহসিলদার নিঃশব্দে বিদায় নিলেন। অসহায় দত্তবংশের চোখের জল এদেব বাধা দিতে পারলো না।

এই ত মানুষ! দুদিনের জন্য পান্থশালায় এসে পথশ্রান্তির অবসানে আবার চলে যায় পথ-সর্বস্ব পথিকের মতো।

রজনী-তহসিলদারের মৃত্যু বড়ো করুণ। পুকুরপাড়ের ঘরে সন্ধ্যাবেলা বসে প্রতাপ, রুদ্রনারায়ণ আর দর্পনারায়ণের সঙ্গে গল্প করছে বৃদ্ধ তহসিলদার—নন্দীগাঁয়ের গল্প। রাত হচ্ছে দেখে সতী এসে বলল, 'এবার দাদুকে একটু জিরোতে দাও—কাল আবার শুনো।'

'হ্যাঁ ভাই, বাকিটা কাল হবে,' রজনী-তহসিলদার হুঁকোটা নামিয়ে রেখে বলল।

'আর একটু বলো দাদু,—বড়-মা, আমরা একটু পরে যাচ্ছি, কালাপ্রসাদের ছোট ছেলে দর্পনারায়ণ বলে।

'না ভাই—মা শেষে আমাকেও বকবেন'—

কালীপ্রসাদের ছেলেরা সতীর সঙ্গে গেল। প্রতাপ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তহসিলদাব মশায়কে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা দাদু, বাবা কোথায়?'

চোখ বুজে কি যেন ভাবছে বজনী-তহসিলদার। দীর্ঘশ্বাস চেপে পরে বলল, 'কাল বলব, দাদু।'

আব বলা হয়নি। জীবনে তাব আব কালকের দিনটি এল না। সকালে প্রতাপ এসে দেখে বৃদ্ধ তহসিলদার মশায় স্থির হ'য়ে শুয়ে আছে। নন্দীগাঁয়ের শেষ পুরানো চিহ্নটি মুছে গেল। নিজের কোনো পরিচয়ও তার রেখে যায়নি। এই পরিবারের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে একেবাবে মিশিয়ে দিয়েছিল। দীর্ঘ ষাট বৎসর পর মানুষটি বিদায় নিল দত্তপবিবারের কাছ থেকে—বিদায নিল আত্মীয়-বিহীন পৃথিবী থেকে। দত্তবংশের সম্পদের দিনে—বিপদের দিনে এই বৃদ্ধই ছিল একমাত্র বন্ধু।

ফতেপুরের শ্মশানে নন্দীগাঁয়ের মানুষের চিতা-শয্যা রচিত হল।

প্রতাপের ওপর এসে পড়ল সমস্ত দায়িত্ব। নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তাব পরিচয় একেবারে নেই। সামান্য যা লেখা পড়া শিখেছে তাতে এমন কিছু হয়না যে সমস্ত সংসারের ভার বহন করতে পারে। অথচ না করেও উপায় নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির পর থেকেই ইংরেজরা কেরানী তৈরির যন্ত্র বসিয়েছে এই দেশে। সব কিছু একটু একটু করে শিখে

এবং বেশির ভাগ না শিখে অর্ধাসনে অনশনে বাঙালীকে ক্লান্ত ক্লিষ্ট ক'রে তোলাই ছিল ইংরেজের প্রধানও চরম লক্ষ্য।

প্রতাপ পেল না এই শিক্ষা। নন্দীগাঁ ও ফতেপুর করেই কিশোর প্রতাপ এখন যুবক প্রতাপ হয়েছে। মাকে বলে, 'রোজগারের জন্য বেরিয়ে পড়তে না পারলে আর চলছে না।'

সতীর বুক কেঁপে ওঠে। একমাত্র সন্তান—তার বুক ছেড়ে চলে যাবে! আর কি নিয়ে সে বুক বাঁধবে!

অনেক হাঁটাহাটি করে রাজপুরের জমিদার সেরেস্তায় পাঁচ টাকা মাইনের কাজ পেল। প্রতিদিন তিনক্রোশ হেঁটে যেতে হয়—আবার ফিরেও আসে। নিজের পরিচয় কিছুই দেয়নি। দেবীপ্রসাদ দত্তের ছেলে রাজগঞ্জের জমিদারের সাধারণ গোমস্তা! তবুও ত গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হল। রুদ্রনারায়ণ দর্পনারায়ণও বড় হয়েছে—কিন্তু তাদেরও মানুষ করে গড়ে তোলার কোনো সুযোগ পায়নি সে। নীরজার বিয়ে দিতে হবে। সমাজের মুখ আর বন্ধ থাকবে না।

নন্দীগাঁয়ের আকাশ ও মৃত্তিকা তাকে আহ্বান জানায়। কিন্তু বাস্তবের রূপ সত্য তাকে দূরে রেখে দেয়।

এতদিন কেটে গেল। তবু সর্বাণীর চোখের জল থামেনি। স্বামীকে সে হারালো। দেবতার আশীর্বাদী ফুলের মতো নিষ্পাপ ও শুভ্র মানুষটি অন্ধ উন্মত্ততার যূপকাষ্ঠে নিজেকে বলি দিল। এ পাপের বিচার কে করবে?

সে যুগের মানুষ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়ায়—কিন্তু সন্ধান তার মেলেনি। এ যুগের মানুষও কি পেয়েছে তার জবাব?

এবার আদায়ে বেরুতে হবে প্রতাপকে। রাজপুরে জমিদারির আদায় ভালো হচ্ছেনা। নতুন এই ছেলেটিকে জমিদার মল্লিনাথের বেশ ভালো লেগেছে। প্রতাপকে ডেকে বললেন, 'আজ কয়েক বছর ধরে আয়-পত্র তেমন কিছুই হচ্ছে না। দূরের তালুকের প্রজারা হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। যেমন করে পারো এবার কিছু আদায় করতে হবে। নইলে সরকারের কাছে আর মুখ দেখাতে পারবো না! তোমার মাইনে আরও একটাকা বাড়িয়ে দিচ্ছি। খাজনা ভালো আদায় হলে আরও হবে।'

সরকারের কাছে মুখ দেখানো যাবে না! এই সরকারের হাতে দত্ত-বংশের এত লাঞ্ছনা, এত দুর্যোগ। তারও মাঝে ওই বংশের রক্ত ধারা বইছে। সরকারের নামে তার বুকেও যেন আগুন জ্বলে ওঠে।

পাকাপোক্ত হয়ে বসেছে ইংরেজ সরকার। সিপাহী বিদ্রোহে যে শুভ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল—তাও ব্যর্থ হয়ে গেছে!

নতুন দিনের বক্তিম আলোয় আবার কি কোনো সম্ভাবনা দেখা দেবে!

প্রতাপের দূরে যাবার কথা শুনে সতীর বুক ভেঙে যায়। মাকে ছেড়ে যে কোথাও থাকেনি সে!

প্রতাপ হেসে বলে, 'আচ্ছা মা, আমি এখন বড়ো হয়েছি। আমাকে আর কতো দিন ছোট করে রাখবে?'

চোখের জল মুছে সতী বলে, 'তুই বড়ো হয়েছিস এ আমি ভাবতে পারিনে। আমার যে আর কেউ নেই বাবা!'

সর্বাণী সতীর পাশেই বসেছিল। 'চোখের জল ফেলে ওর অকল্যাণ ডেকে এনোনা দিদি, ভালোয় ভালোয় ও ফিরে আসুক।'

নীরজা আবদার ক'রে বলে, 'আমার জন্য একখানা নীলাম্বরী শাড়ি এনো, দাদা!'

মার চোখে জল—তবুও যেতে হ'ল প্রতাপকে। দু'মাস তাকে বাইরে থাকতে হবে। বাড়ির সব ব্যবস্থা সে করে দিয়েছে।

গাঁয়ের বিপিন মালীকে রেখে গেল বাড়ি পাহারা দেবার জন্য।

সতী ভাবে নন্দীগাঁয়ের ডাকসাইটে রাজেন্দ্রনারায়ণের নাতি আজ রাজগঞ্জের জমিদারের গোমস্তা হয়ে চলেছে। অদৃষ্ট আজ তাদের করেছে পথের ভিখারী।

দেবীপ্রসাদের কথা মনে পড়ে সতীর। প্রতাপের দিকে তাকালেই মনে হয় আবার যেন পুরানো দিনের মানুষটি এসে দাঁড়িয়েছে। বাপের সঙ্গে ছেলের কি অদ্ভুত সাদৃশ্য! দেবীপ্রসাদ আজ সতীর জীবন থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। দুর্যোগের মাঝে যে আশ্রয়, যে অবলম্বন নিয়ে হাসিমুখে সে চলতে পারতো আজ সেই নেই।

রাজগঞ্জের জমিদারের তালুকে আদায়ে গেছে প্রতাপ। 'ঠাকুর আমার ছেলেকে ভালোয় ভালোয় আবার ফিরিয়ে দিও', সতীর আকুল প্রার্থনা।

বিধাতার দরবারে তার কতটুকুই বা পৌঁছল।

অনেক দিন পর চন্দনার ওপর দিয়ে আবার নৌকা চলেছে। রায়পুর, হাজারীগাঁ, পীরপুর গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে চলেছে। নদীর দুপারে ক্ষেত, তারই কিছু দূরে দূরে গ্রামের বসতির চিহ্ন দেখা যায়। নারকেল-সুপারী গাছে ঘেরা ছোট ছোট বাড়িগুলো —প্রতাপের মনে কী এক মোহ জাগিয়ে তোলে।

নৌকা খাতুনগাঁয়ে এসে থামল। এখানে কিছুদিন তাদের থাকতে হবে। রাজপুরের জমিদারের খাজনা এখানে বসেই আদায় করতে হবে প্রতাপের। ধর্মপুর, উদয়পুর প্রভৃতি তালুকের প্রজারা

অনেকদিন ধরে খাজনা দিচ্ছে না। প্রতাপ প্রজাদের খবর পাঠাল।

এই খাতুনগঞ্জে নানা দেশের ব্যাপারীরা আসে নানা সওদা নিয়ে। জিনিস-পত্র বেচা-কেনা ক'রে তারা আবার ফিরে যায়। মাঝে মাঝে যাত্রার আসর বসে বাজারে। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পর গঞ্জের সবাই মেতে ওঠে যাত্রার আসরে।

প্রতাপও মাঝে মাঝে আসরে গিয়ে বসে। এখানে সবাই তাকে সম্মান দেয়। জমিদারকে দেখেনি তারা। প্রতাপ জমিদারের লোক —কিন্তু সবাই তাকেই জমিদার বানিয়ে তোলে। সবার মধ্যে থেকেও সে যেন কেমন আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলে।

গঞ্জের ভিড়ে প্রতাপ খুঁজে বেড়ায় নন্দীগাঁয়ের মানুষ, যদি হঠাৎ কেউ এসে পড়ে! তবুও এত করেও ত খোঁজ মিলে না কারও।

নৌকায় এসে মাঝিদের জিজ্ঞাসা করে, 'ওরে, এখান থেকে নন্দীগাঁ কতদূর কেউ বলতে পারিস?'

বৃদ্ধ রসিক মাঝি বলে, 'এখান থেকে আরও একদিনের পথ হবে, কর্তা!'

প্রতাপ ভাবে খাতুনগঞ্জের কাজ ফুরোলে একবার কি যাওয়া যায় না!

এদিকে প্রজারাও সবাই খাজনা ঠিকমত দিচ্ছে না। জমিদার মল্লিনাথের হুকুম—আদায় ভালো হওয়া চাই। কিন্তু প্রতাপ ত আর পেরে ওঠে না।

প্রজারা কেঁদে বলে, 'হুজুর, দু'সন অজন্মা যাচ্ছে—এবার মোদের রেহাই দিন।'

এদের দারিদ্র্য প্রতাপকেও বিচলিত করে। দারিদ্র্যের দুঃসহ রূপ সেও ত দেখেছে। মল্লিনাথের প্রয়োজন মতো আদায় হ'ল না। তার সঙ্গে যারা এসেছে তারা বলে, 'দু-চার ঘা লাগালে টাকা অমনি বেরিয়ে আসবে।' কিন্তু অভাব-করুণ কণ্ঠ প্রতাপের অজানা নয়। তাই এখানকার কাজ আর এগোয় না। অথচ প্রতাপকে ত এগোতে

হবে। নন্দীগাঁয়ে তাকে যেতে হবে। ওখানকার সবকিছু তার মনকে ঘিরে রয়েছে।

খাতুনগঞ্জ থেকে রসিক মাঝির নৌকা চলেছে। প্রতাপ তাকে বলে, "নন্দীগাঁ হয়ে আমাকে যেতে হবে।'

'সে যে অনেকখানি পথ, কর্তা,' রসিক মাঝি বলে।

'তাহোক,' প্রতাপ যেন কিছুটা অধীর হয়ে উঠে।

নৌকা চলেছে নন্দীগাঁয়ের দিকে। রাতের আলোয় নৌকার মাঝি উজান বেয়ে যেতে যেতে গান ধরেছে—

চাঁদনী রাতে ওগো বন্ধু কোথা তুমি যাও,
আমার নাগর যেথা থাকে, ও তার, পথ কইয়া দাও।

নদীর বুকে রাত্রির নির্জনতায় এ গান বয়ে আনে নাম-না-জানা ফুলের পরিমল। কিন্তু প্রতাপের কাছে আজ এই গানের মর্মকথা না জানাই থেকে যায়। তাকে আজ ডাক দিয়েছে নন্দীগাঁয়ের অক্ষয়বট।

•

শেষপর্যন্ত নন্দীগাঁয় এসে পৌঁছল প্রতাপ। কিন্তু এখানে একটি চেনা মুখও নেই যে, যার সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারে। দীর্ঘকাল পরে আবার নন্দীগাঁয়ে ফিরে এসে তার স্বপ্নের ঘোর যেন অনেকখানি কেটেছে।

ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল অক্ষয়বটের কাছে। পিতৃ-পিতামহের আমলের এই অক্ষয়বট। প্রণাম জানাল তাকে। দত্তবাড়ির পোড়া ভিটি আর নেই—সেখানে গড়ে উঠেছে নতুন পাকা বাড়ি।

আজ তার কোনো অধিকার নেই এই বাড়ির ওপর। বাড়ির পাশেই হীরামহল। এর কথা ত প্রতাপ শোনেনি কারও কাছে গাঁয়ে এসে শুনল নন্দীগাঁয়ের জমিদার এই বাড়িতেই থাকে। দত্ত

বাড়ি খালিই পড়ে আছে। কেন যে পোড়া ভিটির ওপর জমিদার· আবার ঘর তুলেছে তা কেউ জানে না।

হীরামহলের দিকে দৃষ্টি পড়ল প্রতাপের। এমন শ্রীহীন অনাদৃত বাড়ি তার চোখে আর পড়েনি। কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই,—যেন ভূতে পাওয়া বাড়িখানা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

নিজের পরিচয় গোপন রেখে প্রতাপ নন্দীগাঁয়ে এসেছে। এখানে তাকে কেউ চেনার ভয় নেই।

হীরামহলের দোতলার দিকে চোখ পড়তেই দেখল একজন বয়স্কা মহিলা এসে সেখানে দাঁড়িয়েছে। বিগতযৌবনার বার্ধক্যের অন্তরালে অতীতের রূপের ম্লান ছায়া যেন বর্তমান।

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্রতাপ। বৃদ্ধাও যেন উৎকণ্ঠিতভাবে তাকে দেখছে। ওই ত তাকে হাত তুলে দাঁড়াতে বলল! ভেবেছিল এড়িয়ে যাবে, কিন্তু পারলনা সে। হীরামহলের ফটকের কাছে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল।

এতদিন প্রতীক্ষার সার্থক ফল যেন পেয়েছে হীরা। 'খোকা' বলে ছুটে এসেই থমকে দাঁড়াল। কি আশ্চর্য! এমন সাদৃশ্য ত কখনও চোখে পড়েনি। অনেক কালের হারিয়ে যাওয়া মুখখানা ভেসে উঠল হীরার চোখে। দেবীপ্রসাদের সঙ্গে কি অদ্ভুত সাদৃশ্য এই মুখের। রূপনারায়ণও ঠিক এইভাবে দাঁড়াত! অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হীরা। দু'জনের মাঝে এখনও অপরিচয়ের ক্ষীণতম ব্যবধান।

কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্য।

হীরা এগিয়ে এসে প্রতাপের হাত ধরে বলে, 'তুমি কে, বাবা?'

প্রতাপ নিজের পরিচয় গোপন করে বলে, 'আমি রাজপুরের মল্লিনাথ রায়ের তহসিলদার। ফেরার পথে নন্দীগাঁয়ের ঘাটে একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছিলাম। আবার আজই চলে যাব।'

হীরার বিশ্বাস হয় না।

'আমার খোকাকে দেখেছো, বাবা ?' হীরার আকুল প্রশ্ন।

'আমি ত চিনি না, মা, আপনার খোকাকে !'

হীরার সমস্ত বুক ভেঙে কান্না এল।

প্রতাপের মুখে 'মা' ডাকটি যেন তার সুপ্ত মাতৃত্বকে জাগিয়ে তোলে।

'মায়ের কাছে লুকিও না, বাবা—তুমিই আমার খোকা।'

'আপনি ভুল করছেন—আমার মা আছেন। তিনি প্রায় আপনারই বয়সী হবেন।'

হীরা প্রতাপকে ভালো করে দেখে। সংশয় জাগে তার মনে। কিন্তু মায়ের চোখ দিয়ে দেখা। ভুল হয় না তার।

'তোমার পরিচয় ত দিলে না, বাবা', হীরা আকুলভাবে তাকিয়ে আছে প্রতাপের দিকে। তার দু'চোখ ছাপিয়ে অশ্রুধারা নামল।

প্রতাপ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

হীরা এগিয়ে এসে তার হাত ধরল। 'এসো আমার সঙ্গে'—

এ যেন অনুরোধ নয়—আদেশ। এড়াতে পারে না প্রতাপ। নিঃশব্দে হীরামহলে গিয়ে ঢুকল।

ঘরে ঢুকেই দেয়ালে টাঙানো একটি ছবির দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল সে। কে এই মানুষটি !

নিজেকে সামলে নিয়ে হীরাকে বলে, 'আপনি এ গাঁয়ের জমিদার ?'

'আমি জমিদার। না, বাবা, আমি কেউ নই। আমি শুধু আগলে বসে আছি। যার বোঝা তাকে দিয়েই তবে আমার মুক্তি।' প্রতাপের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে হীরা বলে, 'তোমার পরিচয় ত দিলে না !'

'আমার পরিচয় এখানে ভালো শোনাবে না।'

'তবুও বলো—' হীরার আকুলতা ধরা পড়ল।

হীরার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আবার তার চোখ পড়ল ছবিটির ওপর। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলল, 'শুনেছি, আমাদের পূর্বপুরুষ একদিন এ গাঁয়ের জমিদার ছিলেন। আমার পিতা ৺ দেবীপ্রসাদ দত্ত—তাঁকে আমার মনে পড়ে না। আমার কাকার কাছেই আমি মানুষ হয়েছি। জানিনা কোন্ অপরাধে তাঁর ফাঁসি হয়। আর আমার কোনো পরিচয় নেই, মা। আচ্ছা আমি আজ আসি।" প্রতাপ ব্যস্ত হয়ে উঠল।

পায়ের নীচে মাটি যেন কেঁপে উঠল। হীরা আর নিজেকে সামলে নিতে পারে না। চোখের সামনে সবই যেন মিলিয়ে যাচ্ছে, সমস্ত দেহটা যেন টলছে।

প্রতাপ তাড়াতাড়ি হীরাকে ধরতেই সে একেবারে প্রতাপের বুকে ঢলে পড়ল।

কে জানে এরই মাঝে রয়েছে কোন্ অজানা রহস্য। অক্ষয়বটের পাতায় পাতায় নবারুণের আলো কোন্ সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলবে? সে শুধু জানেন বিধাতা আর ঐ নন্দীগাঁয়ের অক্ষয়বট।

হীরার মনের বাঁধ ভেঙে যায়। প্রতাপকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে কেঁদে বলে, 'আমাকে ছেড়ে যাস্‌নে, বাবা। আমি এতদিন ধ'রে তোরই জন্য অপেক্ষা করে আছি। খোকা আমার অভিমান করে চলে গেল। তারপর—' চুপ করে রইল হীরা।

প্রতাপ অবাক হয়ে যায় হীরার ব্যাপার দেখে। ক্ষণিকের পরিচয়ে মানুষ মানুষকে এত আপনার করে নিতে পারে এটা সে ভাবতেও পারে না। কে এই মানুষটি!

'এই গাঁয়ের জমিদার ত সুলতানপুরের রায়বাবুরা?' প্রতাপ প্রশ্ন করে।

'না, সুলতানপুরের পাঁচকড়ি রায় ইজারা নিয়েছিল সরকারের কাছ থেকে—তার হাত থেকে এসেছে আমার হাতে। এ গাঁয়ের জমিদার দত্তরা।'

'আপনি কে ?' প্রতাপের বিস্মিত প্রশ্ন হীরাকে বিব্রত করে তোলে।

'আমি—আমি কেউ না। আমার কোনো পরিচয় নেই। কোনো পরিচয় আমার এ পৃথিবীতে থাকবে না। এ নন্দীগাঁ তোমার, তুমি নিয়ে আমাকে মুক্তি দাও।' প্রতাপ চুপ করে শোনে। হীরা তখনও বলে চলেছে, 'জীবনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে গেলে অনেক হারাতে হয়। অনেক হারিয়েছি—অনেক চোখের জল ফেলেছি। হ্যাঁ, একটি কথা, বাবা। যদি কখনও আমার খোকা আসে তাকে বোলো, এ সংসারে তাকে কিছু কোনোদিন দিইনি – কিছু দেবার মতোও নেই। বোলো, তার জন্য আমি প্রতিদিন কেঁদেছি। চোখের জল ছাড়া আর আমার কিছু সম্বল নেই। আমার কোনো দান তাকে ছোট না করে এ আমি বারবার কামনা করেছি। ভগবানকে ডাকতে পারিনি। জীবনের পাপ সেখানে আমার টুঁটি চেপে ধরেছে।'

প্রতাপ অবাক হয়ে শোনে। রহস্যময়ী এই নারীর কিছুই সে বুঝতে পারলো না। কি একটা ব্যথা যেন লুকিয়ে আছে এঁর মাঝে।

ছবিটির দিকে তাকিয়ে প্রতাপ প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, এ ছবিটি কার, মা ?'

'তোমার বাবার'—বড় সকরুণ চাউনি হীরার।

প্রতাপ এগিয়ে গেল ছবির দিকে।

'কোথায় তিনি ?' প্রতাপ আবার প্রশ্ন করল।

হীরা মাথা নীচু করে বসে আছে। প্রতাপের এ প্রশ্নের উত্তর দেবার শক্তি তার নেই। দেবীপ্রসাদের শেষের দিনগুলো তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তবুও আজ সব হিসাব চুকিয়ে দিতে হবে। চেনা পৃথিবীর বাইরে কোথাও কি একটুখানি স্থান আছে তার জন্য !

'তিনি নেই', যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল হীরার কণ্ঠস্বর।

প্রতাপ ফিরে তাকাল তার দিকে। জীবনে যাকে এতদিন ধরে খুঁজে বেড়ালো আজ তার চিহ্নটুকুও গেছে মুছে। বাবাকে কোনোদিনও দেখেনি সে। কতোদিন কতো লোককে প্রশ্ন করেছে—কেউ তার জবাব দেয়নি। আর—আজ যখন সন্ধান পেল তখন তিনি মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছেন। জীবনের সঙ্গে এত গভীর—এত নিবিড় সম্পর্ক সেই মানুষটিই তার জীবনে রয়ে গেল অচেনা। সমস্ত বুক জুড়ে তার কান্না জেগে ওঠে। মানুষকে ত একদিন যেতে হয়। কিন্তু এমনি ক'রে হারিয়ে যাওয়া যে কতখানি তা কি ক'রে সে বোঝাবে!

চোখের জল আর বাধা মানলো না প্রতাপের। হীরার অসহায় নারী হৃদয়ও চোখের জলের ধারায় সিক্ত হয়ে ওঠে। কাছে এসে বুকের কাছে টেনে নিল প্রতাপকে!

কারও মুখে একটি কথাও নেই। অসহায় শিশুর মতো হীরার বুকে মাথা রেখে প্রতাপ কাঁদে! হীরারও চোখে জল। চোখের জলের ভাষায় তাদের প্রাণের আকুতি পেল প্রকাশ। কামনার যে উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে একদিন দেবীপ্রসাদকে হীরা পথে বার করে দিয়েছিল, সেদিন কি সে নিজেও বুঝেছিল যে সেই আঘাতের শাস্তি তাকে সমস্ত জীবন দিয়ে গ্রহণ করতে হবে! কি সম্পর্ক ছিল তার দেবীপ্রসাদের সঙ্গে! অর্থের স্পৃহাই দেখা দিয়েছিল স্পষ্ট হয়ে। আজ এই চোখে জল আসে কেন! তারও মাঝে যে দেবী হীরা বাস করে তার সন্ধানি সে কোনোদিনও পায়নি। কে তাকে বলে দেবে, 'ওগো, তুমি শুধু পুরুষের লালসার ইন্ধনই জোগাওনি—তোমার যে বড়ো পরিচয়—তা তোমার নারীত্ব। এতদিন যে নারীত্ব ঐশ্বর্য আড়ম্বরের আড়ালে ঢাকা পড়েছিল, আজ ঘটল তার পূর্ণপ্রকাশ।

পরিচয়হীনা পথচারিণী তার পুত্রকে হারিয়ে তারই প্রতীক্ষায় ছিল বসে। সেখানে এল প্রতাপ। পিতৃহারা প্রতাপ। আর হীরা? দেবীপ্রসাদের মৃত্যুতে তার জীবনে যে পরিবর্তন এল—সে পরিবর্তন তাকে ধীরে ধীরে বসাল মায়ের আসনে।

প্রতাপের মধ্যে সে পেল তার পুত্রকে—তার নারী সত্তাকে।

দেবীপ্রসাদের মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেছে। প্রতাপ দীঘিতে স্নান করে এসে উত্তরীয় গলায় ধারণ করল। হীরা আছে তার সঙ্গে সঙ্গে। হীরা প্রতাপের কাছে রহস্যাবৃত হ'য়েই রইল। কতো সে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার পরিচয় ত পেলাম না। আমাদের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?'

হীরা ম্লান হাসি হেসে বলে, 'একদিন যে সম্পর্ক স্বীকার করিনি আজ তারই বোঝা বয়ে যাচ্ছি। এ পৃথিবীতে আমি কোনো পরিচয় নিয়ে আসিনি।'

প্রতাপ বুঝতে পারেনা কেন পরিচয়টুকু গোপন করে যায় এই বৃদ্ধা। বৈধব্যের কঠোর নিয়মকে মেনে চলতে গিয়ে হীরার পুরানো পরিচয় যেন বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে গেছে।

নন্দীগাঁয়ের এই দুটি মানুষের জীবনের দুঃখের অংশীদার এই গাঁয়ে কেউ নেই। শুধু ওই অক্ষয়বট রইল এই চোখের জলের সাক্ষী। তার ডালে ডালে, পাতায় পাতায় রয়েছে আর একটি আগামী দিনের আভাস।

এত দুঃখ, এত কান্না—এরই মাঝে নিরাসক্ত বৈরাগীর মতো দাঁড়িয়ে আছে অক্ষয়বট।

প্রতাপকে এবার ফিরতে হবে রাজপুরে। হীরা অনুনয় ক'রে বলে, 'তুমি এবার দায়িত্ব নাও।'

'কোন্ অধিকারে আসব?'

'তোমার জন্মগত অধিকার নিয়ে।'

'সে অধিকার কি আমার আছে?'

'তোমারই শুধু অধিকার আছে। প্রতি বছর যা খাজনা এসেছে তার সবই আছে। রাজপুরের সব ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। নৌকা পাঠিয়ে দিচ্ছি সবাইকে নিয়ে আসতে। তোমার হাতে সব তুলে দিয়ে তবেই আমার মুক্তি।'

'আপনার অনুগ্রহের দান আমি নেব না! যে দারিদ্র্য, যে লাঞ্ছনা নিয়ে আমাদের জীবন কাটছে তাই হোক আমাদের জীবনের আশীর্বাদ। বেশি কিছু দিলে শুধু প্রলোভনই বেড়ে যাবে।'

'তোমার জিনিস তুমি নেবে এতে প্রলোভনের কিছু নেই। তুমি অমত কোরনা', হীরা আকুল কণ্ঠে বলে।

কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভেবে প্রতাপ বলে, 'বেশ, আপনার আদেশ মাথা পেতে নিলাম কিন্তু আপনিও আমাদের সঙ্গে থাকুন।'

'আমার থাকতে নেই, বাবা- আমি থাকার জন্য আসিনি। যাবার জন্যই আমার এ জীবন। এ পৃথিবীতে আমি কোনো অধিকার নিয়ে আসিনি—আসিনি কোনো দাবি নিয়ে', হীরার প্রতিটি কথা যেন কান্নার মতো বেজে উঠল।

প্রতাপ আর কিছু বলতে পারে না। রহস্যময়ী নারীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

রাজপুরের নৌকা গেল জমিদার মল্লিনাথের জমিদারির আদায় উশুল নিয়ে। প্রতাপ বলেছিল, 'আমি না গেলে ভাববে হয়ত কোনো অন্যায় করেছি, তাই গা ঢাকা দিয়ে আছি।' কিন্তু হীরা সব কিছু যথারীতি ব্যবস্থা করেই রেখেছিল। রাজপুরের নৌকার সঙ্গে

নন্দীগাঁয়ের কাশী মাঝির নৌকা গেল দত্তদের সবাইকে নিয়ে আসতে। প্রতাপ ভাবে, মা যেরকম ভেঙে পড়েছেন—এই দুঃখ সইতে পারবেন ত ?

হীরা প্রতাপের থাকার জন্য দত্তবাড়িতে সব ব্যবস্থা করল। রূপমহলে তাকে রাখতে হীরার বাধে। নিষ্পাপ, শুভ্র মানুষকে এই বিকৃতির মধ্যে টেনে না আনাই ভালো। রূপমহল নামটাও যেন নন্দীগাঁয়ের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায়না। এই নামটাও বদলাতে হবে।

হীরার মধ্যে আজ নারীজীবনের জোয়ার জেগে উঠেছে। এ জোয়ারে উন্মাদনা নেই—পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নেই—আছে শুধু উজাড় করে দেবার মহিমা।

প্রতিদিন সে প্রতাপের সুখ সুবিধার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। মায়ের দায়িত্ব নিয়ে নীরবে সব করে যায়। এখানে কোনো কর্মই তার জীবনে আনে না ক্লান্তি। সংসারে মায়ের জাতটাই বুঝি এরকম !

দত্তপরিবারের আসার আশায় প্রহর গুণছে হীরা। তারপর সে চলে যাবে। কোথায় যাবে এখনও সে জানেনা। আজ আর তার কোনো ভয় নেই, দুঃখ নেই। একদিন যে ঐশ্বর্যের মাঝে ডুবেছিল, সেখানে সে জীবনের কোনো স্বাদ পায়নি। বিকৃতির মোহ তাকে সুন্দরের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। রূপনারায়ণ এলো তার জীবনে—তাকেও সে জীবন দিয়ে গ্রহণ করতে পারেনি। তার জীবন সরে গেল—ওই সন্তানই তাকে দিল অমৃতের সন্ধান, নারীর আপন সাম্রাজ্য। আজ তাই তার কোনো দুঃখ নেই। যে ভোগ-লালসা থেকে তার আবির্ভাব যা তাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আজ সেই পাপ থেকে মুক্তিলাভ করে অজানা অচেনা পথে তাকে বেরোতে হবে। জীবন-সন্ধ্যায়

আর কোনো প্রদীপ জ্বলবে না। ত্যাগের পথ বেয়ে গৌরীশঙ্করের পথে যাত্রা শুরু হ'ল তার,—পঙ্কে দেখা দিল পঙ্কজ। ক্লেদাক্ত জীবনকে আজ মাতৃত্বের পুণ্য বারিসিঞ্চনে অভিষিক্ত করে নিয়েছে। সে রূপনারায়ণের মা—প্রতাপও মা বলে তার বুকে মাথা রেখে শান্তিকে খুঁজেছে। হীরা আজ মা। জীবনে কামনা ছিল মানুষের সমাজ ও সংসার তাকে ডেকে নেয়। কালের প্রতিকূল পরিবেশ তা হতে দেয়নি। তবুও একটি মুহূর্ত—তার জীবনকে স্বর্গীয় সুষমায় ভরে দিয়ে গেল। বাকী জীবনের যাত্রাপথে এই ত তার একমাত্র পাথেয়।

কয়েকদিন পর। ফতেপুর থেকে সতীরা সবাই এসেছে নন্দীগাঁয়ে। আনন্দ ও অশ্রু মেশানো যাত্রা তাদের শুরু ফতেপুর থেকে। নবীন বসু আর রজনী-তহসিলদারের স্মৃতিটুকু রইল সেখানে পড়ে।

নন্দীগাঁয়ে সাড়া পড়ে গেছে -রাণীমা এসেছে। হিন্দু-মুসলমান সবাই ছুটে এসেছে। প্রতাপ শুধু যায় নি। মা তাকে দেখে দুঃখ পাবে বলে প্রতাপ আর নদীর ঘাটে যায়নি।

সতী এসে দাঁড়াল অক্ষয়বটের ছায়ায়। জাগ্রত এই বৃক্ষদেবতা দত্ত পরিবারের করুণ ইতিহাস রচনা করে চলেছে। এই ইতিকথার গৌরব—উচ্ছ্বাসে নয় -আঁখিজলে। সতী এই বৃক্ষ-দেবতাকে প্রণাম করে বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই দেখতে পেল উত্তরীয় গলায় প্রতাপ দাঁড়িয়ে আছে। চমকে উঠল সতী। তবে কি—!

আর সে এগোতে পারে না।

অনেক দিনের উৎকণ্ঠার অনেক অশ্রুসজল মুহূর্তের আজ যেন ঘটল অবসান। সর্বাণী এসে তার হাত ধরল। পাথরের মূর্তির মতো নিষ্প্রাণ নিথর সতী। তার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব মিলিয়ে গেল আশাহীন ভাষাহীন জীবনের তিমিরান্ধকারে।

প্রতাপ এগিয়ে এসে ডাকল, 'মা !'

কোনো সাড়া নেই—বড়ো অসহায় সতী। তার পায়ের নীচের মাটি যেন সরে যাচ্ছে।

সর্বাণীর আকুল ডাকও তার কানে পৌঁছাল না।

'কথা বলো—মা, তুমি কথা বলো', প্রতাপের চোখের জল আর বাধা মানে না।

কে কথা বলবে! কথা যে তার ফুরিয়ে গেছে কোন্ কালে! এতদিন সতী টিঁকে ছিল– বাঁচার মতো বাঁচেনি সে। আজ নিরন্তর টিঁকে থাকার একঘেঁয়েমী থেকে মুক্তির আকুলতা জেগেছে তার মনে।

প্রাচীন অক্ষয়বট স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—নিস্তব্ধ জনতার ভিড়ে। মৌন বনস্পতি যেন নিজের মনে মনে বলে যায়, 'আমি শুধু হারিয়ে যাবার ইতিকথাই রচনা করে গেলাম!' কে তাকে বলে দেবে, 'এই ত নিয়ম, যে লিপ্সা রাজীবলোচন, রাজেন্দ্রনারায়ণ, কালীপ্রসাদের করুণ ইতিকথা রচনা করেছে, সেই লিপ্সা লোভাতুর মনকে শুধু আচ্ছন্ন করে। তারই আঘাত বারবার এসে পড়েছে নন্দীগাঁয়ে। তুমি ত তার নীরব সাক্ষী মাত্র।

প্রতাপ এগিয়ে এসে সতীকে 'মা' বলে জড়িয়ে ধরল। পাথরের বুকে প্রাণ নেই। সেখানে কোনো স্নেহের পরশ আর সাড়া জাগাবে না। প্রতাপের বুকে নিত্যকালের মতো ঢলে পড়ল নন্দীগাঁয়ের বড় মা—সতী।

নন্দীগাঁয়ের ক্ষণিকের হাসি আবার মিলিয়ে গেল। দীর্ঘ তেইশটি বছরের অধীর প্রতীক্ষার ঘটল অবসান।

অক্ষয়বটের ছায়া ঘিরে কান্না জেগে উঠেছে। যারা নন্দীগাঁয়ের রাণীমাকে বরণ করে নিতে এসেছিল তাদেরই সাজাতে হ'ল অশ্রুসজল বিদায়ের ডালা। সর্বাণী লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে। এদের সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই।

নন্দীগাঁয়ের আকাশে বাতাসে শুধু কান্না আর কান্না।

ভিড়ের বাইরে একটি জীর্ণ বকুল গাছকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে হীরা। প্রতাপের হাতে সব তুলে দিয়ে মুক্তি চেয়েছিল সে। কিন্তু মুক্তি পেল কই? সমস্ত অন্তর তার প্রতাপের দিকে ছুটে যায়। তবুও সংস্কারে বাধে। এই সমাজে তার পরিচয় মানুষের মাঝে ত নয়। বুক ফেটে যায়, তবু কাছে গিয়ে প্রতাপকে বুকে টেনে নিয়ে বলতে পারে না, 'ওরে, তোর দুঃখের বোঝা কিছু আমাকেও বইতে দে। আমি আছি।'

গাঁয়ের লোক হীরা বাইজীকে নিয়ে কতো না কাহিনী রচনা করেছে। কতো মুখরোচক গল্প ফেঁদেছে। ওকে দেখলে দূরে সরে গেছে, তাকে কামনা করেছে, ঘৃণা করেছে—কিন্তু তার জীবনের ফাঁক কোথায়—ফাঁকি কোথায়, এ কেউ বুঝলো না। হীরা কি নিজেও বুঝেছিল? শুধু দু'টি মানুষ—মাটির পৃথিবীকে তার কাছে আরও মধুর করে তুলেছে। একজন তার নিজেরই সন্তান রূপনারায়ণ আর একজন প্রতাপ। রূপনারায়ণ দিয়েছে মাতৃত্বের অনুভূতি—প্রতাপ দিল ভাষা।

হীরা এগিয়ে গেল। দুপাশে সবাই দাঁড়িয়ে চোখের জল মোছে। প্রতাপের কাছে গিয়ে স্নেহবিজড়িত কণ্ঠে সে ডাকল 'প্রতাপ।'

চোখের জলে ভেসে গেছে প্রতাপের মুখ।

'এ দুঃখের কোনো সান্ত্বনা নেই, বাবা। কিন্তু সবার দিকে চেয়ে তোমাকে বুক বাঁধতে হবে,' করুণ স্নেহপূর্ণ হীরার কণ্ঠস্বর।

'আমার যে কেউ আর রইল না—'দু'হাতে প্রতাপ মুখ ঢাকল।

সর্বাণী এবার মুখ তুলে তাকালো। কিন্তু কথা আর খুঁজে পায় না। পিতৃহারা, স্বামীহারা সর্বাণী আজ দিদিকেও হারালো সামনে জীবনের দুঃখের দুস্তর পথ—তবু তাকে চলতে হবে। অসহায় প্রতাপের জন্য অসহায় সর্বাণীর বুকভরা ভালোবাসা

প্রকাশের ভাষা পেল না খুঁজে। শুধু করুণ দুটি মমতামাখা অশ্রুসজল চোখে প্রতাপের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর যে তার কোন উপায় নেই।

প্রতাপের চোখের জল হীরাকেও উদ্বেলিত করে তুলেছে। ভুলে গেছে তার জীবনের অগৌরবের ইতিকথা—ভুলে গেছে বর্তমানের দ্বন্দ্ববহুলতাকে। প্রতাপের মাথায় হাত রেখে বলে, 'আমার আর ছুটি নেই, বাবা। আমি আছি তোমার পাশে। দুঃখ আমিও কম পাইনি—হয়ত আরও দুঃখ পেতে হবে। তাকে অস্বীকার করে লাভ নেই তুমিও কোরো না। তুমি বড়ো—আমাদের সবার দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে।'

সর্বাণী অবাক হয়ে শোনে। অপরিচিতা এই নারীটির কোনো পরিচয়ই মনে পড়ছে না। সর্বাণী ভাবে—দত্ত বংশের সঙ্গে এই মেয়েটির সম্পর্ক কি ?

নন্দীগাঁয়ের শ্মশানের আর একটি চিতার আগুন নিবছে। সতী চলে গেল চিরদিনের মতো। প্রতাপ ফিরে এসেছে শ্মশান থেকে। ঘরের দাওয়ায় একা বসে আছে। আজ তার জীবনের আর কোনো অবলম্বন নেই। বড়ো অসহায়—বড়ো একা !

অদূরে দীঘির পাড়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অক্ষয়বট। তারও মাঝে স্তব্ধ কান্নার আভাস। প্রতাপ তাকিয়ে আছে রাত্রির অন্ধকার জড়ানো অক্ষয়বটের দিকে। নন্দীগাঁয়ের দত্ত পরিবারের সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আর কেউ জানুক বা নাই জানুক—অক্ষয়বট জানে এই পরিবারের ইতিহাস। দত্ত বংশের প্রত্যেকটি মানুষ তার মর্মকথা ব্যক্ত করে গেছে তার কাছে। প্রতাপও মনে মনে প্রার্থনা জানায়—'আমায় শক্তি দাও—সাহস দাও।'

নীরজা প্রতাপের হাত ধরে বলে, 'ঘরে এসো, দাদা।' আজ তার প্রতিবাদ করার ভাষাও হারিয়ে গেছে। একান্ত শিশুর মতো নীরজার সঙ্গে সঙ্গে যায়।

বাইরে তখন আকাশে চাঁদ দিয়েছে দেখা। তার আলোর হাসি নন্দীগাঁয়ের বুকেও জেগে উঠেছে। কিন্তু এ আলোর হাসির মূল্য নন্দীগাঁয়ের কেউ কোনোদিন দিতে পারবেনা।

দুঃসহ দুঃখের দিনও কেটে যায়। বারবার হোঁচট খেয়েও পথ চলতে হয়। দুর্যোগের শেষে মেঘের আড়ালে চাঁদ দেয় দেখা। হয়ত ক্ষণিকের—তবুও তার প্রকাশের সত্যকে স্বীকার করে নিতে হয়।

নন্দীগাঁয়ের ওপর যে দুর্যোগের দিন দেখা দিয়েছিল তারপরে আরও অনেকদিন পেরিয়ে গেছে সেই দুর্যোগের এখনও অবসান ঘটেনি। তবুও ক্ষণিকের বিরতি মানুষকে আবার দেখায় পথ তাকে দেয় চলার বেগ।

এত দুঃখের মাঝেও প্রতাপকে বুক বেঁধে দাঁড়াতে হয়। সর্বাণী রুদ্রনারায়ণ, দর্পনারায়ণ, নীরজা—এদের জন্যই তাকে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। নীরজার বিয়ের ব্যবস্থাও করতে হবে।

নানা কানা-ঘুষায় হীরার কথা তার কানে গেছে। কিন্তু লোকে যা বলে তার সঙ্গে হীরার কোনো সাদৃশ্য সে খুঁজে পায় না। সংশয় জাগে তার মনে। সরকারের হুকুম মেনে চলতে হবে—হীরার আদেশ। সরকারের নজরানা পাঠাবেনা বলে ঠিক করতেই হীরা বলে, 'ইংরেজের রাজ্যে বসে ওদের সঙ্গে লড়াই করে ফল হবেনা কিছুই। তোমাদের বংশে এরই জন্য বারবার ওদের প্রচণ্ডতার

আঘাত মেনে নিতে হয়েছে।' প্রতাপ মনে মনে স্বীকার করে না। কিন্তু দেশের ও দশের অবস্থা বুঝেই তাকে চলতে হয়।

হীরার সঙ্গে প্রতিদিন জমিদারির নানা ব্যাপার আলোচনা করতে আসে প্রতাপ। সঙ্কোচের বাধা আর নাই। প্রতাপ যেন হীরার মধ্যে একান্ত আপনার মানুষের সন্ধান পায়। অনেকদিন প্রশ্ন জেগেছে—ভেবেছে এবার হীরার পরিচয় জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু 'বলি বলি' করে আর হ'য়ে ওঠেনি। সর্বাণী জেনেছে সব। কিন্তু প্রতাপকে কিছু বলতে পারেনি। সবাই বলে হীরা পাঁচকড়ি রায়ের রক্ষিতা ছিল। সর্বাণী জানে শুধু তাই নয়—যাক সে আর বলে কাজ নেই।

প্রতাপের আকস্মিক আবির্ভাবে নায়েব বিব্রত হয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। এখন নন্দীগাঁয়ের জমিদারির কাজ দেখে নগেন্দ্র চৌধুরী। সরকার পক্ষ প্রতাপের আনুগত্যে সন্তুষ্ট। বিজয়পুর, দেবীর চর সবই আবার দত্তদের হাতে এল। এরজন্য মোটা টাকা দিতে হ'ল তাদের। টাকা জোগাল হীরা।

গ্রামের সবাই যে হীরাকে নিয়ে নানা কথা বলে তা হীরাও জানে। একদিন এসব কথাকে সে আমলই দিত না। আজ তার ভয় হয়—সঙ্কোচ জাগে মনে। সে ভাবে—যদি প্রতাপের মনেও এ প্রশ্ন জাগে—যদি তাকে ঘৃণা করে! প্রতাপ আসার পর নন্দীগাঁয়ে তাকে আরও কিছু দিন থাকতে হল। এবার যেতে হবে তাকে। কিন্তু যাবে কোথায়! এতদিন ধরে যার জন্যে এই অধীর প্রতীক্ষা—তাকে ত পেল না! কিশোর রূপনারায়ণ কোন্ অভিমানে তাকে ফেলে চলে গেল! কে বলে দেবে সে কোথায়!

হীরাই প্রতাপকে নন্দীগাঁয়ে নিয়ে এল। তারপর থেকেই তার ভাবনা হয়েছে। এখানে যদি সে থাকে ত প্রতাপেরই ক্ষতি। সবাই নানা কথা বলবে। তখন হয়ত প্রতাপও তাকে ঘৃণা করবে।

এখানেই তার ভয় সব চেয়ে বেশি। আবার প্রতাপকে ছেড়ে যেতেও ইচ্ছা করে না। ওকে দেখলেই হীরার কেবলই রূপনারায়ণের কথা মনে পড়ে। কিন্তু—

এবার প্রতাপ কয়েকদিন দেরি ক'রেই এলো। সেদিন তারও মনে জেগেছে প্রশ্ন। রূপমহলে প্রতাপ ছাড়া আর কেউ আসে না। হীরাও আর কাউকে জানে না।

সেদিন এসেই সে বলে, 'আচ্ছা, আপনি ত এতদিন আপনার কথা কিছুই বললেন না।'

হীরা তার মুখ দেখেই বুঝতে পারে—আজ সে প্রত্যেকটি কথা জেনে যাবেই। 'সব তোমাকে বলব, বাবা। কিন্তু সব শুনে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবার আগে আমাকে একটি কথা দিতে হবে,' হীরা নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল।

'মুখ ফিরিয়ে চলে যাবার মতো কি আছে, মা -তবুও বলুন কি কথা দিতে হবে।'

প্রতাপের এই 'মা' ডাকটি হীরার বড়ো ভালো লাগে।

'আমি চলে যাবো। আমার খোকা এলে তাকে বোলো, 'মায়ের ওপর অভিমান করে তাকে কষ্ট দেওয়ায় সন্তানের গৌরব বাড়েনা। প্রতিদিন আমায় কাঁদিয়ে যদি তার কোনো মঙ্গল হয় —তাহলে এই চোখের জলকে আমি আমার প্রাপ্য বলেই স্বীকার করে নেব,' বলেই হীরা চুপ করে বসে রইল।

প্রতাপ একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আপনাকে কথা দিলাম, মা।'

হীরার মনের রুদ্ধ অর্গল গেল খুলে। একে একে নিজের জীবনের সব কথাই সে বলল।

প্রতাপ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শুনছে—রূপকথার রাজ্যের বাইজী হীরার ছবিটা যেন অস্পষ্ট সে দেখতে পাচ্ছে।

হীরা তখনও বলে চলেছে, 'জানি, আমাকে তুমি ঘৃণা করবে। কিন্তু এইটুকু জেনো, তোমাকে পেয়ে আমি ভুলতে চেষ্টা করেছি

সব দুঃখকে—সব পাপকে। আমার খোকাকে আমি তোমার মাঝেই পেয়েছি।'

প্রতাপ কোনো উত্তর দিল না। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। একবার মুখ ফিরাতেই দেখে অশ্রুপ্লুত চোখে হীরা তার দিকেই তাকিয়ে আছে। ফিরে এসে হীরাকে প্রণাম করে বলল, 'আপনার কোন অসম্মান হবে না। আমার মা যে দুঃখ পেয়েছেন তার জন্য আপনাকে কখনও দায়ী করব না। কাউকেই আমি দায়ী করব না। সবাই আজ আমার নাগালের বাইরে। তাই আর কারও কোনো কথাকে আমি মূল্য দিই না। শুধু এইটুকু জানবেন —আমি আপনাকে ঘৃণা করি না।'

হীরার জীবনে এল অপূর্ব একটি মুহূর্ত। এমনি ক'রে মানুষের কাছে তার কোনো মূল্য থাকতে পারে একথা সে কখনও ভাবতে পারেনি। এবার বুক ভরা খুশি নিয়ে বিনা দ্বিধায় চলে যেতে পারবে। প্রতাপকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চোখ বুজে বসে রইল হীরা। মায়ের স্বর্গ যে কোথায়, কোথায় যে নারীর আপন প্রতিষ্ঠা—আজ হীরা তা মর্মে মর্মে বুঝেছে। একদিন দেহে কলুষ লেগেছিল বলে আর কি তার মুক্তি নেই? কামনার ভোগবতী থেকে তাকে উদ্ধার করে আজ যে নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনার মন্দাকিনী ধারায় অভিষিক্ত করে দিল, এই ধূলিময় পৃথিবীতে তার পরিচয় শুধু কি ধুলোতেই মিশে থাকবে!

প্রতাপ চলে যাবার পর হীরার বারবার মনে হ'ল আজকের এই মুহূর্তকে সে কখনও ম্লান হতে দেবে না। প্রতাপের কাছে তার পরিচয় কোনো অগৌরব বহন করে আনেনি। কলুষিত জীবনে এই তার একমাত্র সান্ত্বনা—এই তার একমাত্র আশীর্বাদ।

পরদিন হীরাকে কেউ আর নন্দীগাঁয়ে দেখতে পেল না। যে পরিচয়ের গ্লানিকে বহন করে এতদিন সে মাটির বুকে পড়েছিল, আজ তাকে একেবারে মুছে দেবার জন্য পরিচিত জনতার কাছ থেকে দূরে সরে গেল চিরদিনের মতো। নিজের যা কিছু ছিল— সবই রেখে গেল প্রতাপের জন্য। আর রেখে গেল তার কুণ্ঠিত জীবনের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ।

সেদিন ভোরের আলোয় অক্ষয়বটের পাতায় পাতায় শিশির-বিন্দু অশ্রুর মতো করুণ হয়ে ওঠেনি কি। চন্দনার কলতানে কি আর্তনাদ ছিল না।

নন্দীগাঁয়ের ইতিহাসের পাতায় হীরার স্বাক্ষর কি মুছে যাবে?

॥ আট ॥

নন্দীগাঁয়ের দত্তপরিবারের ইতিহাসের কয়েকটি অধ্যায় শেষ হ'ল। এল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ঔপনিবেশিক স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল তার সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও গৌরবকে। ইংরেজ ভেবেছিল তাদের শিক্ষা দীক্ষা একবার এদেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলেই পরাধীন মানুষ ভুলে যাবে তার প্রাচীন ঐতিহ্য-গৌরবকে। তাই তারা এদেশের মানুষের সামনে তুলে ধরেছিল তাদের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাসের আদর্শকে। প্রাচীন জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে একেবারে মুছে ফেলা যে সম্ভব নয়, এ কথা তারা বুঝতে পারেনি। বাঙালী প্রবল প্রত্যাশা নিয়ে পাশ্চাত্ত্য জীবন-দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হ'ল। নিজের জাতীয় জীবনে তাকে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে পরাধীনতার গ্লানি তাকে পীড়িত ও সচেতন করে তুলল।

কলকাতাকে কেন্দ্র করেই তখন নতুন ভাব-চেতনার আন্দোলন আলোড়ন শুরু হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে স্কুল-কলেজ গড়ে উঠেছে। নতুন রকমের শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

ব্রাহ্ম-আন্দোলন তখন আরও ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বাঙলার বাইরেও এই ধর্মমত ছড়িয়ে পড়েছে। ইসলামাবাদের অনেকে আগেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সবার প্রার্থনায় মিলিত হবার জন্য সেখানে দু'টি উপাসনা মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কলকাতাই শিক্ষিত সমাজের তীর্থক্ষেত্র। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে নতুন জ্ঞান, নতুন অভিজ্ঞতা লাভের জন্য কলকাতাই সবার একমাত্র আকর্ষণ হয়ে উঠল।

নন্দীগাঁয়ে সব খবরই পৌঁচেছে। প্রতাপেরও একদিন কলকাতা যাবার আয়োজন চলেছিল। কিন্তু কালীপ্রসাদের মৃত্যু সবই ব্যর্থ করে দিয়েছিল। দুর্যোগের উপর দুর্যোগ এসে নোঙর-বাঁধা নৌকাকে যেন মাঝ দরিয়ায় ঠেলে নিয়ে গেল।

নিজের জীবনে যে অভাব রয়ে গেল তা আর কখনও পরিপূর্ণ হবে না। ভবিষ্যতে যে কি আছে সে এক ভবিষ্যৎই জানে। রুদ্রনারায়ণ আর দর্পনারায়ণের জন্যও কিছু করতে পারেনি। নন্দীগাঁয়ের বাইরে যে নতুন জগত জেগে উঠেছে—তার সঙ্গে প্রতাপের নেই কোনো গভীর পরিচয়। বংশানুক্রমিক প্রথা মানতে গিয়ে শুধু এই নন্দীগাঁয়ের জমিদারই সেজে বসে আছে। জীবনের এই একঘেয়েমিতে আর কোনো নতুন সুর বাজে না। তবু মানুষ ত চায় বৈচিত্র্যকে। নন্দীগাঁয়ের জমিদার প্রতাপনারায়ণ দত্ত—বৈচিত্র্যের কোনো আভাস পেল না তার জীবনে।

নীরজার বিয়ের ব্যাপারে সর্বাণী অনেকবার বলেছে। অনেক চেষ্টার পর কমলপুরে অঘোর গুহের ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা একরকম ঠিক করা হয়েছে। নন্দীগাঁয়ের মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে। অনেকদিন আগে আর একটি মেয়েও গিয়েছিল। সেদিন সমাজ সংস্কারের চিতাগ্নিতে আহুতি দিতে হয়েছিল নিজেকে। লক্ষ্মীর সেই বেদনাময় করুণ ইতিহাস আজও কেউ ভোলেনি।

রাতের পর দিন—দিনের পর রাত। বড়ো ক্লান্ত একঘেঁয়ে জীবন কাটে এই নন্দীগাঁয়ে। মাঝে মাঝে প্রতাপের মনে পড়ে হীরার কথা। বিরাট এই পৃথিবীতে ক্ষুদ্র একটি মানুষ কোথায় যে মিলিয়ে গেল।

লতায় পাতায় আবার দেখা দেয় ফাল্গুন দিনের রক্তিম আভাস—অরণ্য গেয়ে ওঠে গান। কিন্তু জীবনে তার কোনো আভাস নেই।

সন্ন্যাসী অক্ষয়বট—আত্মসমাহিত অক্ষয়বট- যেন যুগব্যাপী নিস্তব্ধতার তপস্যায় মগ্ন।

আরও কিছুদিন পেরিয়ে গেল। নীরজার বিয়ে হ'ল। সর্বাণী নিজে মেয়ে পছন্দ করে প্রতাপেরও বিয়ে দিল। নন্দীগাঁয়ের দত্ত-বাড়িতে আবার যেন মেঘের ফাঁকে রৌদ্রের মতো এক ঝলক খুশির হাসি দিল দেখা। দেবীপ্রসাদ যে পরিবারে ভাঙন ধরিয়েছিল তার ওপর বাঁধ বাঁধা হ'ল প্রতাপের সময়। সর্বাণী আজ দত্তবাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী। আজ সে-ই নন্দীগাঁয়ের রানী-মা। পিতৃমাতৃহীন প্রতাপের একমাত্র সহায় সে। পরিবারের বাঁধন তাই আলগা হতে পারেনি। নন্দীগাঁয়ের বৃদ্ধ বনমালী দত্তবাড়ির বন্ধু, ভৃত্য, অভিভাবক সবই। গাঁয়ের হিন্দু-মুসলমানরাও একসঙ্গে প্রতাপের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের যত আবেদন-নিবেদন সর্বাণীর কাছে—তার মীমাংসাও মাথা পেতে স্বীকার করে নেয়। একদিন এই দত্তবাড়ির নিভৃত একটি কোণে যে ভীরু সর্বাণী—সতী ও কালীপ্রসাদের স্নেহশীতল ছায়ায় জীবনের মধুর ক্ষণগুলি লাভ করেছিল আজ সে সর্বাণী নেই। বহু ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখে জর্জরিত সর্বাণী আজ শুধু যেন তার সন্তানদের জন্যই টিঁকে আছে। কালীপ্রসাদের মৃত্যুতে তার জীবনে যে আগুন জ্বলেছিল সে আগুন নেবেনি। অন্তর তার দগ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু বাইরে তার অগ্নিশ্বাস চাপা থাকে।

রূপমহলের দরজা জানালা বন্ধ। ওখানে কেউ থাকে না। দেওয়ালের গায়ে গায়ে বট-অশ্বত্থের উড়ো বীজের গাছ গজিয়েছে। ফাটল ধরেছে রূপমহলের দেয়ালে। বছরে একটি দিন প্রতাপ রূপমহলের ঘরগুলো খোলে। একবার গিয়ে দাঁড়ায় দেবীপ্রসাদের অয়েল পেন্টিং-এর সামনে। অচেনা জীবনদাতার ছবির মুখোমুখি

দাঁড়িয়ে চোখের জল এসে পড়ে। পাশেই হীরার ছবি। যে হীরাকে প্রতাপ দেখেছে এ সে হীরা নয়। ছবির হীরা—বাইজী হীরা। দুটো ছবিই ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে।

এমনই একটি দিন প্রতাপ রূপমহলের দরজা খুলে দেবীপ্রসাদের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আপন মনে বলে চলেছে, 'জীবনে তোমায় কখনও দেখিনি—কেন তুমি এমনি ক'রে দূরে চলে গেলে!' হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন বলল, 'আসতে পারি?'

প্রতাপ পিছন ফিরে তাকাল। চমকে উঠল লোকটিকে দেখে। কারও মুখে কোনো কথা নেই। দুজন দুজনকে দেখে যেন বিস্ময়াবিষ্ট। শুধু নীরবে তারা প্রশ্ন জানায়। দেবীপ্রসাদের ছবি, প্রতাপ আর এই আগন্তুক মিলে একাকার হয়ে গেল। দুজনেই ভাবে—একি সম্ভব?

প্রতাপ নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। চোখে মুখে তার স্থির বিস্ময়ের চিহ্ন আঁকা।

কিছুক্ষণ পর—রূপমহলের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে প্রতাপ জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি কাকে চান?'

আগন্তুক কিছুই বলতে পারে না। ভাষা তার হারিয়ে গেছে।

প্রতাপ আবার জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি কে?'

'আমারও সেই প্রশ্ন,' আগন্তুক হেসে বলে।

'আমার নাম প্রতাপনারায়ণ দত্ত—ঐ পাশেই আমার বাড়ি।'

'আপনিই নন্দীগাঁয়ের জমিদার প্রতাপনারায়ণ?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, এ বাড়িতে যিনি থাকতেন তিনি কোথায়?' আগন্তুকের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।

'তাঁর সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?'—প্রতাপ যেন একটু বিচলিত হয়ে উঠে।

'তিনি আমার মা।'

রূপমহলে আবার নিস্তব্ধতা ফিরে এল। প্রতাপ তাকিয়ে আছে নতুন মানুষটির দিকে। কিন্তু—

'তুমি—রূপনারায়ণ?' প্রতাপের কণ্ঠ গম্ভীর হয়ে উঠল।

'আপনি কি করে জানলেন আমার নাম? নিশ্চয় মা বলেছেন—কোথায় তিনি?' রূপনারায়ণ ব্যাকুল হয়ে উঠে।

'কোথায় ছিলে এতদিন?'

রূপনারায়ণ চুপ করে রইল।

প্রতাপের মনে পড়ে হীরার চলে যাবার দিনের কথাগুলো: 'খোকা এলে বোলো মাকে দুঃখ দিয়ে কি শান্তি সে পেলে বোলো তার জন্য আমি প্রতিদিন কেঁদেছি।' এই সেই রূপনারায়ণ,—যার সঙ্গে তার একটি রক্তের সম্পর্ক রয়েছে।

সতীর সন্তান প্রতাপ আর হীরার সন্তান রূপনারায়ণ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—পেছনে দেবীপ্রসাদের ছবি। প্রতাপ আর একবার ছবির দিকে তাকাল। ঝড় উঠেছে তার মনে—বুকটা যেন একবার কেঁপে উঠল। নিজেকে আত্মস্থ করে নিয়ে আবার সে জিজ্ঞাসা করে, 'কেন চলে গিয়েছিলে?'

রূপনারায়ণ একবার মুখ তুলে তাকাল প্রতাপের দিকে। কি বলবে সে! তার জীবনের প্রতিটি অণুতে অণুতে যে ভোগ-বিকৃতির ছাপ তাকে ত সে মুছে ফেলতে পারে না!

'কেন গিয়েছিলাম? না গিয়ে উপায় ছিল না। ছেলেবেলা থেকে যে পরিবেশকে আমি দেখেছি তাতে নিজের সম্বন্ধেই আমার জেগেছে প্রশ্ন, অথচ সে প্রশ্নের কোনো উত্তর আমি পাইনি। আমার মা—আমি তাঁকে যে ভাবে পেতে চেয়েছি—সে ভাবে পাইনি—' রূপনারায়ণ হঠাৎ থেমে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

অক্ষয়বটের একটি ডাল নুয়ে পড়েছে, এই ঘর থেকেই দেখা যায়। এই দু'টি মানুষের জীবন-দোলায় ডালটিও যেন দোলা খেয়ে গেল।

'তারপর ?' প্রতাপ অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করে।

'তারপর একদিন পালিয়ে চলে গেলাম। নিজের কোনো পরিচয় বহন করে নিয়ে যেতে পারিনি। ছোট ছিলাম—তাই বড়ো ভয় হত। ইসলামাবাদে এক ভদ্রলোকের আশ্রয় পেলাম। তিনি নিয়ে গেলেন কলকাতায়। সেখানে গিয়ে দেখলাম এক নতুন জগৎকে। কিছুটা লেখাপড়াও শিখেছি। টাকাও উপার্জন করেছি। কিন্তু যেখানেই যাই নিজের পরিচয়ের গ্লানিই বড়ো হয়ে ওঠে—কিছু বলতে পারি না। দূরে থেকেও বারবার মনে হয়েছে মার কথা। তাঁকে নিজের কাছে খুব কমই পেয়েছি। যতটুকু পেয়েছিলাম তার মধ্যে মিথ্যে ছিল না। তবুও আচ্ছা, কোথায় তিনি ?'

'চলে গেছেন—কাউকে কিছু না বলে চলে গেছেন। বড় ভুল করেছিলে ভাই। তুমি যাঁকে পেয়েছিলে—আর যিনি তোমার জন্য চোখের জল দিয়ে প্রতিদিন প্রতীক্ষা করে ছিলেন -এ দুজনের মাঝে পার্থক্য অনেকখানি।' প্রতাপের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল।

রূপনারায়ণের চোখে জল। সব হারিয়ে গেল তার।

প্রতাপ আবার বলে, 'আমি দেখেছি তাঁকে—এই গাঁয়ে আমিও একদিন অতিথির মতোই এসেছিলাম। তিনিই আমাকে ডেকে নিয়েছিলেন বুকে। তোমার অভাব তিনি আমাকে দিয়ে মেটাতে চেয়েছিলেন। জানো, তোমার আমার জন্মরহস্য একসূত্রেই বাঁধা !'

রূপনারায়ণ বিস্ময়-ভরা চোখে প্রতাপের দিকে তাকাল। প্রতাপ হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। রূপনারায়ণ তার কাছে এগিয়ে গেল।

দেবীপ্রসাদের ছবি দেখিয়ে প্রতাপ বলল, 'এই ছবির দিকে তাকিয়ে দেখ।'

রূপনারায়ণ এই ইঙ্গিত বুঝতে পারে।

দেবীপ্রসাদ তাকে কাছে টেনে নিয়ে, বলে, 'আমরা দুজনেই তাঁকে জানিনি—চিনিনি। আজ আমাদের কেউ নেই। তোমার জন্য এতদিন আমি অপেক্ষা করে আছি। তুমি আমার ভাই।'

রূপনারায়ণ প্রতাপের পায়ের ধুলো নিয়ে বলে, 'আমার তোমার মাঝেই এই পরিচয়ের রহস্য থাক ঢাকা। সমাজ ত কখনও স্বীকার করবে না আমাদের সম্পর্ক।'

'তুমি আমার ভাই—এই সম্পর্ক আমরা দুজন কখনও যেন না ভুলি।' প্রতাপের কণ্ঠে স্নেহের সুর বেজে উঠল।

'আমি কখনও ভুলব না কিন্তু -'

'কিন্তু কি ?'

'আমার এমন কোনো পরিচয় নেই যা নিয়ে মানুষের সামনে দাঁড়াতে পারি।' রূপনারায়ণের কণ্ঠে কুণ্ঠা জাগে।

প্রতাপ তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, 'মহাভারতের কর্ণ বলেছিলেন, 'দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং হি পৌরুষম্' মানুষের পরিচয় তার মনুষ্যত্বের গৌরবে।'

বাঙ্‌লার সমাজে তবুও রূপনারায়ণের পরিচয়ের গ্লানি মুছে যাবে না। হীরা বাইজীর ছেলে জন্মলগ্নে যে অভিশাপ বহন করে এনেছে, চিরদিনের জন্য সে অভিশাপের বোঝা তাকে বইতে হবে। এই সমাজে আজ মানুষের পরিচয় বড়ো নয়—বড়ো পরিচয় ঐশ্বর্য সম্পদের। অর্থ-কৌলীন্যের জীর্ণ জড় সংস্কার আর সব পরিচয়কে ছোট করে দিয়েছে। তাই পরিচয়হীন নিষ্পাপ সত্যকাম ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে আবির্ভূত হয়ে ব্রহ্মর্ষি গৌতমের স্বীকৃতি পেলেও তাঁর শিষ্যদের তীব্র বিদ্রূপ-বাণকে এড়াতে পারেননি। আজ প্রতাপ রূপনারায়ণকে ভাই বলে বুকে টেনে নিলেও সমাজ ত তাকে স্বীকার করবে না।

রূপমহলের নির্জনতায় শুধু দুটি মানুষ তাদের দুজনের অব্যক্ত বেদনার সহমর্মী হয়ে রইল। বাইরের পৃথিবী জানল না এই দু'টি মানুষের জীবনের নিগূঢ় রহস্য।

প্রতাপের আরও দায়িত্ব রয়েছে। রূপনারায়ণের সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য বন্ধনের গ্রন্থি হীরাই বেঁধে দিয়ে গেছে। রূপনারায়ণকে বলে, 'মার যা ছিল তা তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন। আমার যা

আছে তার সবই তাঁরই দান। এতে তোমারও অংশ আছে। তাছাড়া ইসলামাবাদের হীরামহল আর এই রূপমহল এও তোমার। আমি তোমাকে তোমার অংশ দিচ্ছি—তুমি গ্রহণ করো।'

'আমার কেউ নেই—কিছুর দরকারও নেই। ওসব তোমারই থাক যদি ভালো মনে করো, মার নামে ওই হীরামহল—কোনো সদুদ্দেশ্যে দান করে দিও। আমি জানি ওখানে বাস করতে তোমার বাধবে—,' অভিমানের সুর বেজে উঠল রূপনারায়ণের কণ্ঠে।

'কেন তুমি নেবেনা? তোমার সংসার আছে—তারও একটা ব্যবস্থা করতে হবে ত?'

'মানুষকে প্রতারণা করতে চাইনে—তাই ঘর বাঁধা আর হ'ল না। নিজের জন্য আমার চিন্তা নেই—দিন আমার কেটে যাবে। তুমি শুধু আশীর্বাদ কোরো, জন্মক্ষণের গ্লানিকে যেন ভুলে যেতে পারি।'

'তোমার জীবনে আমার আশীবাদের প্রয়োজন নেই ভাই। মাকে মনে কোরো—জীবনের সমস্ত দুঃখ, গ্লানি মুছে যাবে। আমি দেখেছি তাঁকে তাঁর ভালোবাসাও পেয়েছি। আমি জানি, তোমার অকল্যাণ কখনও হবে না।'

প্রতাপ ও রূপনারায়ণ দুজন রূপমহল থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। বাড়ির ঝি চাকররা দুজনকে দেখে চমকে উঠল। বড় কর্তার সঙ্গে নতুন বাবুর মুখের কি আশ্চর্য মিল!

দত্ত-দীঘির পাড়ে অক্ষয়বটের পাতায় পাতায় আলোর হাসি জেগে উঠেছে। ডালে ডালে অজানা হাওয়া অকারণ খুশির দোলা দিয়ে যায়। সেই দোলায় দীঘির জলে আলো-ছায়ার দোলা জাগে।

রূপনারায়ণকে নিয়ে প্রতাপ অক্ষয়বটের ছায়ায় এসে দাঁড়াল। বুক ভেঙে কান্না ছাপিয়ে ওঠে তার। অক্ষয়বটের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ধীরে ধীরে বলে, 'এখানে বাবা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ

করেছিলেন—এখানেই হারিয়েছি আমার মাকে—আর এখানেই মাতৃহারাকে মা টেনে নিয়েছিলেন তাঁর বুকে। এই অক্ষয়বট নন্দীগাঁয়ের দত্তপরিবারের সুখ-দুঃখের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। কতো চোখের জল, কতো কান্না এই বনস্পতিকে ঘিরে আছে।'

রূপনারায়ণও নানা জীবনের সুখ-দুঃখের দেবতা অক্ষয়বটকে জানাল তার অকুণ্ঠিত প্রণাম।

দত্তবাড়িতে এসে বসল রূপনারায়ণ। একদিন দেবীপ্রসাদ নন্দীগাঁয়ের মায়া কাটিয়ে হীরা-বাইজীর রূপ লালসায় আপনাকে দিয়েছিল আহুতি। আর আজ সেই হীরার সন্তান রূপনারায়ণ দত্ত-বাড়িতে এসেছে।

যে বিচিত্র নিয়মে পৃথিবী চলেছে, এও অনেকটা যেন তাই। অপ্রত্যাশিত কিন্তু অবাঞ্ছিত নয়।

প্রতাপ রূপনারায়ণকে রেখে দিল। এদিকে নন্দীগাঁয়ে সবার মনে প্রশ্ন জেগেছে। জমিদারের ভয়ে কেউ কিছু বলতে সাহস করেনি। গাঁয়ের বুড়োবুড়িরা বলাবলি করে, 'ও নিশ্চয় ওই বাইজীর ছেলে। কর্তার সঙ্গে কেমন চেহারার মিল দেখেছ? বলি বাবা, আমাদের চোখে ধুলো দিতে পারবে না।'

দুদিনেই গ্রামে নানা কথা উঠেছে। বামুন-কায়েতরা বসে গেল পরামর্শ করতে। দ্বারিক শিরোমণি, মহিম আচার্যরা নেই। কিন্তু তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে রয়েছে ক্ষেমেশ পণ্ডিত, সর্বেশ্বর ন্যায়-বাগীশের দল। সমাজের মোড়ল এরাই। সর্বেশ্বর ন্যায়-বাগীশের বিধবা কন্যার তাঁতী-অপবাদ ছিল বলেই তিনি সব সময় ওৎ পেতে থাকেন, আর কারও কোনো ত্রুটি খুঁজে পান কি না। নন্দীগাঁয়ের ন্যায়-অন্যায়, স্খলন-পতন সব তার নখদর্পণে। কালীপ্রসাদের সময়

সর্বেশ্বর নন্দীগাঁয়ে এসে বাস করতে থাকেন। ধীরে ধীরে নিজের চক্রান্ত ও কূটবুদ্ধির বলে সমাজের হর্তা-কর্তা হয়ে বসেন। ক্ষেমেশ পাণ্ডিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ। নবজাতকের ঠিকুজী তৈরি করাই তার একমাত্র পেশা। মাঝে মাঝে অনেকের শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে থাকেন। নিজের দারিদ্র্যের জন্য সর্বেশ্বরের মন রেখে চলতে হয়। সেদিন সর্বেশ্বর দুশ্চিন্তায় হাঁড়িপানা মুখ করে বলেন, 'বলি, বেউশ্যের ছেলের গলা ধরে বেড়ানো—এতে কি মান বাড়ে? আর তাতেও যদি শেষ হ'ত—তা নয়, আবার ঘরে এনে তোলা—একসঙ্গে বসে খাওয়া—এতো বাড়াবাড়ি তো ভাল নয়! জমিদার বলে ত মাথা কিনে নেয় নি?'

পুব-পাড়ার মহেশ চৌধুরী সোৎসাহে বলে ফেলল, 'বাপ ত মরেছে গাছতলায়—ও পচবে নর্দমায়। মা মরার দিন দেখলে ত—বাইজীর কোলে পড়ে কি কান্না! ওই সময়—কোথাকার ইয়ে একটা এসে ছুঁয়ে দিল—আর অমনি ঢলে পড়া! এ হলে ধম্ম কম্ম ছেড়ে শুধু ওই ইয়ে ক'রেই চলবে!'

কথা শেষ করতে পারল না—প্রতাপ এসে দাঁড়ালো তাদের মাঝে। মহেশ সেই যে বোকার হাসি হেসে হাঁ করে বসে আছে আর মুখ বন্ধ করার কথা মনেই নেই। কথার মোড় ঘুরিয়ে সর্বেশ্বর বলেন, 'এই যে বাবাজী, এসো, এসো, এতক্ষণ তোমার কথাই হচ্ছিল। তুমি আছো বলেই নিশ্চিন্তে আছি। তাই সবাই বলছিল যে, এ যেন রামরাজ্য। আমি বলি রোসো, আরও কত দেখবে। এখন বাবাজীর বন্ধু এসেছেন—তাই একটু ওদিকেও দেখতে হচ্ছে। নয়ত ওর যে প্রজা-অন্ত প্রাণ--কি বল, বাবা।'

প্রতাপ তার কথার কোনো জবাব দিল না। সর্বেশ্বর আর চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বলে,' 'আপনাদের আলোচনা সব আমি শুনেছি। ভেবেছিলাম আগেই বলব, কিন্তু 'বলি বলি' করে আর বলা হয়নি। আজ নিজের কানে শুনে বুঝেছি—আপনাদের মন বড়ো ছোট। প্রয়োজন হলে আপনারা মানুষের চরম ক্ষতিও করতে পারেন। দুটো কথা বলে যাই, আমার জমিদারিতে আমাকেই

নিন্দা করবেন—এ আমি আর বরদাস্ত করব না। আর যাঁর নাম করে আপনারা এত বিষোদ্গার করছিলেন তাঁর পায়ের ধুলো নেবার যোগ্যতাও নেই আপনাদের। তাঁর সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করা চলবে না।'

প্রতাপ আর একমুহূর্তও অপেক্ষা না করে চলে এল। রূপনারায়ণ দূরে গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিল। অন্ধকারে তাকে কেউ দেখতে পায়নি। দুজনে বাড়ির দিকে ফিরছে। কারও মুখে কোনো কথা নেই।

ন্যায়বাগীশের সভা সেদিন তেমন আর জমল না। হারান দত্ত টিপ্পনি কেটে বলে, 'চৌধুরির অত না চেঁচালে হত না? সবার মুখ ত ভালো করেই চিনে রাখল—এবার ঠ্যালা সামলাও।'

গোবর্ধন প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, 'আমি ভাই, ছিলাম না।'

'আরে তুমিই ত সবার আগে এসে বসেছিলে—বিপিন ওরা পালিয়েছে বুঝি?' হারানও উঠে যাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে।

সর্বেশ্বর অন্ধকার পথের দিকে গলা বাড়িয়ে তাকিয়ে বলেন, 'হক কথা বলতে ব্রহ্মাকেও ছাড়ি না—তা আবার এই প্রতাপ দত্ত, ছ্যাঃ।'

এ কথায় কারও তেমন সায় পেলেন না সর্বেশ্বর। তিনিও ছাড়ার পাত্র নন। ক্ষেমেশকে বলে দিলেন, 'ছোট গিন্নীর পুজো করতে যেওনা ক্ষেমেশ।'

ক্ষেমেশ পণ্ডিতের মাথায় বজ্রাঘাত হলেও এত দুঃখ পেতেন না। করুণভাবে তিনি বলেন, 'জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া!'

'আমরা আছি কেন? বুঝলে ক্ষেমেশ, এত পাপ—তার ভোগ করতেই হবে, তুমি ভয় পেও না।'

এ কথার জবাব দেবার সাহস নেই ক্ষেমেশের। একদিকে জমিদার আর একদিকে সমাজের মোড়ল সর্বেশ্বর। সবাই জানে জমিদার আর ব্রাহ্মণই চালায় সমাজকে। নন্দীগাঁয়ে হয়েছে তার উলটো।

ক্ষেমেশ বাড়ি ফিরে দেখে দত্তবাড়ির বনমালী বসে আছে। সাপের গায়ে পা পড়লে যেমন হয় ক্ষেমেশেরও তাই হ'ল। বনমালী দেখতে পায়নি ভেবে চুপিচুপি আবার সে বেরিয়ে যাচ্ছিল। অন্ধকারে আঁচ করে বনমালী হাঁক দিল, 'কে যায়, ঠাকুর নাকি ?'

পা দুখানা থরথর করে কাঁপছে। ভগবান যদি সর্বেশ্বরের মতো খাওয়া-পরার ব্যবস্থাটা করে দিতেন!

ক্ষেমেশ পণ্ডিত ফিরে আসতেই বনমালী বলল, 'মা বসে আছেন ঠাকুর। এই শনিবার অমাবস্যা তিথি—তিনি পূজো দেবেন বলে মানৎ করেছেন। পূজোর জন্য কি কি যোগাড় করতে হবে তার ফর্দ দিয়ে আসবে।'

'তোমাকে বলে দিলে হ'ত না, বনমালী,' অসহায় ক্ষেমেশের কণ্ঠ যেন কান্না-জড়ানো।

বনমালী বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'দু'ঘণ্টা বসে আছি তোমার জন্য। আমি মুখ্যু মানুষ--অত মনে রাখতে পারবো না। আর তোমায় নিয়ে না গেলে মা চটবেন।'

উপায় নেই। ক্ষেমেশ পণ্ডিতকে যেতে হল। মনে তার ভয়—যদি সর্বেশ্বর জানে!

জমিদার বাড়ি যেতে সর্বেশ্বরের বাড়ির সামনে দিয়েই যেতে হয়। বনমালীর পাশে পাশে পাশ কাটিয়ে যাবে ভেবেছিল -কিন্তু হ'ল না।

সর্বেশ্বরের বাড়ির বৈঠকের জের তখনও চলছে। কথা কইতে কইতে অন্ধকার পথের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সর্বেশ্বর চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'কে হে, কে যায় ?'

বনমালী পথ থেকেই জবাব দিল, 'ছোট মার মানতের পূজোয় পণ্ডিত মশায়কে নিয়ে যাচ্ছি।'

ত্রেতাযুগে সীতার মান রাখতে গিয়ে ধরণী দ্বিধা হয়েছিল কিন্তু মা বসুমতী ক্ষেমেশের বেলায় দূরে সরে রইলেন। পণ্ডিত মশায় বুঝলেন আর তাঁর রক্ষে নেই।

দত্তবাড়ি গিয়ে একেবারে ভেঙে পড়লেন সর্বাণীর কাছে। সর্বাণী তাকে যত জিজ্ঞাসা করেন ততই তিনি 'হাউ মাউ' করে কাঁদেন। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সব কথা বললেন সর্বাণীকে। সর্বাণী গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর ক্ষেমেশকে বলে, 'আপনি এখন যান পণ্ডিত মশায়, আমি পরে খবর পাঠাব।'

ক্ষেমেশ পণ্ডিত যেন প্রাণ ফিরে পেলেন।

প্রতাপ বাড়ি ফিরেই সর্বাণীকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি চুপ করে বসে আছ যে, ছোট মা!'

সর্বাণী গম্ভীর হ'য়ে বলে, 'রূপনারায়ণের ব্যাপার নিয়ে সর্বেশ্বর ঠাকুর ঘোঁট পাকাচ্ছে। ব্রাহ্মণদের এ বাড়িতে নাকি পুজো করতে দেবেনা।'

প্রতাপের পা থেকে মাথা পর্যন্ত রাগে জ্বলে উঠল। 'আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করছি' বলেই বেরিয়ে গেল। সর্বাণী পেছন থেকে ডাকছেন, 'ওরে প্রতাপ, শোন্-শোন্!' প্রতাপ তখন চলে গেছে।

সর্বেশ্বর আবার জমিয়ে বসেছেন। গাঁয়ের আরও পাঁচটা বিষয়ের বিচার বিতর্ক হচ্ছে। নন্দ কামারের ছেলে মধু কৈবর্তের মেয়ে দুলিকে নিয়ে পালিয়েছে। অনেকদিন থেকে দুলির ওপর সর্বেশ্বরের নজর ছিল। আজ এরকমভাবে পালিয়ে যাওয়াতে তিনি আরও খেপে উঠে নন্দ কামারকে শাসাচ্ছিলেন। এমন সময় প্রতাপ আবার সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল। সর্বেশ্বরকে কোনো কথা বলতে না দিয়ে একেবারে তার হাত ধরে বলল, 'উঠে আসুন এদিকে।'

নন্দ কামার আর মধু ছাড়া আর সবাই পালিয়েছে। সর্বেশ্বর ভয়ে কেঁদে ফেলল। 'আমি কিছু বলিনি, বাবা'. সর্বেশ্বর মিনতি করে বলে।

'ওরকম কাঁদলে চলবেনা—আমার জায়গায় বসে আমার বাড়ির পুজো বন্ধ করবার সাহস আপনি কোথায় পেলেন?'

সর্বেশ্বর-গিন্নী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রতাপের হাত চেপে ধরে বল্লেন, 'বুড়ো মানুষটাকে মেরে ফেল না বাবা, তোমার পায়ে পড়ি।'

'আপনাকে নন্দীগাঁ ছেড়ে যেতে হবে কালই, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—'প্রতাপের উত্তেজনা আরও বেড়ে চলেছে।

'বাবা, এবার আমাকে মাপ করো।' সর্বেশ্বর মিনতি করে বলল।

'সে আমি জানি না—কিন্তু আপনাকে যেতেই হবে। আপনি প্রজাদের উস্‌কানি দিচ্ছেন—আমি আর তা বরদাস্ত করব না।'

প্রতাপ ফিরে এলো। রূপনারায়ণ তার কাছে এসে বলে, 'আমাকে নিয়েই তোমাদের যতো অশান্তি। আমি গেলে তোমরা ভালো থাকবে।' প্রতাপ নীরবে তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল।

'তুমি কোথায় যাবে?' অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে প্রতাপ।

'কলকাতায় ফিরে যাবো। সেখানেই শুধু নিজেকে না-চেনার মাঝে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারি। পরিচয়ের লজ্জার বোঝা সেখানে বহন করতে হয় না।'

'এদের কথার ভয়ে তুমি চলে যাবে?' প্রতাপ এবার রূপনারায়ণের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে।

'ভয় নয়। নন্দীগাঁয়ের সবার ভালোর জন্যে। আমি থাকলে দুঃখ আরও বাড়বে। এ বাড়ির সবার দিকেও ত দেখতে হবে।

প্রতাপ এতটা ভাবেনি।

রূপনারায়ণ নন্দীগাঁ ছেড়ে চলে গেছে চিরদিনের মতো। যাবার সময় প্রতাপ বলেছিল, 'যেখানেই থাকো খবর দিও।'

দূরের খবর আর কখনও আসবে কি। নামগোত্রহীন একটি মানুষ—মানুষের কাছে একটু স্নেহ-ভালোবাসা কামনা করেছিল।

এই সংসারে দেবার মানুষেরই অভাব। কখনও-বা যদি দেবার মানুষ পাওয়া গেল সমাজ দাঁড়ালো তার বিপক্ষে। কি জানি হয়ত সারা দুনিয়ার জন্মে-অভিশাপ-লগ্নের মানুষগুলো এমনি করেই সংস্কারের খেয়াল খুশির যূপকাষ্ঠে আপনাদের বলি দিয়ে যায়! অক্ষমা পৃথিবী তার কতটুকুই বা সংবাদ রাখে! দিনের আলোয় যার আবির্ভাব—সেই আলোই তার জীবনে অসহ্য দুঃখের অন্ধকারকে এনে দেয়। রূপনারায়ণও তাই আজ নন্দীগাঁয়ের রাতের আঁধারে বিদায় নিল।

•

পরদিন। সকাল বেলা বাড়িতে গোলমাল শুনে প্রতাপ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন সর্বাণী বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন—সর্বেশ্বর আর স্ত্রী তার পায়ের কাছে পড়ে 'আমাদের রক্ষে কর মা' বলে কাঁদছেন। সর্বাণী যত বুঝাতে চায় যে তাদের যেতে হবে না, ততই তাঁরা আরও চেঁচিয়ে কাঁদেন।

প্রতাপকে সামনে দেখে সর্বাণী বলল, 'ঠাকুর মশায় এখানেই থাকবেন, প্রতাপ!' সর্বাণী জানে প্রতাপ তার কথা ফেলতে পারে না।

'তাই হবে—তুমি যা বলবে তার ওপর আমি কিছু বলব না। কিন্তু ঠাকুর মশায়, আপনি পাকা লোক। আমায় আঘাত দেবার ঠিক জায়গাটা আপনি চিনে রেখেছেন। এবার পরনিন্দা, পরচর্চা একটু ছাড়ুন। এরপর ছোটমাও কিন্তু থাকতে বলবেন না। আপনি ত তাঁরই পুজো বন্ধ করতে চেয়েছেন—তাই না?'

কি বলবেন সর্বেশ্বর ঠাকুর?

বাড়ি ফিরতেই সবাই জিজ্ঞাসা করল, 'ন্যায়-বাগীশ মশায়, ব্যাপার কি?'

'ব্যাপার আর কি! কাল ব'লে আজ পায়ে ধরে সাধাসাধি—ঠাকুর মশায়, মাপ করুন—আপনি না থাকলে চলবেনা। কি আ

করি, থাকতেই হ'ল। তবে এও বলি—বামুনের গায়ে হাত তোলা—ভগবান সইবেন না।'

দত্তবাড়ির ঝি মাতঙ্গিনী পথ দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেল সব। সর্বেশ্বরের ভগবান তার মুখ চাপা দিতে পারলেন না।

মাতঙ্গিনী হাত পা নেড়ে বলে, 'বলি, এত মিথ্যেও ভগবান সইবেন না। এতক্ষণ ছোটমার পা ধরে বামুন-বামনী পড়েছিলে না? সে কি কান্না—কুকুর-ছাগলও চোখের জল রাখতে পারে না।'

'তোকে কে বলছে, হতচ্ছাড়ী!' সর্বেশ্বর খেকিয়ে উঠলেন।

'মুখ সামলে কথা বোলো ঠাকুর। মাতু কাবো তোয়াক্কা করে না। হক কথা বলব—তা সে বম্মাই হোক আর বিষ্টুই হোক। বলি ,তাঁতীব পো আর আসেনা বুঝি!' মাতঙ্গিনী উত্তরের অপেক্ষা না করে চলে গেল।

সর্বেশ্বর একবার সবার মুখের দিকে তাকালেন। একমাত্র মহেশ চৌধুরী ছাড়া আর সবার মুখের ভাবটা যেন—মাতু গোয়ালিনী সর্বেশ্বর ঠাকুরের বিষদাঁত ভেঙেছে।

সর্বেশ্বর পৈতা হাতে জড়িয়ে মাতঙ্গিনীর উদ্দেশ্যে অভিশাপ দিলেন, 'আচ্ছা, যদি যজ্ঞেশ্বর শাস্ত্রীর ছেলে হই ত তিন দিনের মধ্যে রক্ত বমি করে মরবি।'

সর্বেশ্বর যেদিন পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বিদায় নেন সেদিনও বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী বলেছিল, "গাঁয়ের মানুষের হাড়ে বাতাস লাগল।' সর্বেশ্বরের মৃত পিতা, পৈতা, ভগবান কেউ সর্বেশ্বরের মুখ রক্ষা করলেন না।

দত্তবাড়ির দিনগুলো আবার বয়ে চলেছে—চন্দনার একটানা স্রোতের মতো। সর্বাণীর মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে। দর্পনারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণের বৌ এসেছে ঘরে। দত্তবাড়ির করুণ দীর্ঘশ্বাস একটু চাপা পড়েছে। নীরজা মাঝে মাঝে এসে খুশি হাওয়া বইয়ে দিয়ে যায়।

প্রতাপের মাঝে মাঝে মনে পড়ে রূপনারায়ণের কথা। একেবারেই কি তবে সে জীবন থেকে দূরে চলে গেল ! কেন ওর জন্য প্রতাপের মনে জেগে ওঠে আকুল বেদনা ! মাঝে মাঝে প্রতাপের বৌ এসে জিজ্ঞাসা করে, 'কি অতো ভাবো বল ত ?

উদাস দৃষ্টিতে অক্ষয়বটের দিকে তাকিয়ে প্রতাপ বলে, 'ভাবি অনেক কথা—কতো দুর্যোগ এলো—আজও তার চিহ্ন যেন নন্দী-গাঁয়ের বুকে আঁকা রয়েছে। কবে এর শেষ হবে !'

মহাকালের মৌনতা যেন ভেঙে যায়। অক্ষয়বটের ডালে ডালে জেগে ওঠে মিলনের অশ্রুসজল ভৈরবী—বিরহের বেদনবিধুর পূরবী। বার বার যেন সে বলে, 'কিছুরই শেষ নেই—আমারই মতো অশেষ দুঃখের সাধনা চলুক না কেন মানুষের সারা জীবন ধরে !'

প্রতাপ হয়ত তার ভাষা বোঝে। ওই অক্ষয়বটের মূলে তার জীবনের অনেক কিছু সঞ্চিত হয়ে আছে। নন্দীগাঁয়ের বৃদ্ধ পিতামহের কোলে একদিন দেবীপ্রসাদ শেষ আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সতীরও দীর্ঘদিনের দুঃখের কঠোর তপস্যার অবসান তারই কোলে। প্রতাপের জীবনে ওই ত শ্রেষ্ঠ তীর্থ !

•

ইচ্ছামৃত্যু বর নিয়ে এলো স্বর্গসভা থেকে নন্দীগাঁয়ের এই অক্ষয় বট। কতো মাঘের উত্তরায়ণ পেরিয়ে গেছে। কতো মানুষের চোখের জলে সিঞ্চিত হয়েছে তার কোল। অম্লান হাসিতে যেমন সে বরণ করে নিয়েছিল--তেমনই বিদায়ও দিয়েছে।

নন্দীগাঁয়ের দত্ত পরিবারের ইতিহাসের দেড়শ' বছরের সুখদুঃখের কাহিনী তার ডালে ডালে লেখা রয়েছে।

শতাব্দীর সূর্য তার শেষ রক্তিম আভাসটুকু রেখে গেছে পশ্চিম আকাশে। ঊনবিংশ শতাব্দী বিগতপ্রায়। দেশের মানুষের জীবনে

প্রাণের সাড়া জাগিয়েছিল এই শতাব্দী। মানুষের প্রাণে জেগেছে গান, ভাষা পেয়েছে বন্দীজীবনের-বন্ধনের বেদনা, আকুলতা।

নন্দীগাঁয়ের মানুষের বুকে সেই আশা ও আশঙ্কার ব্যাপক ব্যাকুলতা জাগেনি। বাইরে যে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিয়েছিল—তার ভ্রূকুটি নন্দীগাঁয়ের আকাশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা নিজেদের জীবন দিয়ে যে দুর্যোগ সয়েছে। কিন্তু যে আলোড়ন সারা দেশকে জাগিয়ে তুলছিল—যে জ্ঞান, যে বুদ্ধি দেশের মানুষকে একটি বিশেষ সম্ভাবনার পথে—পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল নন্দীগাঁয়ের মানুষ তা থেকে অনেক দূরে পড়েছিল।

এবার এল দুঃখের দুঃসহ দাহনের আগুন নেবাবার পালা। নন্দীগাঁয়ে, ইসলামাবাদে, কলকাতায়, বাঙলাদেশে, ভারতবর্ষে মিলে একই মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে। সবার দুঃখ মিলে এক মহাদুঃখের নিয়েছে রূপ।

এই অসত্যের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে নতুন দিনের জীবনের নতুন ফসলের সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। নন্দীগাঁয়ের আকাশের রক্তিম সূর্য সকল দেশের ওপরই আপন আশীর্বাদ হস্ত বুলিয়ে দিয়ে যায়।

অক্ষয়বটের পাতায় পাতায় আবার অনাগতের আমন্ত্রণলিপি লেখা হয়েছে। আর আসছে নতুন দিন—নতুন মানুষ—জীবনের নতুন জিজ্ঞাসা নিয়ে।

কালের ঝোড়ো-হাওয়ায় শতাব্দীর চাকা গেল ঘুরে। এলো বিংশ শতাব্দী।

সদ্যোজাত অচেনা যুগকে আবাহন জানায় নন্দীগাঁয়ের অক্ষয়-বট। নন্দীগাঁয়ের সকল কালের সকল মানুষের প্রতিনিধি সে।

॥ নয় ॥

শতাব্দীর সূর্য অস্তমিত হ'ল। উনবিংশ শতাব্দীর আকাশ-বাতাসে যে নতুন চেতনা সাড়া জাগিয়েছিল তারই সুর শোনা গেল আরও সুস্পষ্টভাবে বিংশ শতাব্দীর আবির্ভাব মুহূর্তে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষায় অনুপ্রাণিত বাঙালী উনিশ শতকে নতুন সুরে লয়ে যে মানুষের গান রচনা করেছিল তারা ঐ নন্দীগাঁয়ের মানুষেরই প্রতিরূপ। সারা শতাব্দীটি ধবে যে প্রাণরসের সাধনা চলেছিল তার প্রকাশ সে যুগের সাহিত্যে। সে যুগের আত্মা রূপ লাভ করেছে সে যুগের কাব্য উপন্যাসের সৃষ্ট চরিত্রগুলোতে।

নন্দীগাঁয়ের মানুষেব জীবনে এই নতুন চেতনা বিশেষ কোনো সাড়া জাগায়নি। যুগ পরিবর্তন যে-জাতির জীবনে যুগান্তরের সৃষ্টি করে, এরা তার কোনো খবর রাখেনা। দুর্যোগ সামলাতে গিয়ে এদের জীবনের এত সময় বয়ে গেছে—বাইরে কোথায় কি ঘটে গেল তার কোনো আভাস এরা পায় নি। আজব শহর কলকাতা রাজনীতি, সাহিত্য, শিক্ষা প্রভৃতির মুখ্যকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। দেশের শিক্ষিত সমাজের লক্ষ্য কলকাতা। সংবাদপত্রের সংখ্যা আগের চেয়ে আরও বেড়ে গেছে। রঙ্গমঞ্চে বাঙ্‌লা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। মধুসূদন, বঙ্কিম, হেম, নবীন প্রভৃতি সাহিত্যে জীবনরসধারা প্রবাহিত করেছেন। জাতীয় মহাসভার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। এক সময় ডিরোজিওকে নিয়ে কলকাতার যে আলোড়ন আন্দোলন চলেছিল—বাঙ্‌লার যুব সমাজ যে আধুনিকতার উচ্ছ্বাসে প্রাচীন সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কলকাতার পথঘাট মাতিয়ে

তুলেছিল—উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তার উচ্ছ্বাস কিছুটা কমে আসে। বিংশ শতাব্দীতে বাঙালী নতুন চিন্তাধারার বাঁকে এসে পড়ল। এতদিন পরাধীনতার গ্লানি জাতীয় জীবনে যে বেদনাবোধ জাগিয়ে তুলেছিল বিংশ শতাব্দীতে তারই বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট প্রকাশ ঘটল। জাতীয় জীবনের বিপ্লবের ধারায় বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হচ্ছে বিপ্লবের অগ্নিযুগ। এ যুগে নিপীড়িত, শোষিত দেশবাসী বহু দুঃখের আঘাতে জর্জরিত হয়ে মরায়া হ'য়ে উঠেছে।

উনবিংশ শতাব্দী দানের অজস্রতায় বাঙলার সমাজ ও সাহিত্যকে ভরে দিয়েছিল। বিংশ শতাব্দী তারই আশীর্বাদ বহন করে নিয়ে চলে নতুন সম্ভাবনার পথে।

কিন্তু এই পরিবর্তনের তেমন কোনো স্পষ্ট চিহ্ন নেই নন্দীগাঁয়ে। দত্তপরিবারের দেড়শ' বছর পেরিয়ে গেল। তার এই দেড়শ' বছরের ইতিহাস শুধু হারানোর ইতিহাস। বাইরে যে জীবনের বেগ মানুষকে দ্রুতগতি দান করেছে নন্দীগাঁয়ে সে বেগের আবেগ এসে পৌঁছয়নি। বিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় নন্দীগাঁয়ে মানুষ আরও বেড়েছে। দত্তদেরও বংশবৃদ্ধি ঘটেছে। প্রতাপনারায়ণ, রুদ্রনারায়ণ, দর্পনারায়ণ আর তাদের ছেলেমেয়েরা মিলে আবার দত্তবাড়ির ক্লান্তির মাঝেও একটুখানি হাসির আভাস এনে দিল। সর্বাণীও বৃদ্ধা হয়ে পড়েছেন। এখন ছেলের বউরাই সব দেখাশোনা করে। নীরজাও মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়ি থেকে আসে।

রূপমহলের দিকে চোখ ফেরালেই প্রতাপের মনে পড়ে যায় পুরানো দিনের কথা। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় আজ আর কি ফিরে আসবে সেই দিনগুলো! আর এসেই বা লাভ কি? সেই দিনগুলোতে না ছিল কোনো গৌরব, না ছিল কোনো আনন্দ। তবুও যে স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেই দিনগুলোর মাঝে—তাকে ভোলারও শক্তি নেই তার।

প্রতাপের জীবনের দুঃখ তার একার। এ দুঃখের ভাগই বা দেবে কাকে—নেবেই বা কে?

প্রতাপ তার দুই ছেলেকে পাঠিয়েছে কলকাতায়। এতদিন পর কালীপ্রসাদের স্বপ্ন সফল হ'ল। রুদ্রনারায়ণ আর দর্পনারায়ণের ছেলেরাও যাবে। দত্তবাড়িব ছেলেরা আজব শহর কলকাতায় যাচ্ছে নতুন জীবনের সন্ধানে।

সর্বাণী প্রতাপকে একদিন বলেছিল, 'তাঁর বড়ো ইচ্ছে ছিল—আমাদের বাড়ির ছেলেরা বাইরের জগতকে দেখবে—তারা মানুষ হবে। তাঁর জীবনে এই স্বপ্ন সত্য হ'ল না।' প্রতাপ বুঝতে পারে কোথায় সর্বাণীর দুঃখ। তাই সেদিন সে বলেছিল, 'তুমি অত ভাবছো কেন ছোটমা—আমাদের জীবনে হয়ত হয়নি। ছেলে-মেয়েদের জীবনে যদি তার কিছুটা সুফলও পাওয়া যায় তাহলেই কাকার স্বপ্ন সফল হবে।'

প্রতাপের জীবনে স্বপ্ন জাগে—আবার দত্তবাড়ির শান্তি, সমৃদ্ধি ফিরে আসুক। তার পরিচয় শুধু ধনসম্পদের গৌরবেই প্রতিষ্ঠিত হবে না—শিক্ষায় দীক্ষায় এই পরিচয় আরও সুমহান হয়ে উঠবে। নিজেরও দিনগুলো তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। ছেলেরা মানুষ হ'লে তবুও শান্তিতে সংসার থেকে বিদায় নিতে পারবে।

বিজাতীয় ইংরেজি শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়েছে সবাই। ইংরেজ রাজত্বে কিছু করে খেতে হ'লে এই শিক্ষার একান্ত দরকার। উনবিংশ শতাব্দীতেই বাঙালী এই প্রয়োজন অনুভব করেছে। বিংশ শতাব্দীতে প্রয়োজন—আগ্রহে রূপান্তরিত হ'ল।

প্রতাপ সেই আগ্রহ নিয়ে কলকাতায় পাঠাল তার দুই ছেলে মহেন্দ্র ও জীবেন্দ্রকে। প্রতাপের স্ত্রী পার্বতী বলে, 'নন্দীগাঁয়ে একটা বড়ো পাঠশালা করলে হয় না। গাঁয়ের সবাই লেখাপড়া শিখতে পারতো!'

'ছোটমার মত নিয়েছ?' প্রতাপ সব ব্যাপারে সর্বাণীর মতের ওপরই নির্ভর করে।

শুধু সে নয়—দত্তবাড়ির কোনো কাজই সর্বাণীর অমতে হতে পারে না। পার্বতী বলে, 'আমি বুঝি ছোটমার মত না নিয়েই বলছি নাকি! ছোটমাও প্রায়ই বলেন।'

'তাহলে হবে'— প্রতাপের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

নন্দীগাঁয়ে ইংরেজি পড়াবার পাঠশালা খোলা হ'ল। ইসলামাবাদে গিয়ে হাকিমের অনুমতি নিয়ে এল প্রতাপ। গাঁয়ে শিক্ষক নেই, তাই শহরের দু'চারজন ইংরেজি-জানা শিক্ষক আনা হ'ল। একদিন দ্বারিক ঠাকুর, মহিম আচার্যরা এই পাঠশালার ভয়ে আঁতকে উঠে কালাপ্রসাদকে বলেছিল, 'বাবাজী যেন এগাঁয়ে আবার ওরকম পাঠশালা না খোলেন। ও সব কেরেস্তানী ব্যাপার।'

সেদিন পড়ে আছে অনেক-অনেক পেছনে। নতুন দিনে মানুষেরও নতুন জিজ্ঞাসা জেগে ওঠে জীবনে।

রুদ্রনারায়ণ আর দর্পনারায়ণের ছেলেরা পাঠশালায় ভর্তি হয়েছে। নন্দীগাঁয়ের দত্তবাড়ির প্রথম মানুষটির নামে পাঠশালার নামকরণ হয়েছে—রাজীবলোচন বিদ্যালয়। গাঁয়ের সবাইকে বলে দেওয়া হয়েছে যে বিনে পয়সায় তারা ছেলেদের পড়াতে পারবে। তবুও তেমন ছাত্র ত পাওয়া যায় না! সবে মিলে জন পনেরো ছাত্র পাওয়া গেছে। যেসব শিক্ষক এসেছেন তাঁরা এই পাঠশালাকে বলেন 'স্কুল'—আর নিজেদের বলেন 'মাস্টার'। নন্দীগাঁয়ের সবাই

জানে ওটা পাঠশালা নয়—ইস্কুল। শিক্ষকদের বলে মাস্টারবাবু। প্রতাপ ইস্কুল-বাড়ির সঙ্গে মাস্টারবাবুদের থাকার ঘরও করে দিয়েছে। ইস্কুল বাড়ির সামনেই চন্দনা বয়ে চলেছে। দেশ-বিদেশের নৌকা যাবার সময় সবাই একবার ফিবে তাকায় নন্দীগাঁয়ের ইস্কুল বাড়ির দিকে।

নতুন ইস্কুল ছাড়া গাঁয়ের শ্রীনিবাস পণ্ডিতের টোল ছিল। এতদিন গাঁয়ের ছেলেবুড়োর ওই একমাত্র ভরসা ছিল। এখন সবাই টিপ্পনী কেটে বলে, 'এবার চিনিবাস ঠাকুরের টোল গেল।'

বৃদ্ধ শ্রীনিবাস চটে ওঠেন এ কথায়। হাত পা নেড়ে কাশতে কাশতে বলেন, 'টোল নয়, তোরা যাবি। ওখানে ত আর পড়ানো হয় না—ফুঁ মন্তর দিয়ে সবাইকে কেরেস্তান বানায়।'

ওঁর কথায় কেউ চটে না। নিঃসন্তান আত্মীয়বিহীন শ্রীনিবাসের আর কেউ নেই। একটা দিন আসবে যখন তাঁর এই দীর্ঘকালের সুখদুঃখজড়িত টোলটি আর ছাত্ররা এসে মুখর করে তুলবে না। নন্দীগাঁয়ের পুরানো মানুষ যারা—জীবনের একটি দিনকেই অনেক দিনের মধ্যে রূপায়িত করতে চেয়েছে। নতুনের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করতে তাদের বড়ো দ্বিধা, বড়ো সঙ্কোচ। শ্রীনিবাস তাদেরই একজন।

দিনের পর দিন কেটে যায় নন্দীগাঁয়ের। দেশের মানুষের জীবনে দেখা দিয়েছে প্রয়োজনের তাগিদ। কিন্তু নন্দীগাঁয়ের মানুষের জীবনে তার তাগিদ এখনও আসেনি।

সর্বাণী ও প্রতাপের উপদেশেও আদেশে নন্দীগাঁয়ের মানুষের জীবন ধারা একইভাবে বয়ে যায়। রুদ্রনারায়ণ আর দর্পনারায়ণ মা ও দাদার উপর সব ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে আছে। সর্বাণী

আর পারে না জীবনের দুঃসহভার বইতে। বার্ধক্যে তার দেহ মন ছেয়ে গেছে। তিনি শুধু বিদায় নেবার প্রহর গুণছেন। কিন্তু বিধাতার অনাগত ইতিহাসের পাতায় সে প্রহর আসতে এখনও অনেক দেরি।

চিরপুরাতন অক্ষয়বট নন্দীগাঁয়ের দেড়শ' বছরের মানুষের কাছে চিরনতুন হয়ে দেখা দিয়েছে। দিনের পর দিন অতীতে মিলিয়ে গেল—কিন্তু কালজয়ী অক্ষয়বটের ত কোনো পরিবর্তন নেই। নতুন দিনের আলোয় তার পাতায় পাতায় খুশি জেগে ওঠে—বৃদ্ধ পিতামহের স্নেহের হাসির মতো।

মাঝে মাঝে প্রতাপের হীরা-রূপনারায়ণের কথা মনে পড়ে। রূপনারায়ণ বলেছিল—যদি কোনোদিন প্রয়োজন হয় ত প্রতাপকেই জানাবে। তার জীবনে কি প্রতাপের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল! হৃতসর্বস্ব দত্তপরিবারের সব কিছু একদিন হীরাই ফিরিয়ে দিয়েছিল। সেই ঋণ ত আর এ জীবনেও শোধ করা যাবে না। কিন্তু কেন এমন হয়। জীবনের মাঝে যারা আশীর্বাদকে বহন করে আনে—তারাই কেন শুধু হারিয়ে যায়! প্রতাপ ভেবে পায় না কিছুই।

জীবনের এই নিরন্তর জিজ্ঞাসার উত্তর মানুষও এখনও পায় নি।

নন্দীগাঁয়ের ইতিহাসের বৈচিত্র্যহীন আরও কয়েকটি দিন কেটে গেছে। তিন পুরুষের জীবন দ্বন্দ্ব নিয়ে কাটছে তাদের দিন। বার্ধক্যের জরাজালে জড়ানো সর্বাণীর মনে জাগে অতীতের সুর। প্রতাপ, রুদ্রনারায়ণ, দর্পনারায়ণ অতীত ও বর্তমানের সন্ধিক্ষণে।

দ্বিধাজড়িত মন নিয়ে চলেছে। তাদের ছেলেরা দেখে আগামী দিনের স্বপ্ন। প্রতাপ কালীপ্রসাদের স্বপ্নকে সফল করেছে। তাদের ছেলেরা সব নতুন দিনের নতুন ব্যবস্থাকে চিনেছে—জেনেছে—তাকে জীবন দিয়ে গ্রহণ করেছে।

এদিকে দেশময় দেখা দিয়েছে বিপ্লবের অগ্নি-আভাস। সাম্রাজ্য-বাদী ইংরেজের কবল থেকে দেশকে উদ্ধার করতে হবে। চোখের জল মুছে বেদনাহত দেশের মানুষ আজ ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিপ্লবের বহ্ন্যুৎসবে। ইংরেজও সশঙ্ক হয়ে উঠেছে। নির্বিচারে বলি দিচ্ছে দেশের মানুষকে। পরাধীন জাতি এবার জেগেছে—প্রাণ দিয়েই তাদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বাঙালী জাতিকে অর্ধাশনে অনশনে রেখেও যখন তাদের বাগ মানাতে পারছেনা—তখন তার ওপর চরম আঘাত হানতে গেল দেশকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে। বঙ্গভঙ্গ হবে! কেউ একথা যেন ভাবতে পারে না। দেশময় শোনা গেল প্রতিবাদ। ঘরে ঘরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পেল অরন্ধন ব্রত-উদ্‌যাপনের ভেতর দিয়ে। সারা ভারতময় বিপ্লবের আগুন তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নন্দীগাঁয়েও তার কিছু উত্তাপ এসে লাগছে। দত্তবাড়ির ছেলেরা কলকাতায় লেখাপড়া শিখে নতুন খবর নিয়ে এসেছে নন্দীগায়ে। রাজীবলোচন বিদ্যালয়ের মাস্টারবাবুরাও কি যেন সব নতুন খবর বলে। কোথায় কোন্ মেম সাহেব বোমার আঘাতে মারা পড়াতে বাঙালী ছেলের ফাঁসি হ'ল। পাঞ্জাবের শিখরা নাকি 'গদর' বলে একটা দল করেছে। কোথায় কোন্ বালিয়ারীর ধারে ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে বাঙালী ছেলেরা প্রাণ দিয়েছে। নন্দীগাঁয়ের লোক শুনে অবাক হয়। এরা কি খেপেছে?

কিন্তু দত্তবাড়ির কেউ অবাক হয় না। এই পরিবারের ওপর ইংরেজরা বারবার যে আঘাত হেনেছে আজও তার স্মৃতি তাদের মন থেকে মুছে যায়নি। কারও ফাঁসির সংবাদ শুনলে সর্বাণীর মনে পড়ে নিজের জীবনের দুঃখের কথা। সন্তানের অকল্যাণের ভয়ে সে চোখের জল চেপে যায়।

প্রতাপের ছোট ছেলে জীবেন্দ্র কলকাতায় থাকতে বিপ্লবীদের কাছাকাছি এসেছিল, তাঁদের সঙ্গে গোপনে কাজ করেছিল। দেশে ফিরে এসে অনেকবার সে চেষ্টা করেছে বিপ্লবীদল গড়ে তোলা যায় কিনা। ইসলামাবাদের দু'চারজন যুবক জীবেন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কিন্তু নন্দীগাঁয়ে তার কথা সবাই বোঝে না। স্কুলের মাস্টার আদিত্য সেন এখানে তার একমাত্র সহকর্মী। নন্দীগাঁ তাদের কাজের উপযুক্ত জায়গা নয় এটা তারা বুঝতে পারে। সারা ভারত জুড়ে যে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠছে সেইখানে তাদেরও ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। জীবেন্দ্র আর আদিত্যমাস্টার একদিন কাউকে না জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল অজানা অন্ধকার পথে। মনে তাদের বিপুল আশা—যদি স্বাধীন মুক্ত-জীবনের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়।

এতদিন পর নন্দীগাঁয়ের মানুষ ক্ষুদ্র পরিবেশ ছেড়ে বিরাটের সন্ধানে বৃহৎ পরিবেশের দিকে ছুটল।

জীবেন্দ্র রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সামনেই দেখতে পেল নিশুতি রাতের অন্ধকারে একা অক্ষয়বট শুধু জেগে আছে। যেন তাকে বিদায় দেবার জন্যই অতন্দ্র প্রতীক্ষায় নিঃসঙ্গ নির্জনতার মাঝে প্রাচীন বন্ধুটি স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। জীবেন্দ্র প্রণাম জানালো নিঃশব্দে। অজানা হাওয়ার দোলায় অক্ষয়বটের শাখা উঠল দুলে।

জীবেন্দ্র এগিয়ে চলে অন্ধকারে। রাত্রির নিঃস্তব্ধতায় অক্ষয়বটের শাখায় শাখায় যেন জেগে ওঠে দীর্ঘশ্বাস—হাওয়ায় হাওয়ায় যেন তার ভেসে-আসা করুণ সুর শোনা যায়—'মানুষের আসা-যাওয়ার পথ প্রান্তে আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। আমি তোমাদের কান্না-হাসির ইতিহাস রচনা করে যাই।'

পরদিন। দত্তবাড়ির ওপর আবার নেমে এলো দুঃখের কালো ছায়া। জীবেন্দ্র বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। মার কাছে লিখে গেছে, 'দুঃখ কোরনা মা—যে সংকল্প গ্রহণ করেছি, তাতে যদি সফল হই আবার তোমার কাছে ফিরে আসবো।'

কি তার সংকল্প সেদিন কেউ জানেনি। যেদিন জেনেছে সেদিন জীবেন্দ্রের জন্য দত্তপরিবারের অধীর প্রতীক্ষারও প্রয়োজন ফুরাল। পার্বতীর চোখের জলের করুণ আহ্বান আর তার কানে পৌঁছায়নি। দেশের কাজে প্রাণ সে দিয়েছিল ফাঁসি-কাঠে নয়, ইংরেজের গুলিতে।

প্রতাপ স্তব্ধ হয়ে গেছে এ আঘাতে। সর্বাণীর কণ্ঠও রুদ্ধ। এত কান্না—বুক ফেটে যায়, তবুও তিনি কাঁদতে পারেন না।

পুলিশ এসে দত্তবাড়িতে খানাতল্লাশী করেছে। গাঁয়ের লোক ভয়ে আর দত্তবাড়ির দিকে এগোয় না। কি জানি যদি পুলিশ আবার তাদেরও সন্দেহ করে।

নন্দীগাঁয়ে আবার হারানোর পালা শুরু হ'ল। জীবেন্দ্র চলে গেছে। পার্বতী সে আঘাত আর সহ্য করতে পারেনি। বহু অশ্রু-সিক্ত বিনিদ্র রজনীর শেষে পার্বতীরও যেতে হ'ল চিরদিনের মতো সবাইকে ছেড়ে।

আঘাতের পর আঘাত মানুষকে করে তোলে পাষাণ। সুখ-দুঃখের সকল অনুভূতির সীমা তার ছাড়িয়ে যায়। সর্বাণীর আজ সেই অবস্থা। বারবার তিনি বলেন, 'ভগবান, দুঃখ ত অনেক দিলে—এবার তোমার কাছে আমায় টেনে নাও।'

বিধাতা হয়ত অলক্ষ্যে বসে হাসেন। নইলে একে একে সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে যায়—শুধু তিনি কেন পেছিয়ে পড়ে রইলেন।

এত আগে এসেও যাবার পথ কেন তার রুদ্ধ! পেছনের সবাই কেন আগে চলে যায়!

রাজীবলোচনের নন্দীগাঁয়ে নতুন মানুষ নতুন চাহিদা নিয়ে জীবনের পথ বেয়ে চলেছে। সে পথের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে অক্ষয়বট—আর সে পথের ওপর আর একজন ক্লান্ত পথিক—সর্বাণী। জীবনের দ্রুতবেগের আবেগে এরা ছুটে চলেনি—চলতে পারে না।

একজন বলে, 'আমি কালের অধীশ্বরের প্রহরী—জীবন-মৃত্যুর তপস্যার তপোবনে আমি নীরবে শুধু দেখে যাই আর রক্ষা করি ধ্যানরত ভুবনেশ্বরের তপোবনের শান্তি।'

আর একজন বলে, 'একটু চোখের জল দাও—জীবন আমার মরুভূমি হয়ে গেছে, কান্না আমার হারিয়ে গেছে, প্রভু! সে কান্না আমায় ফিরিয়ে দাও, ওগো ফিরিয়ে দাও!'

বোবা পৃথিবী মুখর হয়ে ওঠে, মুখর মানুষ হারায় তার কথা। আর মহাকাল শুধু বসে বসে অন্তিম লগ্নের প্রদীপের নিবু নিবু শিখাটিকে জ্বালিয়ে রাখার প্রয়াস পায়।

সর্বাণীর জীবনের দুঃখের হোম-হুতাশন আর নিবল না। ছেলেমেয়েরা সবাই একে একে চলে যায়। দত্তবাড়ির ওপর ঘনিয়ে আসে দুর্যোগ রাত্রির ঘনান্ধকার। অনেক মৃত্যুর, অনেক কান্নার, অনেক শোকের পুঁজি নিয়ে অতি বৃদ্ধ সর্বাণীর জীবনের ক্লান্ত দিনগুলি কাটে। প্রতিদিন একবার লাঠিতে ভর দিয়ে আসেন দীঘির ঘাটে। ওই দীঘি, ওই অক্ষয়বট প্রতিদিন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, 'এখানে তোমার বন্ধু কেউ নেই—আমি আছি,—এসো আমার কাছে।'

এ ডাক এড়াতে পারেন না সর্বাণী। দুঃখ ভুলতে গিয়েও যে ভোলা যায় না। স্মৃতির দ্বার ঠেলে একের পর এক এসে জীবনের সামনে ভিড় করে দাঁড়ায়। বাবা, শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, রজনী-

তহসিলদার, দিদি—প্রতাপ, রুদ্রনারায়ণ, দর্পনারায়ণ, জীবেন্দ্র না:—আর ভাবতে পারেন না সর্বাণী। কেউ ত নেই জীবনকে যারা ঘিরে ছিল—যাদের নিয়ে ভুলেছিল—জীবনের সবচেয়ে বড়ো আঘাত এল তাদের কাছ থেকে। তারা সবাই ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।

শ্মশান প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন সর্বাণী কিন্তু তাঁর পথ আগলে রয়েছে তাঁর দুর্ভাগ্য।

মহেন্দ্র আজ নন্দীগাঁয়ের বড়কর্তা। সর্বাণী আছেন, তাই এখনও পরিবারে কোনো ভাঙন ধরেনি। দর্পনারায়ণ, রুদ্রনারায়ণের ছেলেরাও একসঙ্গে আছে। কিন্তু জমিদারির মধ্যে ফাটল ধরেছে এতদিন পর। মহেন্দ্র চেয়েছিল ইসলামাবাদের আরও দু'চার জন জমিদারের মতো ঐশ্বর্য-আড়ম্বর দিয়ে নন্দীগাঁয়ের দত্তদের পরিচয় বাইরের জগতের কাছে আরও বড়ো করে তুলবে। জীবেন্দ্রের আত্মোৎসর্গের বলিষ্ঠতা ছিল না তার মধ্যে। ইংরেজ সরকারকে খুশি রেখে চলতে গিয়ে অনেক খুইয়ে তবে সে সরকারী খেতাব পেল। দান-ধ্যান যত না করেছে তার চেয়ে বেশি দিয়েছে সরকারের দপ্তরে। নন্দীগাঁয়ের মহেন্দ্র দত্ত আজ রায় মহেন্দ্র নারায়ণ দত্ত বাহাদুর।

এদিকে দেনার দায়ে দেবীর চর এবং আরও দুয়েকটা তালুক তার হাত ছাড়া হয়ে গেল। তাতেও দেনা মেটে না। দর্পনারায়ণের বড়ো ছেলে রাজনারায়ণ অনেকবার বলেছে, 'দাদা এবার সামাল দাও—নইলে সব যাবে!'

মহেন্দ্র গম্ভীর হাসি হেসে বলে, 'দত্ত পরিবারের সব যেতে যেতেও যায় না।'

'কিন্তু সেদিন যে আর নেই।'

'দত্তরা ত আছে!'

রাজনারায়ণ বোঝে মহেন্দ্রকে বোঝান যাবে না। জমিদারির আয়ের ভরসা ছেড়ে রুদ্রনারায়ণ ও দর্পনারায়ণের ছেলেরা চাকরি

করে সরকারী দপ্তরে, সর্বাণী মনে মনে ভাবেন, এতদিন পর সত্যিই কি বাতি নিববে! কিন্তু কাউকে কিছু বলার নেই তাঁর। নাতিরা বড়ো হয়েছে—তাদের ছেলে-মেয়েরাও ছোটো নয়। কি আর বলবেন তাদের!

রাজীবলোচনের আমলের মোহিনী কৈবর্তের জীবন ধারা মহেন্দ্র নারায়ণের আমলেও বয়ে এসেছে। ক্ষেমঙ্করের বউ মোক্ষদা ঘর বাঁধল মোহিনীকে নিয়ে। সেই বংশেরই ভজহরি মহেন্দ্রের খোদ্ খানসামা। নন্দীগাঁয়ের সবাই তাকে বলে ভজহরি খানসামা। মহেন্দ্র ভজহরির বাপকেও দেখেছে প্রতাপনারায়ণের আমলে। এরা বংশপরম্পরা এই কাজই করে আসছে। একটি চোখ নেই ভজহরির—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হাতও একখানি অবশ হয়ে গেছে। নিরীহ মানুষটি—দত্তবাড়ির সুখ-দুঃখের সঙ্গে তার কোথায় যেন নাড়ীর সম্পর্ক আছে। মহেন্দ্রনারায়ণের দেনার অঙ্ক যখন বাড়তে থাকে তখন ভজহরিরও মনে যেন খট্‌কা লাগে। দুয়েকদিন সে বলেছে, 'ছেলে মেয়েদের কথা একবার ভেবে দেখবেন। সব গেলে সবাই দাঁড়াবে কোথায়?'

'পৃথিবী কি এতই ছোটবে, ভজহরি!' মহেন্দ্রের এ কথার উত্তর দেবার মতো বুদ্ধি নেই তার। সাদাসিধে মানুষ- সোজা কথাই সে বোঝে।

নিজের ঘরে বসে ভজহরি বউ-এর কাছে দুঃখ করে, 'এবার বুঝি নন্দীগাঁয়ের লক্ষ্মী গেলেন'

'কেন গা?'

'বড়কর্তা যেভাবে দুহাতে টাকা খরচ করছেন! এদিকে দেবীর চর, বিজয়পুর সবই গেল। বুড়োকর্তা যাবার সময় বলে গেলেন, 'হীরামহল ও রূপমহলের ওপর হাত দেবে না।' শুনলাম শহরের

বাড়িখানাও বিক্রী করে দিচ্ছেন। কি যে হবে?' ভজহরি দীর্ঘশ্বাস ফেলে হুঁকোটা তুলে নিল।

একটু দূরে ভজহরির মেয়ে সোনাই বসে আছে। বাপের কথা শুনে কি এক ভাবনা ধরেছে তার মনে।

মহেন্দ্রনারায়ণের বড়ো ছেলে মনু দেশের স্কুল থেকে পাশ করে কলকাতায় গেছে পড়তে। সোনাই ভাবে মনুদার যদি পড়া বন্ধ হয়ে যায়! কেন যে মনুর কথা তার মনে পড়ে—কেন যে তার কথা ভাবতে ভালো লাগে তা সে বুঝতে পারে না। মনু যেদিন কলকাতা গেল তার কান্না পেয়েছিল। অক্ষয়বটের কাছে দাঁড়িয়ে বারবার বলেছিল, 'ঠাকুর, মনুদার যেন কোনও কষ্ট না হয়।'

হঠাৎ কি ভেবে ভজহরিকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা বাবা, মনুদা আসবে না এবার!'

'পুজোয় আসবে শুনলাম,' ভজহরি একটু থেমে আবার বলল, 'আর এসেই বা কি হবে! এই পুজোতেই কয়েক হাজার টাকা খরচ করে কর্তা আবার দেনা বাড়াবেন।'

সোনাই ভাবে, 'দেনা বাড়ুক, তবু মনুদা ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুক।'

কেন যে তার এত ভাবনা সেদিন সোনাইও কি তা জেনেছে! বিকেল বেলা দীঘি থেকে জল আনতে গিয়ে প্রতিদিন অক্ষয়বটের কাছে তার যে করুণ প্রার্থনা—নিজের অজ্ঞাতসারে যে এক ফোঁটা চোখের জল নন্দীগাঁয়ের বৃদ্ধ পিতামহ অক্ষয়বট কি তার অর্থ বোঝে!

ইংরেজ তাঁর ভেদনীতি দিয়ে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা প্রথম থেকেই করে আসছে।

ইসলামাবাদমুসলমান-প্রধান শহর। শহরের আশে পাশে মুসলমানের সংখ্যাই বেশি। এখানেও চেষ্টা চলেছিল যদি কোনো গোলমাল সৃষ্টি করা যায় এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়েরই কয়েকজন ভদ্রলোক অসহিষ্ণু জনসাধারণের উত্তেজনা দমিয়ে রাখতে পেরেছিলেন।

নন্দীগাঁয়ে খবর এসেছে তার। এখানে আবার হিন্দুরা সংখ্যায় বেশি। তবুও দুই সম্প্রদায়ের লোকই প্রতিদিন সন্ত্রস্ত হয়ে আছে।

এতদিন পর আবার অশীতিপর বৃদ্ধা সর্বাণীর জীবনে পুরানো দিনের কথা মনে পড়ল। সেই ফরিদের দল, রহমান কাকা—

মহেন্দ্রকে ডেকে তিনি বলে দিলেন, 'এ গাঁয়ে চিরকাল হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে বাস করেছে -আজও তাই করবে। সবাইকে বোলো, আমি বলেছি।'

রাণীমার আদেশ —নন্দীগাঁযের হিন্দু-মুসলমান মাথা পেতে মেনে নেয়। নানা দেশের দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর এসে বিচলিত করলেও এরা ভেঙে পড়ে না। দু'চার জন যে চেষ্টা করে না তা নয়—কিন্তু তাদের কথা কেউ শোনে না।

দেখতে দেখতে পুজোর দিন ঘনিয়ে এলো। মহেন্দ্রনারায়ণকে প্রায় শহর-নন্দীগাঁ করে কাটাতে হয়। নানা মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছে সে। ইসলামাবাদের ধনঞ্জয় মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে সুদে আসলে তা এতই ফেঁপে উঠেছে যে এখন আর সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। স্ত্রী পুষ্পমালার গয়নাগুলোও একে একে বিক্রী হয়ে গেছে।

তবুও দত্তবাড়ির পুজো বন্ধ হতে পারে না। গাঁয়ের মধ্যে একটি মাত্র পুজো। সুখচর বিক্রী করে দিয়ে পুজোর ব্যবস্থা হল।

কলকাতা থেকে মনু এসেছে। গাঁয়ের সবাই তাকে পেয়ে বসেছে। রাজধানী কলকাতা—লাট সাহেবের জায়গা। সবাই শুনতে চায় কলকাতার কথা। মনু আর বলে শেষ করতে পারে না।

সোনাই শুধু দূরে দূরে থেকে তাকে দেখে। কাছে যেতে লজ্জা করে। কিন্তু দিনে একবার দেখতে না পেলে ভালো লাগে না। কেন এমন হল! তবে কি —ছি ছি, সে যে ছোট লোকের মেয়ে! অক্ষয়বটের কাছে প্রণাম করে বলে, 'ঠাকুর, আমার মনের কথা সে যেন জানতে না পারে। মনুদাকে ভালো রেখো, ঠাকুর!'

ধরা পড়ে গেল বুঝি সোনাই। সেদিন বিকেলে জলভরা কলসী রেখে অক্ষয়বটের কাছে এসে প্রণাম করে, নিজের আকুল প্রার্থনা জানিয়ে উঠতে যাবে এমন সময় দেখে মনু সেখানে দাঁড়িয়ে।

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল সোনাই। মনু তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। অক্ষয়বটের নীচে ছায়া আরও গাঢ় হয়েছে।

'কি বলছিলে অক্ষয়বটের কাছে, সোনাই!'

সোনাইর সমস্ত দেহ থর থর করে কাঁপে। কি জবাব দেবে সে!

মনু আবার জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা সোনাই, সেবার আমি যাবার সময় তুমি কেঁদেছিলে কেন?'

সোনাই আর পারে না। আবার কান্না পেল তার।

'আমি ছোট লোকের মেয়ে—আমি কিছু জানি না।' সোনাই কথায় মনে হয় ও যেন ভয় পেয়েছে।

'কেন কেঁদেছিলে তাও জান না? আজ কি বলছিলে অক্ষয়-বটের কাছে তাও না?' মনু হেসে বলল।

'আর কখনও বলবনা, দাদাবাবু,' কলসি কাঁখে নিয়ে চলে যাচ্ছিল সোনাই—মনু যেতে দিল না তাকে।

'শোনো সোনাই,' এ আদেশ উপেক্ষা করবার উপায় নেই তার। ফিরে দাঁড়ালো সোনাই।

'তুমি বুঝি আমার কথা ভাবতে?' মনু আবার প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ।"

'তোমার মনের কথা কাউকে জানাতে চাও না?'

'কাউকে না।'

'আমার দিকে তাকাও,' মনুর কণ্ঠে আবার আদেশের সুর বেজে উঠল।

অশ্রুসজল চোখে মনুর মুখের দিকে তাকাতেই মনু তার হাত ধরে বলে, 'তুমি আমাকে ভালোবাসো, সোনাই?'

বুক কেঁপে উঠল সোনাইর। 'ঠাকুর, কেন আমার মনের কথা জানিয়ে দিলে তাঁকে?'

'বলো,—চুপ করে রইলে কেন?' মনু তখনও তার হাত ছাড়েনি।

'আমরা ছোট জাতের মেয়ে, আমাদের ওসব ভাবতে নেই! হাত ছাড়ুন,'--হাত ছাড়াতে পারে না সোনাই।

'আমার কাছে লুকোতে চেষ্টা করো না—আমি জানি।'

'আমি যাই—কেউ দেখে ফেলবে।'

'তাহলে সত্যি?'

'মোটেই না,' বলে সোনাই তাড়াতাড়ি চলে গেল

সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে শ্রান্ত পাখির দল অক্ষয়বটের শাখায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। সেদিন সেই সন্ধ্যায় দু'টি নরনারী জীবনের আকুল প্রত্যাশার ব্যাকুল প্রকাশের সাক্ষী রইল ঐ অক্ষয়বট। পাষাণ-দেবতা মানুষের ভাষা বোঝে কিন্তু সে ভাষায় তার নিজের আবেগের কোন প্রকাশ নেই। মৌনতাই তার একমাত্র ভাষা। তাই ত মানুষ অসঙ্কোচে নিজের প্রাণের আকুলতা জানায় তাকে। সজল সবুজ পৃথিবীর কাছ থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করেও অক্ষয়বট পাষাণ দেবতার মতো নিস্তব্ধ—নিথর। তার মাঝেও মানুষের প্রাণের আকুল আবেদন পৌঁছয় কিনা কে জানে!

বাড়ি ফিরেই সোনাই আর নিজেকে সামাল দিতে পারে না। মন্নুর সুন্দর মুখখানা তার চোখের সামনে ভাসে। ধরা পড়ে গেছে সোনাই! তার মনের কথা আর চাপা রইল না। মন্নুর কাছে এ মনের কথার দাম কি? জলে ত আর দাগ পড়ে না। এ জীবনে যা হবার নয় তা নিয়ে চোখের জল শুধু ফেলা যায়। সে চোখের জলও ত শুকিয়ে যায় জীবনের রৌদ্রতপ্ত পথের ধুলির মাঝে।

কৈবর্তের মেয়ে তার আবার ভালোবাসা! সবাই শুনলে যে তাকে গলা টিপে তাকে মারবে!

মন্নুদা কেন তাকে বারবার জিজ্ঞাসা করে? ও কথা ত তার মনেই লুকানো ছিল। না বলে দুঃখ পাওয়ার চেয়ে বলেই আরও বেশি দুঃখ পেতে হয়।

সোনাই আর ভাবতে পারে না। সারারাত ঘুম আসে না—আসে শুধু শ্রাবণের অঝোর ধারার মতো আঁখি জল।

সোনাই ত এ কথা জানেনা যে ভালোবাসা কৈবর্তের মেয়েকেও কাঁদায়।

দত্তবাড়িতে অষ্টমী পুজোর রাতে 'কুরুক্ষেত্র' পালা অভিনয় হচ্ছে। বাড়ির সবাই এক পাশে বসেছে। চিকের আড়ালে গাঁয়ের মেয়েরা বসে। সর্বাণী ভিড়ের বাইরে বসেছিলেন।

অভিমন্যু এলো -সপ্তরথীর সঙ্গে আজ যুদ্ধ করতে যাবে। উত্তরা তাকে সাজিয়ে দিতে দিতে চোখের জল মোছে।

সোনাইর কান্না পেল উত্তরার জন্যে। চোখের জল মুছে একবার মন্নুর দিকে তাকালো। ওই তো তার অভিমন্যু! 'যুদ্ধে আমি যেতে দেব না', বলে নিজেই যেন লজ্জা পেল।

সোনাইর জীবন-কুরুক্ষেত্রে একটি মানুষের স্বপ্ন ভুলিয়ে দিল তার পরিবেশকে! তবু এই স্বপ্ন বেশি দূর আর এগোতে পারে না—সে ভুলতে পারে না যে সে কৈবর্তের মেয়ে।

সোনাই তাই মনুকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। লুকিয়ে দেখা ছাড়া আর তার উপায় নেই।

পূজোর কয়েকদিন পর। দীঘির ঘাটে মনু বসে আছে একা। জল নিতে এসে তাকে দেখতে পেয়ে সোনাই আবার কলসি কাঁখে ফিরে যাচ্ছিল। মনু তাড়াতাড়ি এসে সোনাইর পথ আগলে বলল, 'এ ক'দিন পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন?'

'কই পালাইনি ত?'

'আমি ত তোমাকে একদিনও দেখতে পাইনে?'

'আমি দেখতে পাই—আপনি ইচ্ছে করেই ত দেখেন না।'

'তুমি বোঝ না যে আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াই?'

'না।'

'মিথ্যা কথা বলনা—তুমি বুঝতে পারো,' ব'লেই মনু সোনাইর কলসিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে তাকে অক্ষয়বটের নীচে এনে দাঁড় করালো। সোনাই ভাবে—না তা হয় না।—হতে পারে না।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি, সোনাই—যে ক'দিন আছি, তুমি দূরে দূরে থেকো না,' মনুর কণ্ঠ করুণ মিনতি মাখা।

সোনাই আর নিজেকে সামলাতে পারে না, 'আমি ছোট জাতের মেয়ে, আমায় ওভাবে বলবেন না।'

'না তুমি ছোট নও—অমন ক'রে ব'ল না।'

'কর্তারা শুনলে আমায় আর আস্ত রাখবেন না—আপনিও দুঃখ পাবেন।'

মনু অত বোঝে না। সে কেবল সোনাইর হাত ধরে বলে 'বলো, তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না- বলো, তুমি আমাকে ভালোবাসো।'

সোনাই ভয়ে ভয়ে বলে, 'বাসি—কিন্তু আর বাসবো না।'

'তুমি আমার সোনাই—আর কারও নয়। এই অক্ষয়বট সাক্ষী করে তোমাকে আমি গ্রহণ করলাম।'

সোনাইর পৃথিবী —আর মনুর পৃথিবী এক নয়।

সেদিন শুধু চোখের সামনের আকাশটাই তারা দেখতে পেল — ঈশান-কোনে যে মেঘ জমেছে —তা কেউ জানে না।

মনুর বাঁধন ছাড়াতে পারে না সোনাই —ছাড়াতে চায়ও না।'

'আমি কি করব বলো', মনুর বুকে মাথা রেখে সোনাই মৃদুস্বরে বলে।

'আমি কলকাতায় গিয়ে সব ঠিক করে এসে তোমায় নিয়ে যাবো! সেখানে আমরা দুজনে থাকবো।'

'আমায় তুমি কি করে নেবে—সেখানে আমি কি বলব—?'

'তার মানে?'

'তুমি আমার কে জিজ্ঞাসা করলে—আমি কি বলব'?

'ভয় পেয়ো না—আমি তোমায় বিয়ে করব। এখানে সবাই আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, সেখানে কিন্তু সবাই তোমাকে স্বীকার করবে।'

সোনাই আর কিছু বলতে পারেনা। পুরুষ যে ঝড়ের বেগে আসে, নারী সেই বেগের আবেগকে ভয় পায়। তাই সোনাইও মনুর কথা তলিয়ে দেখতে চায়।

'আমি কৈবর্তের মেয়ে—তুমি ভুল করছ না ত?'

"ভুল করিনি —তুমি কৈবর্তের মেয়ে নও —তুমি আমার সোনাই।'

সেদিনের সে উচ্ছ্বাস —সে একাগ্রতা নানা রঙে রসে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। দু'জনে বসে কতো স্বপ্ন দেখেছে! সোনাইর ভয় ছিল বেশি। মনুর হঠাৎ উচ্ছ্বাস তার মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। তবুও মনুকে পাবার জন্য তার জীবনে সাধনার আর শেষ নেই। বাড়িতে গোপনে বসে সে লিখতে শেখে—পড়তে শেখে। আচ্ছা, মনুদা কখনও তার লেখাপড়া শেখার কথা বলে না ত!

নন্দীগাঁয়ের জমিদার মহেন্দ্রনারায়ণ একে একে সব হারিয়ে নিঃস্ব হ'য়ে পড়েছে। মনুকে কলকাতা পাঠাবার সামর্থ্যও আর নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর জমিদার বিংশ শতাব্দীতে এসে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে গেল। কিন্তু সর্বাণী এখনও অক্ষয়বটের মতোই অক্ষয় হয়ে রয়েছেন। সামনের দীঘি ও ভদ্রাসনটুকু ছাড়া আর সবই গেছে। ওটুকুরও যাবার আর দেরি নেই।

মনুর আর যাওয়া হ'ল না কলকাতায়। মহেন্দ্র তাকে ডেকে বলল, 'এখন ইসলামাবাদে তোমাকে থাকতে হবে। সেখানে আমি তোমার কাজের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

'কিন্তু আমার পড়াশুনা যে এখনও শেষ হ'ল না', ব্যাকুল হয়ে উঠল মনু।

মহেন্দ্র নির্লিপ্তকণ্ঠে বলল, 'আবার যদি ফিরে পাই —আবার হবে।'

সোনাই শুনে একেবারে ভেঙে পড়ল। ব্যস্ত হয়ে সে মনুকে বলে 'কি হবে?'

মনু নিজেও বুঝতে পারে না কি হবে। তবুও বলে, 'একটা কিছু হবেই।'

'কিন্তু আমার' —কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলে সোনাই।

'আমি ত আছি, সোনাই!'

মনু ইসলামাবাদ যাচ্ছে। বাড়িতে সবাই ব্যস্ত। মহেন্দ্রনারায়ণও সঙ্গে যাচ্ছে।

শুভক্ষণ দেখে যাত্রা করল মনু ও মহেন্দ্র। যাবার পথে সোনাইকে দেখতে পেল না মনু। সোনাইর সকল দায়িত্ব ত তাকে নিতেই হবে। কোথায় গেল সে?

অক্ষয়বটের সামনে এসে পিতাপুত্র দুজনে প্রণাম করল। মনুর চোখ চারদিকে কাকে যেন খোঁজে।

সোনাই আজ আর সামনে এলনা। মনু ভাবে, 'কি হ'ল – যাবার দিনে একটিবারও কেন দেখা দিল না!'

চন্দনার বুকের ওপর দিয়ে আব্দুল মাঝির নৌকা চলেছে। নন্দীগাঁয়ের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে মনু। পাড়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দেখে, সোনাই দাঁড়িয়ে আছে একটি পলাশগাছের নীচে! হাত তুলে কি বলতে গিয়ে বলা হল না মনুর। দূর থেকে দু'হাত তুলে সোনাই তাকে জানালো প্রণাম।

প্রাণের এ আকুল আবেদনের সাক্ষী নেই কেউ।

সময় বয়ে যায়। সোনাই আর নিজেকে নিয়ে পারে না। সারা গাঁয়ে তাকে নিয়ে কথা উঠেছে। মহেন্দ্রনারায়ণ ভজহরিকে ডেকে বলে, 'যা শুনছি সত্যি?'

ভজহরি হাউ মাউ করে কেঁদে বলে, 'আমায় বাঁচান কর্তা।'

হায়রে, আজ মানুষের ভগবানও বিমুখ!

সোনাইর মা কত বলে, 'কি করে এমন হ'ল– এর আগে তোর মরণ কেন হ'ল না!'

সোনাই শুধু চুপ করে থাকে। সে জানে, এ তার জীবনের অভিশাপ নয়—আশীর্বাদ! কিন্তু মনু যে আসে না! ঘর থেকে তার বেরোবারও উপায় নেই। অক্ষয়বটের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বলে, 'ঠাকুর, আমায় বাঁচাও, আমায় মুক্তি দাও।'

নন্দীগাঁয়ের মানুষের বন্ধু অক্ষয়বটের প্রাণে বাজে সেই আর্তনাদ।

দত্তপরিবারের সবাই একে একে গ্রাম ছেড়ে চলেছে। শহরের ডাকে গ্রামের মায়া কাটিয়েই সবাই যাচ্ছে। রইলেন শুধু সর্বাণী—দত্তপরিবারের দীর্ঘদিনের দুঃখের ইতিহাসের বোঝা নিয়ে। মহেন্দ্রকে বলেন, 'সবাই শহরে গিয়ে থাকলে এ সব আগলাবে কে? আমার যে এখনও কাজ ফুরোয় নি ভাই!'

সবাই চলে গেল—অতীত দিনের একটা স্মৃতি শুধু পেছনে রইল পড়ে—বড়ো করুণ সে স্মৃতি। সর্বাণী আজ একা।

শহর আজ ডাক দিয়েছে গ্রামের মানুষকে। জনমানবহীন গ্রাম শিয়াকুল কাঁটায় ভরে গেছে।

তারই মাঝে রইল শুধু নন্দীগাঁয়ের দত্তবাড়ির সর্বাণী আর বৃদ্ধ অক্ষয়বট।

মনুব জন্য প্রতীক্ষার সময় পেবিয়ে যায় সোনাইর—তবুও সে আসে না। তবে কি সবই মিথ্যা! প্রাচীন অক্ষয়বট- মানুষের ভালোবাসা—চোখের জল—সবই মিথ্যা! আজ যাকে আশীর্বাদ বলে জেনে সকল কলঙ্ক মাথায় তুলে নিয়েছে—সে ত মিথ্যে নয়!

সোনাই আব ভাবতে পাবে না। পাগল হয়ে যাবে সে। নারীর জীবনের এই কলঙ্ক ত কোনো দিন ঘুচবে না! যদি এই দুঃখই তার পাওনা ছিল, তাহলে এত ছলনাব ভেতর দিয়ে তার প্রকাশ কেন?

নন্দীগাঁয়ে সোনাইর জীবনের এই প্রশ্নের জবাব দেবার কেউ নেই! সমাজ তার কলঙ্ক দেখল—দেখল না তাব ভালোবাসাকে। ছোট জাতের মেয়ে বলে কি সে নারীত্বের বহু আকাঙ্ক্ষিত মর্যাদার দাবি করতে পারে না! এই সংসারে চিরদিন শুধু পুরুষের কামনার ইন্ধন জোগাবে—অথচ ভালোসার দাবি সে জানাতে পাববে না? এ সংসারে মিথ্যেই বড়ো হয়ে উঠবে—তার জীবনের ভালোবাসা একেবারে মিথ্যে হয়ে যাবে! সে যে ভালোবেসেছিল—সে ভালোবাসা জীবনের চেয়েও সত্য! এর জবাব কে দেবে!

কিন্তু সময় ফুরিয়ে এল

নন্দীগাঁয়ের ইতিহাসের শেষ পালার আগের পালা শেষ হতে চলল। প্রতিদিনের মতো সেদিনও দীঘির ঘাটে এলেন সর্বাণী। গঙ্গা নেই কাছে—পূর্বপুরুষের তৈরি এই দীঘিই তাঁর কাছে পুণ্য-তোয়া গঙ্গা!

ঘাটে লাঠিটা রেখে বসলেন সর্বাণী। নির্জন দীঘির জলে পা ডুবিয়ে নন্দীগাঁয়ের দত্তবাড়ির শেষ প্রাচীন মানুটি বসে।

সূয ওঠার এখনও অনেক দেরি। আর নন্দীগাঁয়ের সূর্য—সে ত কেবল নিজেকে আড়াল করে চলে!

ভোর হতে দেখা গেল দীঘির ঘাটে সর্বাণী লুটিয়ে পড়ে আছেন। দীর্ঘ নব্বই বৎসর পর নন্দীগাঁয়ের রাণী-মা চলে গেলেন।

আর—

অক্ষয়বটের পায়ের কাছে আর একটি নারী জীবন শেষ প্রণামটুকু নিবেদন করে চিরকালের মতো ঘুমিয়ে আছে। নন্দীগাঁয়ের ইতিহাসে তার কোনো স্বাক্ষর নেই। দত্তপরিবারের একটি সম্ভাবনা অবহেলায় হারিয়ে গেল।

সোনাই একথা জেনে যায়নি যে মনু বিয়ে করে চা বাগানে কাজ করছে।

বারবার সত্যের ঘটেছে পরাজয়। নন্দীগাঁ আছে—আছে তার প্রাচীন বৃদ্ধ অক্ষয়বট, কিন্তু যাদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই গ্রাম—তারা চিরদিনের মতো ছেড়ে গেছে! হয়ত এমনি করেই সবাই যাবে!

তবু মৌন বৃদ্ধ অক্ষয়বট বলে 'আমি আছি—আমি থাকব—তোমাদের আমি প্রতিদিন নন্দীগাঁয়ের মানুষের ইতিকথা শুনিয়ে যাব

—শেষ—